মাসুদ রানা

যাত্রীরা হুঁশিয়ার

অপারেশন চিতা

দুটি বই একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

কাজী আনোয়ার হোসেনের
মাসুদ রানা
[দুটি বই একত্রে]

যাত্রীরা হুঁশিয়ার

বর্তমান দুনিয়ার সেরা প্যাসেঞ্জার প্লেন ইস্পাত বাংলা এয়ারক্রাফট কোম্পানীর 'অচিন পাখি'—বিদেশের মাটিতে কয়েকজন দেশপ্রেমিক বাঙালীর কঠোর শ্রমের ফসল। বাঙালীর এই গর্বের বস্তুটিকে ধূলিসাৎ করে দেয়ার জঘন্য এক ষড়যন্ত্র এঁটেছে পশ্চিমা বেনিয়া গ্রুপ। ওদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেয়ার ভার পড়ল রানার ওপর।

অপারেশন চিতা

টোকিওতে একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে যাচ্ছে রানা, মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খান বললেন: যাবার পথে রেঙ্গুন হয়ে যাও, সাইফার মেশিনের ছোট্ট একটা পার্ট পৌছাতে হবে বাংলাদেশ দূতাবাসে। পথে হাইজ্যাক হয়ে গেল রানা। কোনও কথা শুনল না, বাংলাদেশ থেকে পাঠানো একটা কমান্ডো গ্রুপের লীডার ওকে নিজেদের দলের লোক মনে করে অস্ত্রের মুখে নিয়ে চলল অন্যদিকে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ১৮২, ১৮৩

যাত্রীরা হুঁশিয়ার + অপারেশন চিতা

<u>লেখকঃ</u> কাজী আনোয়ার হোসেন

<u>কৃতজ্ঞতায়ঃ</u> শামীম ফয়সাল

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

মাসুদ রানা

যাত্রীরা হুঁশিয়ার

অপারেশন চিতা

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 7617 6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯১
চতুর্থ প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
JATREERA HUNSHIAR

OPERATION CHEETA
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

সাঁইত্রিশ টাকা

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত* এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ অদৃশ্য শত্রু *পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা তিন শত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা হংকং সম্রাট *কুউউ!*বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি জিপসী *আমিই রানা *সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক আই লাভ ইউ, ম্যান *সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা *নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা প্রতিশোধ *মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ *চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় মরণ খেলা *অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস ছদ্মবেশী *কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন বুমেরাং *কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরুষ *নীল বজ্র মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে * অনন্ত যাত্রা রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া *হীরকসম্রাট *সাত রাজার ধন শেষ চাল *বিগব্যাঙ।

যাত্রীরা হুঁশিয়ার

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৯১

এক

নাইটগার্ডকে আসতে দেখেই চুপ হয়ে গেল ওরা।

ড্রইং অফিসের এক কোণে তিনজন একসাথে বসেছে, মেশিন থেকে কফি ঢেলে চুমুক দিচ্ছে যে যার কাপে। ছুটি হয়ে গেছে বেশ খানিক আগেই, তবু হাতের কাজ শেষ না করে ফিরবে না ওরা—যেন সদয় মনিবের বিশ্বস্ত কর্মচারী সবাই। নাইটগার্ড ইউনুসের সাথে একটা কুকুর রয়েছে, চাপাস্বরে গর্জে উঠল। আঙুলের ডগা দিয়ে কুকুরের মাথা স্পর্শ করল ইউনুস, সাথে সাথে আবার চুপ হয়ে গেল সেটা, তবে চোখ দুটো সতর্ক থাকল।

'আপনাদের কি, স্যার বাড়িঘর নেই?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করল ইউনুস, ওদের দিকে হেঁটে আসছে, ট্রেনিঙের সময় শেখা নিয়মগুলো স্মরণ করল। তার বাঁ হাত নিচে নামল, আবার স্পর্শ করল কুকুরটার মাথা। একটু চাপ দিলেই ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ওটা।

'আরও ঘণ্টাখানেক আছি, ইউনুস,' বলল পিটার গুডউইল।

'তারমানে ওভারটাইম করছেন আপনারা...,' কাছে চলে এসেছে ইউনুস, আর সামনে বাড়া উচিত হবে না। আঙুলগুলো এখনও কুকুরের মাথা ছুঁয়ে আছে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দাঁড়িয়ে পড়ল কুকুরটাও। দু'জনেই পাথুরে মূর্তির মত স্থির। 'আপনাকে তো আগে কখনও ওভারটাইম করতে দেখিনি, মি. ব্রুস,' বলল ইউনুস, দ্বিতীয় লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে।

জবাব না দিয়ে গম্ভীর একটু হাসল শুধু ডিক ব্রুস, একজন নাইটগার্ডের সাথে গল্প জমাবার মুড নেই তার।

তৃতীয় লোকটার দিকে ফিরল ইউনুস। সুন্দর দেখতে লোকটা, সুপুরুষই বলা যায়, শিরদাঁড়া বাঁকা করে ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে বসে আছে, চেহারায় উত্তেজনা বা উদ্বেগের কোন ছাপ নেই। 'আপনাকে তো চিনলাম না, স্যার?' জিজ্ঞেস করল ইউনুস। কুকুরের মাথা থেকে আঙুলগুলো সামান্য তুলল সে। ইঙ্গিত পেয়ে আবার চাপাস্বরে গর্জে উঠল কুকুরটা। 'চুপ করো, বাঘা,' ধমক দিল ইউনুস, তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমার বাঘাকে মাফ করতে হবে, স্যার। সে-ও আপনাকে আগে কখনও দেখেনি তো, তাই অমন করছে। অচেনা কাউকে দেখলে বেচারা ভারি আপসেট হয়ে পড়ে।' সবাই জানে, ইউনুস আর তার কুকুর ট্রেনিং পেয়েছে রানা এজেন্সি থেকে।

তৃতীয় লোকটা, উইলিয়াম কার্টার, পকেটে হাত ভরে তার আইডেনটিটি কার্ডটা বের করল, সাথে একটা পাস। দুটোই পরীক্ষা করল ইউনুস। বলল,

'আশ্চর্য ব্যাপার, স্যার। দেখতে পাচ্ছি আপনার পাসে সীল মারা হয়েছে, সই করা হয়েছে গেটে, কিন্তু বোর্ডে আপনার নাম তো দেখলাম না! ওখানকার তালিকায় আপনার নাম থাকলে তবে না আমি বুঝব যে বিল্ডিঙের ভেতর আছেন আপনি!'

'তোমার সেকশন যদি ভুল করে তার জন্যে তুমি মি. কার্টারকে দোষ দিতে পারো না,' গম্ভীর সুরে বলল ডিক ব্রুস। 'এবার, তুমি যদি কিছু মনে না করো··· ।'

'লক্ষ রাখবেন কিছু যেন বাইরে পড়ে না থাকে, সব জিনিস জায়গামত তুলে তালা দিয়ে রাখবেন,' সবিনয়ে বলল ইউনুস। 'সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে আমাদের একটা ফোন করবেন, প্লীজ।' ঘুরল সে, কুকুরটাকে নিয়ে ড্রইং অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

তার চলে যাওয়াটা তিনজনই ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওরা। 'ধ্যেত,' বলল গুডউইল। 'তোমার নামটা ব্ল্যাকবোর্ডে তুলতে ভুলে গেছি··· ।'

'অস্থির হয়ো না তো,' বলল ডিক ব্রুস। 'তেমন কিছু ঘটেনি।'

ইস্পাত বাংলা ইন্টারন্যাশনাল অর্থাৎ আই বি আই-এর শাখা প্রতিষ্ঠান ইস্পাত বাংলা এয়ারক্রাফট কোম্পানী, প্রতিষ্ঠানের নরথ্যাম্পটনশায়ার অফিসে সিকিউরিটির ব্যবস্থা অত্যন্ত কড়া। প্রতিটি অফিসে একটা করে সেফ রয়েছে, কাজ শেষ হওয়ামাত্র সমস্ত ডকুমেন্ট সেটায় ভরে তালা লাগাতে হবে। প্রতিটি অফিসের দরজায় বিশেষ ধরনের তালা রয়েছে, যখনই খোলা হোক, সাথে সাথে গার্ডরুমে আলো জ্বলে উঠবে। প্রতিটি বিল্ডিঙের জন্যে রয়েছে আলাদা গার্ড আর ট্রেনিং পাওয়া কুকুর, অচেনা কোন লোক উপস্থিত হওয়ামাত্র টের পেয়ে যায়। তাছাড়াও, গোটা কমপ্লেক্স—অফিস, হ্যাঙ্গার, এঞ্জিনিয়ারিং ওঅর্কশপ ও ল্যান্ডিং স্ট্রিপ—ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

আই বি এ-র 'অচিন পাখি' বিমান তৈরি শিল্পে উদয় হয়েছে ধূমকেতুর মত, দুনিয়ার প্রায় সব ক'টা এয়ারলাইন কোম্পানী ওদের এই বিমান কেনার জন্যে নিজেদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। অচিন পাখির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, ঘণ্টায় এক হাজার মাইল উড়তে পারে, একশো আরোহীকে সম্ভাব্য সবরকম আরাম ও সুবিধে দিতে পারে। সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, দুনিয়ার অন্য যে-কোন বিমানের তুলনায় 'পার-প্যাসেঞ্জার-মাইল'-এর হিসেবে অচিন পাখির খরচ সবচেয়ে কম—শুধু কম নয়, অনেক কম। অচিন পাখির এঞ্জিন 'ডেভেলপ' করা হয়েছে আই বি এয়ারক্রাফট অ্যান্ড রিসার্চ-এর বাংলাদেশী এঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা, নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তার মধ্যে। বিমানটির এয়ারফ্রেম 'ডেভেলপ' করা হয়েছে কোম্পানীর নিজস্ব কারখানায়, তা-ও কোম্পানীর বাংলাদেশী অ্যারোনটিক এঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা। এক্ষেত্রেও বাইরে কিছু ফাঁস হয়নি। দুনিয়ায় এমন কোন ডিজাইনার বা ম্যানুফ্যাকচারার নেই যারা অচিন পাখির ড্রইং দেখতে পাওয়ার বিনিময়ে তাদের ডান হাত হারাতে রাজি হবে না। সেই অমূল্য ড্রইংগুলোই মাইক্রোফিল্ম থেকে প্রজেক্ট

হচ্ছে ওদের তিনজনের সামনে রাখা স্ক্রীনে।

পিটার গুডউইল একজন সেকশন লীডার, তবে আইবি গ্রেড বি থ্রী (এঞ্জিনিয়ারিং), বেতন পায় বছরে সাত হাজার পাউন্ড। ডিক ব্রুসের গ্রেড বি ফাইভ (এঞ্জিনিয়ারিং), বেতন পাঁচ হাজার পাউন্ড। তার বয়স বিয়াল্লিশ, পারসোন্যাল স্টাফ ডাটা টেপ-এ তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা না হলে ইতোমধ্যে বি থ্রী গ্রেড পেতে পারত। তার ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে লেখা আছে, 'মেজাজী মানুষ, তার সাথে কাজ করা কঠিন।' তৃতীয় লোকটা, উইলিয়াম কার্টার, আই বি আই ফ্রান্স থেকে কর্মচারী বিনিময় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইংল্যান্ডে এসেছে। তার গ্রেড বি টু (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), বার্ষিক আয় আট হাজার পাউন্ড। স্বভাবগত কারণেই তাকে অবজ্ঞা করে ডিক ব্রুস।

মাইক্রোফিল্ম প্রজেক্টরের পাশে একটা প্রকাণ্ড বই রয়েছে, পাতাগুলো আলগা, পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে উইলিয়াম কার্টার। বইটার দিকে ঝুঁকে তাকাল সে। অচিন পাখি বিমান সম্পর্কিত সমস্ত ড্রইং, সব মিলিয়ে সংখ্যায় দুই লাখ সত্তর হাজার, এই কেবিনেটে রাখা হয়েছে মাইক্রোফিল্ম করে। দুই লাখ সত্তর হাজার ড্রইং-এর যে-কোন একটা বেছে নেয়া যায় প্যানেলের একটা বোতামে চাপ দিয়ে।

'১৮৭৭৩৬…হ্যাঁ, এক লাখ সাতাশি হাজার সাতশো ছত্রিশ নম্বরটা দেখা যাক,' বলল সে।

প্রয়োজনীয় এক সেট বোতামে চাপ দিল ডিক ব্রুস, স্ক্রীনের ছবিটা সাথে সাথে বদলে গেল। এঞ্জিনের অপর একটা অংশ ফুটে উঠল তার বদলে। এঞ্জিনের এই অংশটা টেইলপ্লেনে থাকে, পোর্ট সাইডে—অয়েল ফিড সিস্টেম।

চুপচাপ মিনিট কয়েক দেখল ওরা। তারপর নড়ে উঠল পিটার গুডউইল, স্ক্রীনের দিকে এগোল সে। স্ক্রীনটা পাঁচ ফুট উঁচু, চার ফুট চওড়া, গায়ে অসংখ্য রেখা ও কনভেনশন্যাল এঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং-এর হাইরোগ্লিফিক্স গিজ গিজ করছে। 'পাইপের ভেতর আমরা যদি একটা বাই-পাস ঢোকাই, তাহলে এই নাক্‌ল্‌ জয়েন্টের ভেতর দিয়ে, এদিকের এই বাঁক নিয়ে, তেলের প্রবাহটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারি, সাপ্লাইটা ফিরে যাবে মেইন অয়েল রিজারভয়েরে।'

'আর গজে দেখা যাবে ফুল প্রেশার রয়েছে তেলের,' বলল কার্টার, উত্তেজনায় কর্কশ শোনাল তার চাপা কণ্ঠস্বর। অবশেষে সম্ভবত একটা উপায় পেয়ে গেছে তারা…।

'লুব্রিক্যান্টের অভাব দেখা দেবে ভেইন-এ, অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠবে,' পিটার গুডউইলও উত্তেজনা চেপে রাখতে পারল না, খস খস করছে তার গলা। চোখ যেন দু'টুকরো উজ্জ্বল আলো। 'কিন্তু বোঝা যাবে না, কারণ ওই ভেইন-এ কোন টেমপারেচার রীডিং নেই…আমরা বোধহয় সমাধান পেয়ে গেছি। বাই-পাসটা তুমি ফ্রান্সে তৈরি করে পাঠিয়ে দেবে এখানে। বলবে, ওটা ফরওয়ার্ড ফিডারের জন্যে। আমরা একটা ড্রইং-বোর্ড মিসটেক তৈরি করব, ট্রেস করা অসম্ভব, আর বাই-পাসটা ফরওয়ার্ড এন্ড-এর বদলে বসিয়ে দেব

এখানে...'

'একটা প্লেন পঞ্চাশ ঘণ্টা উড়বে, তারপর চিড় ধরবে ভেইন-এ... ফিফটি ফ্লাইং আওয়ারস...ইতিমধ্যে সবগুলো প্লেনেই আমরা...।'

'তারপর এক এক করে,' বলল গুডউইল, 'শালার "অসিন পাকি"র গোটা বহরটাই আকাশ থেকে খসে পড়বে...।' কেউই ওরা অচিন পাখি ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারে না। শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করার চেষ্টাও বোধহয় করেনি কোনদিন।

কার্টার বলল, 'অতটা আশা কোরো না। প্রথমটা খসে পড়ার পরই পুরো ঝাঁকটাকে মাটিতে বসিয়ে রাখবে ওরা।'

নিঃশব্দে ওদের দু'জনকে লক্ষ করছে ডিক ব্রুস, চেহারায় তাচ্ছিল্য। 'এত টাকা বেতন কেন যে তোমাদের দেয়া হয়, বুঝতে পারছি না!' খেঁকিয়ে উঠল সে। চেয়ার ছেড়ে স্ক্রীনের পাশে চলে এল। 'এদিকে দেখো,' বলল সে, বিরক্তির ভাবটুকু চেহারায় গোপন থাকল না। 'তোমরা যদি ভেইনটাকে তেল থেকে বঞ্চিত করো, তাহলে বঞ্চিত হবে লিঙ্কেজ-ও, কারণ লিঙ্কেজ ওই ভেইন থেকেই তেলের সাপ্লাই পায়। তেল না পেলে লিঙ্কেজও অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠবে, আর তা যদি একবার দুশো ডিগ্রী ছাড়িয়ে যায়, বাই মেটাল স্ট্রিপ কাজ করবে না, ফলে এই পাইপ থেকে শুরু হবে তেলের নতুন সাপ্লাই। কী আশ্চর্য, এই সাপ্লিমেন্টারি সাপ্লাই-এর ডিজাইন এভাবেই করেছিলাম আমরা, নাকি সিস্টেমের মধ্যে ওটা ঢোকানোর সময় দু'জনেই তোমরা ঘুমিয়ে ছিলে?'

'সেরেছে, ও তো ঠিক কথাই বলছে,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কার্টার।

'শুধু এই একটাই নয়। অনেক আগে থেকে আরও একটা ঠিক কথা তোমাদের বলে আসছি আমি—মেইন্টেন্যান্স এঞ্জিনিয়ারকে ফাঁকি দিয়ে এই প্লেনের এক ইঞ্চিও তোমরা স্যাবোটাজ করতে পারবে না। "অসিন পাকি" ফুলপ্রূফ। তোমাদের একমাত্র আশা হলো, টেক-অফ করার ঠিক আগের মুহূর্তে একটা প্লেনে ওঠা—ইতিমধ্যে মেইন্টেন্যান্স এঞ্জিনিয়াররা যেটাকে পরীক্ষা করে বলে দিয়েছে কোথাও কোন ত্রুটি নেই—তারপর একটা কিছু নষ্ট করা। কিন্তু তোমরা তো আমার কথা শুনবে না, কারণ আমি স্রেফ বি ফাইভ।' পকেটে হাত ভরে ওদের দিকে ফেরার জন্যে ঘুরল সে।

'প্রি-ফ্লাইট চেক একজন চীফ এঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে করাতে হবে, নিয়মটা বাধ্যতামূলক করেছে আই বি—কেন?' জিজ্ঞেস করল পিটার গুডউইল। 'ঠিক ওই কাজটি প্রতিরোধ করার জন্যে। আমার মত তোমরাও জানো, এয়ারলাইনের হাতে একটা অসিন পাকি তুলে দেয়ার আগে প্লেনটা থেকে সবার শেষে যে লোকটা নেমে আসে সে একজন আই বি আই-এর স্টাফ, তার গ্রেড কমপক্ষে বি টু, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই লোকটা বাংলাদেশী।'

'সেক্ষেত্রে ওই লোকটাই আমাদের টার্গেট। একজন স্টাফকে কিনে নাও...।'

'অসম্ভব,' বলল কার্টার।

'কেন?' তীক্ষ্ণ, ঝাঁঝাল কণ্ঠে জানতে চাইল ডিক ব্রুস। 'আমাদের তিনজনকে কেনেনি ওরা? তুমি নিজেও তো বি টু।'

'কারণটা হলো, চীফ এঞ্জিনিয়ার যারা প্রি-ফ্লাইট চেক করে, তারা সবাই রানা এজেন্সির লোক, শুধু বাংলাদেশী নয়। একজন একজন করে বাছাই করা হয়েছে ওদের, বাছাইয়ের কাজটা এজেন্সির ডিরেক্টর মাসুদ রানা নিজে করেছে, তারপর পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে তারা পুরোপুরি বিশ্বস্ত কিনা। তুমি জানো, এমনকি চীফ এঞ্জিনিয়ারদের অনেককেও সিকিউরিটি অফিসার বলে গণ্য করা হয়, এবং সেজন্যে আলাদা বেতন পায় তারা? উঁহুঁ, না—ওদেরকে কেনা সম্ভব নয়।'

'তারপরও আমি বলব, ওরাই টার্গেট,' বলল ডিক ব্রুস। 'প্রি-ফ্লাইট টেস্টের দায়িত্ব পালন করছে এমন একজন চীফ এঞ্জিনিয়ারকে ধরো, আমাদের খুশি মত যে-কোন সময় একটা অসিন পাকিকে আকাশ থেকে ফেলে দেয়ার ব্যবস্থা করা যাবে···।'

'কিভাবে?'

'বাই-মেটাল স্ট্রিপটাকে উল্টে দিয়ে। ড্রইংগুলো বের করো, আমি তোমাদের দেখাচ্ছি···।'

দুই

আই বি আই-র নিউ ইয়র্ক বিল্ডিংটা সিক্সথ্ এভিনিউয়ে, টাইম-লাইফ বিল্ডিঙের দক্ষিণে। দালানটা তেত্রিশতলা হলেও, কোম্পানীর এটা আমেরিকান শাখা মাত্র। আই বি-র হেড অফিস জুরিখ লেকের ধারে, সুইজারল্যান্ডে।

মাসুদ রানাকে নিয়ে আই বি এয়ারক্রাফট কোম্পানীর অচিন পাখি কাঁটায় কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়ে কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছুল, প্লেন থেকে নামার আগেই জানালা দিয়ে হেলিকপ্টারটা দেখতে পেল রানা, ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। কোম্পানীর প্রতিনিধি ইমরান নূর আগেই কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন ঝামেলা সেরে ফেলেছে, টারমাক ধরে সরাসরি হেলিকপ্টারের কাছে চলে এল রানা। মাত্র কয়েক মিনিট পরই ম্যানহাটনের আই বি আই বিল্ডিঙের ছাদে 'কপ্টারটা থেকে নামতে দেখা গেল ওকে। ছাদের এক ধারে ছোট্ট লবি, ভেতরে ঢুকে এলিভেটরের দরজা খুলল ও, ত্রিশটা বোতামের সবগুলোকে বাদ দিয়ে বুড়ো আঙুলের চাপ দিল একটা ফ্রস্টেড-গ্লাস প্লেটে। ক্যামেরার লেন্স ওর আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করল, কমপিউটরের নির্দেশ পেয়ে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, নিচে নামতে শুরু করল এলিভেটর।

বিল্ডিঙের ওপরের তিনটে ফ্লোর বাকি ফ্লোরগুলো থেকে আলাদা করা হয়েছে, ওই তিনটেতে ঢুকতে হলে আঙুলের ছাপ পরীক্ষা পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। বত্রিশ তলায় নেমে এল রানা।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে ডান দিকে বাঁক নিল ও, কার্পেট মোড়া করিডর ধরে শেষ মাথায় চলে এল. দরজার প্লেটে লেখা রয়েছে—'টেকনিক্যাল সেলস'। অফিসের ভেতর ওর জন্যে অপেক্ষা করছেন শামসুল হক।

'নূর ফোন করেছিল. বলল আসছেন। কেমন আছেন আপনি, মি. রানা? ফ্লাইট কেমন লাগল? কফি বা চা বলব আপনার জন্যে?'

'ধন্যবাদ। না, প্লীজ, আমার কিছু লাগবে না। আপনি কেমন আছেন?'

'ভাল। সুলতা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, ওর কাছে অনেকগুলো মেসেজ রয়েছে...।'

আউটার অফিসের মেঝে পেরিয়ে এল রানা, ছোঁয়ার আগেই খুলে গেল ইনার অফিসের দরজা। বোতামের ওপর পা দিয়ে রেখেছেন সুলতা। নিজের ডেস্কে বসে আছেন তিনি, তাকিয়ে আছেন তাঁর স্টেনো প্যাড-এর ওপর, চোখে সরুফ্রেম আর মোটা কাঁচের চশমা। বয়স পঞ্চাশ, মোটাসোটাই বলা যায়। তিনটে ভাষায় সাঁটলিপি লিখতে পারেন, দ্রুতকথনের সাথে পাল্লা দিয়ে। টাইপে তাঁর রেকর্ড রয়েছে মিনিটে একশো ষাটটা শব্দ। কোন ঘটনা বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট কখনও ভোলেন না। চাকরিটা পার্সোন্যাল সেক্রেটারির হলেও, আই বি আই-তে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে সুলতা রায় চৌধুরীকে সমীহ করে না।

'এত দেরি করলেন যে?' কৈফিয়ত চাওয়ার সুরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'প্লেন তো ল্যান্ড করেছে সেই কবে, পনেরো মিনিট পার হতে চলেছে।'

সাদা সিল্ক শার্টের বোতাম খুলে কলারটা ঢিল করল রানা, টাইটা এক চুল নিচে নামাল, ডেস্কের পাশে লেদার আর্মচেয়ারে বসল আরাম করে। ওয়াটার কুলার থেকে অর্ধেক ভরলেন সুলতা, বাকি অর্ধেকে ব্র্যান্ডি ঢেলে বিনাবাক্যব্যয়ে সেটা ধরিয়ে দিলেন রানার হাতে, তারপর আবার খুললেন স্টেনো প্যাডটা। 'কিভাবে শুনতে চান আপনি—বিস্তারিত, নাকি সংক্ষেপে?'

'যেভাবে ভাল বোঝেন,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'সিদ্দিকী টেক্সাস থেকে ফোন করেছিল, লাঞ্চের জন্যে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চায়। আপনার সুবিধেমত সময় একটা বের করেছি, মি. হক সায় দিলেই...।'

'বেশ।'

'বোস্টন থেকে ফোন করেছিল সাব্বির হোসেন। লেদার চুরির রহস্যটা জানতে পেরেছে সে। কিছু লোক বাড়িতে বসে ব্যাগ তৈরি করছিল...।'

'প্রতি মাসে পঞ্চাশ হাজার ফুট লেদার চুরি করে?'

'হ্যাঁ। ঢাকা থেকে প্রচুর আত্মীয়স্বজন এসেছে তার, সবাইকে কারখানায় ঢুকিয়েছে সে। আলাদা একটা বাড়ি ভাড়া করে একসাথে থাকে তারা...।'

'সাব্বির হোসেন কি ভাল ব্যবসা করছে?'

'দারুণ ব্যবসা করছে। আমরা কন্ট্রাক্ট বাতিল করে দিতে পারি, এই ভয়ে আত্মীয়দের বিরুদ্ধে কেস করতে চাইছে সে...।'

'অ্যাকাউন্ট সেকশনের জহির শাহকে বলুন, কন্ট্রাক্টটা বহাল থাকতে

পারে, তবে চুরি যাওয়া জিনিসের দাম আমরা তার শেয়ার থেকে কেটে রাখব···।'

'বেশ ভাল পরামর্শ, মি. রানা···দস্তগীর ফোন করেছিল লস এঞ্জেলস থেকে। ফোনে যারা আড়িপাতা যন্ত্র বসিয়েছিল তাদের পরিচয় জানতে পেরেছে সে।'

'একদল ছাত্র?'

মুখ তুলে রানার দিকে তাকালেন সুলতা রায়। 'হ্যাঁ, মি. রানা। আপনি জানলেন কিভাবে?'

'ইনটিউইশন, তার সাথে একটা তথ্য—যে কারখানায় পার্টস তৈরির কাজটা আমরা দিয়েছি, ওখানে সামরিক বিমান তৈরি হত। কারখানাটার সামনে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে কিছুদিন আগে।'

সবক'টা মেসেজ জানাতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট নিলেন সুলতা রায়। কাজ সেরে নিজের ইনার অফিসে চলে এল রানা, শাওয়ার সারল, কাপড় পাল্টে গাঢ় রঙের লাইটওয়েট বিজনেস স্যুট পরল। নীল ডোরাকাটা টাইয়ের নট বাঁধছে, ইন্টারকমে এলেন সুলতা। 'মি. রানা, সবাই ওঁরা বোর্ডরুমে বসছেন।'

কামরার শেষ মাথা থেকে নড়ল না রানা, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকেই কথা বলল, জানে মাইক্রোফোন তার গলা ঠিকই ধরতে পারবে। 'ঠিক আছে, মিস সুলতা। দু'মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব আমি।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স একটি এসপিওনাজ সংস্থা, মাতৃভূমির স্বার্থবিরোধী যে-কোন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্যে পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে ওরা। সংস্থার দুর্ধর্ষ এজেন্টদের মধ্যে মাসুদ রানা একজন। রোমাঞ্চ প্রিয় এই চিরতরুণের মনে রয়েছে জানার প্রবল আগ্রহ, মাথায় রয়েছে ক্ষুরধার বুদ্ধি, বুকে রয়েছে দুর্দান্ত সাহস। রক্তমাংসের সাধারণ বাঙালী, কিন্তু নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, দেশপ্রেম, মহত্ত্ব ও ত্যাগ অজেয় বীরের মহিমা দান করেছে তাকে। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বি.সি.আই.-এর একটি কাভার, সঙ্গত কারণেই এজেন্সির ডিরেক্টর হতে হয়েছে ওকে। নুমায় রয়েছে অনারারী প্রজেক্ট ডিরেক্টরের পদ। ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টিটেরোরিজম অর্গানাইজেশনের একজন কমান্ডার ও। মাঝে মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ জগতেও বিচরণ করতে হয় ওকে। একদল অফিসারের বেঈমানী ফাঁস হয়ে যাবার পর আক্ষরিক অর্থেই ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস অচল হয়ে পড়ে, ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে বি. সি. আই. তথা রানা এজেন্সি তথা মাসুদ রানাকে ওদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দিতে হয়। এছাড়া, আরও অনেক সংগঠন ও সংস্থার সাথে জড়িত রানা। ঠেকায়-বেঠেকায় কে. জি. বি. ও সি. আই. এ.-কেও সাহায্যের আশায় বি. সি. আই. বা রানা এজেন্সির অফিসে ধরনা দিতে হয়।

ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে কোন কালেই

ছিল না রানার, কিন্তু আমেরিকা আর ইউরোপ জুড়ে রানা এজেন্সির খ্যাতি শেষ পর্যন্ত ওকে ব্যবসার জগতেও টেনে আনল। ইউরোপ আর আমেরিকায় বসবাসরত কিছু বাংলাদেশীর দেশপ্রেম ও উদ্যোগ লক্ষ করে অভিভূত, সেই সাথে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের সাথে যোগ দেয় ও।

বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। রানা তখন সুইজারল্যান্ডে। বি. সি. আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের একটা জরুরী মেসেজ পেল ও। বার্তাটি এরকম—'ব্যবসাসফল কিছু বাংলাদেশী ভদ্রলোক অসম্ভব ঝুঁকি নিয়ে বিরাট একটা কাজে হাত দিয়েছেন, তাঁরা সফল হলে দেশের সুনাম বাড়বে বলে বিশ্বাস করি আমি। ওঁদের কয়েকজনকে আমি চিনি, ব্যবসায়ী মহলে সৎ, আন্তরিক ও মেধাবী বলে খ্যাতি আছে। ওঁরা বলছেন, রানা এজেন্সির সাহায্য ছাড়া কাজটায় সফল হতে পারবেন না। জুরিখে কাল ওঁদের বোর্ড মীটিঙে তুমি উপস্থিত থাকবে বলে কথা দিয়েছি আমি। যদি সম্ভব হয়, আমি চাই, রানা এজেন্সি যেন ওদেরকে সাহায্য করে।'

বসের নির্দেশে যথাসময়ে মীটিঙে উপস্থিত হলো রানা। ইস্পাত বাংলা ইন্টারন্যাশনালের তিনজন ডিরেক্টরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো ওর। প্রতিষ্ঠানের নামটা আগেই শুনেছিল রানা, ডিরেক্টরদের নামও বিভিন্ন সূত্র থেকে কানে এসেছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইস্পাত বাংলার বৈশিষ্ট্য বা আকার-আয়তন অথবা ভদ্রলোকদের প্রকৃত সাফল্য বা অর্জন সম্পর্কে ওর তেমন কোন ধারণা ছিল না। মীটিং শুরু হবার পর রানা উপলব্ধি করল, ওকে চমকে দেয়ার জন্যেই যেন ডাকা হয়েছে মীটিংটা। চমকও মাত্র একটা নয়।

প্রথমেই রানাকে জানানো হলো, বাংলাদেশীদের পুঁজির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ইস্পাত বাংলা দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টীল মিলস হতে যাচ্ছে। বর্তমানে ইস্পাত বাংলা বছরে আয় করছে পঞ্চাশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রতিষ্ঠানের টেকনিশিয়ান, এঞ্জিনিয়ার ও দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ষাট জনই বাঙালী।

বোর্ডের চেয়ারম্যান সালেহ চৌধুরী এরপর তাঁদের বর্তমান কর্মসূচী সম্পর্কে বললেন। ভদ্রলোক মধ্যবয়স্ক, শ্যামলা, প্রকাণ্ড দেহী। শান্ত, ঠাণ্ডা ও নিরুদ্বিগ্ন চেহারা।

ইস্পাত বাংলার পরবর্তী কাজ হলো, 'অচিন পাখি' নামে এমন একটা বিমান তৈরি করা, যেটাকে আকাশের বুকে সবচেয়ে নিরাপদ বলে গণ্য করা হবে। রানার চেহারায় বিস্ময় ও অবিশ্বাস ফুটে উঠতে দেখে শান্তকণ্ঠে সালেহ চৌধুরী বললেন, তাঁরা জানেন বিমান তৈরি শিল্প বিশাল একটা কর্মকাণ্ড, কোথায় কি সমস্যা আছে তা-ও তাঁদের অজানা নয়। সমস্যা ও তার সমাধান এক এক করে উল্লেখ করলেন তিনি।

প্রথমেই টাকা প্রসঙ্গে বললেন ভদ্রলোক। শুধু ইস্পাত বাংলার মাধ্যমে নয়, অন্যান্য আরও ব্যবসা থেকে বিপুল টাকা উপার্জন করেছেন তাঁরা, এখনও করছেন, কাজেই পঁজি কোন সমস্যা নয়। শিল্প স্থাপন করার জন্যে সরকারের

অনুমতি দরকার, তা তাঁরা ইতোমধ্যে পেয়ে গেছেন। পরবর্তী সমস্যা দক্ষ শ্রমিক, টেকনিশিয়ান আর অ্যারোনটিক এঞ্জিনিয়ার। ব্রীফকেস খুলে কাগজ পত্র বের করলেন সালেহ চৌধুরী, বাঙালী অ্যারোনটিক এঞ্জিনিয়াররা ইউরোপ আর আমেরিকার কোথায় ক'জন চাকরি করছেন তার একটা তালিকা দেখালেন রানাকে। সংখ্যায় তাঁরা অনেক, যদিও সবাই তাঁদের বর্তমান চাকরি ছেড়ে ইস্পাত বাংলায় যোগ দিতে উৎসাহী নন। তবে বেশিরভাগই আসতে রাজি হয়েছেন। রাজনৈতিক কারণে স্থানীয় কিছু এঞ্জিনিয়ারকেও নেয়া হবে। বাঙালী দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের পর বাকিটা পূরণ করা হবে ইউরোপ আর আমেরিকার সেরা লোক দিয়ে। প্রশাসনিক কাজেও অগ্রাধিকার পাবে বাঙালীরা।

এক এক করে প্রতিটি সমস্যার কথা বললেন সালেহ চৌধুরী, সমাধানও দেখিয়ে দিলেন। সবশেষে বললেন, মাত্র একটা সমস্যার সমাধান তাঁরা করতে পারেননি। সমাধান নির্ভর করছে রানা এজেন্সির ওপর। রানা এজেন্সি যদি সাহায্যের হাত না বাড়ায়, প্রজেক্টটা বাতিল করে দিতে বাধ্য হবেন তাঁরা।

'কি ধরনের সাহায্য আশা করছেন আপনারা?'

'আমরা আসলে রানা এজেন্সিকে একটা বর্ম হিসেবে পেতে চাইছি, যেটা আমাদের রক্ষা করবে।' এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে সিকিউরিটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন সালেহ চৌধুরী। এক কোম্পানী আরেক কোম্পানীর গোপন তথ্য জানার জন্যে বছরে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে। অ্যারোনটিক এঞ্জিনিয়ার ও ডিজাইনাররা মহামূল্যবান ডিজাইন নিয়ে গায়েব হয়ে যায়। তাদের সবাই যে কিডন্যাপড হবার পর খুন হয় তা নয়, অনেককেই দেখা যায় প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীর শেয়ার কিনে ডিরেক্টর বনে গেছে। গোপন তথ্য বা ডিজাইন পাচার করার লোভটা সামলানো অত্যন্ত কঠিন, কারণ একবার মাত্র একটা অপরাধ করলেই সারা জীবন রাজার হালে থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়। অর্থাৎ এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে বেঈমান আর শত্রুর কোন অভাব নেই। এই অবস্থায় ইউরোপের মাটিতে বাংলাদেশী কোন কোম্পানী অর্থাৎ আই বি এ যদি অচিন পাখি বাজারে ছাড়ে, কি ঘটবে সহজেই অনুমান করা যায়। শত্রুতা ভুলে গিয়ে সবাই ওরা পরস্পরের সাথে হাত মেলাবে, তারপর কোমর বেঁধে লাগবে আই বি এ-র বিরুদ্ধে। কাজেই আই বি এ-র সিকিউরিটি হতে হবে নিশ্ছিদ্র। সে-ধরনের বিশেষ সিকিউরিটি বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাবার আশা করাটা হবে বোকামি, কারণ তারা শুধু টাকার বিনিময়ে দায় সারবে, ইস্পাত বাংলা বা অচিন পাখির সাথে তাদের আত্মার বা দেশপ্রেমের কোন সম্পর্ক থাকবে না। 'সেজন্যেই আমরা শুধু রানা এজেন্সির কথা ভেবেছি,' বললেন সালেহ চৌধুরী। 'সিকিউরিটির দায়িত্ব আপনারা যদি না নেন, প্রজেক্টের কাজ কয়েক বছর পিছিয়ে দেব আমরা।'

জবাবে রানা কিছু বলতে যাবে, ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হেসে ওকে থামিয়ে দিলেন সালেহ চৌধুরী। 'কারও মাথায় হাত বুলিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা

করছি আমরা, ব্যাপারটা তা নয়। দেশপ্রেম, আত্মার সম্পর্ক, এ-সব ছেঁদো কথা হয়ে দাঁড়ায় যদি না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়। তাই আমরা বোর্ড মীটিং ডেকে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সিদ্ধান্তটা হলো, আমাদের আই বি এ-র ডিরেক্টরের সংখ্যা একজন বাড়ানো হবে। এই মুহূর্তে আই বি এ-র মালিক আমরা তিনজন, আরেকজনকে নিলে চারজন হবে। এবার, মি. রানা, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে। আই বি এ-র সামগ্রিক নিরাপত্তার দিকটা দেখবে রানা এজেন্সি, বিনিময়ে আপনি পাবেন মালিকানার চার ভাগের একভাগ, সেই সাথে অন্যতম একজন ডিরেক্টরের সমস্ত সুযোগ ও অধিকার।'

ঘরের ভেতর বোমা পড়লেও বোধহয় এতটা বিস্মিত হত না রানা। এক সেকেন্ডের মধ্যে কয়েকটা বিষয় উপলব্ধি করল ও। এঁরা সিরিয়াস লোক। এমন একটা প্রস্তাব রেখেছেন, প্রত্যাখ্যাত হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বিনিময় মূল্যটা যে অস্বস্তিকর, তা-ও সত্যি। খানিকটা অপমানকরও বলা যায়, যদিও ইচ্ছাকৃত নয়। অযাচিতভাবে কেউ কিছু দান করতে চাইলেই কি তা নেয়া যায়?

সবিনয়ে মৃদু হাসল রানা। বলল, 'গোটা ব্যাপারটা আমার খুব ভাল লাগছে। দেশের লোক আপনারা, এত বড় একটা কাজে হাত দিতে যাচ্ছেন। আপনাদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেলে এমনিতেই আমি খুশি হব, মালিকানার প্রশ্ন উঠছে কেন?'

'না, মালিকানার অধিকার রানা এজেন্সির থাকতেই হবে,' জোর দিয়ে বললেন সালেহ চৌধুরী। 'রানা এজেন্সিরই স্বার্থ দেখবে রানা এজেন্সি, ঠিক তাই চাইছি আমরা। আমরা ইনসিস্ট করব…।'

মৃদু হাসিটুকু এখনও লেগে রয়েছে রানার ঠোঁটে। 'সেক্ষেত্রে আমাকে অনুমতি দিন, আই বি এ-র শেয়ারের দামটা আমি পরিশোধ করি। আপনাদের মত আমাকেও যদি একজন শেয়ার হোল্ডার হতে হয়, নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিতে চাই আমি। এছাড়া আমি এর সাথে নিজেকে জড়াব না। রানা এজেন্সি যে সার্ভিস দেবে তার ফি খুবই কম, সেটা আই বি এ প্রতি মাসে নিয়ম অনুসারে পরিশোধ করবে। আপনাদের উদ্যোগ আমার ভাল লেগেছে, কাজেই আই বি এ-তে আমি পুঁজি খাটাতে রাজি আছি।'

তিনজন ডিরেক্টর পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। এমন তাজ্জব কথা জীবনে যেন তাঁরা শোনেননি। পকেটের এক কানাকড়িও খরচ না করে কোটি কোটি ডলারের শেয়ার পেয়ে কেউ তা এভাবে প্রত্যাখ্যান করে?

সবার আগে সংবিৎ ফিরে পেলেন সালেহ চৌধুরী। রানার দিকে এক সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, তারপর জানতে চাইলেন, 'আপনি…মানে আপনার রানা এজেন্সি ইচ্ছে করলে আই বি এ-র এক চতুর্থাংশ শেয়ার কিনে নিতে পারে…?'

চেয়ারের পাশ থেকে ব্রীফকেসটা হাঁটুর ওপর তুলল রানা। 'অঙ্কটা যদি বলেন তো এখুনি আমি চেক লিখে দিই।'

আবার একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন ওঁরা।

'প্লীজ, মি. রানা,' সালেহ চৌধুরী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'অসংখ্য ধন্যবাদ।' রানার দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। করমর্দনের সময় বললেন, 'বাংলাদেশের ইনভেস্টিগেটিং ফার্ম ইউরোপ আর আমেরিকায় এত ভাল করছে, আমাদের জানা ছিল না। দেখা যাচ্ছে প্রথম হবার কোন সুযোগ আমাদের নেই, আমরা মাঠে নামার আগেই রানা এজেন্সি দেশের সুনাম বাড়াবার কাজটি শুরু করে দিয়েছে।' আবেগে, আনন্দে তাঁর গলা একটু যেন কেঁপে উঠল। 'আসলে আমরা পারি, মি. রানা। বাঙালীরা কম কিসে?'

চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্টকে ডেকে হিসাব-পত্র দেখা হলো। আই বি এ-র এক চতুর্থাংশ শেয়ারের দামটা ফিসফিস করে উচ্চারণ করলেন ভদ্রলোক, রানার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছেন যেন ভিনগ্রহের আজব কোন প্রাণীকে দেখছেন, মাথা নিচু করে খস খস করে চেক লিখল রানা, সেটা বাড়িয়ে দিল সালেহ চৌধুরীর দিকে। তিনি জানেন, রানার অ্যাকাউন্টে টাকা আছে কিনা পাঁচ মিনিটের মধ্যে জানা হয়ে যাবে চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্টের।

আই বি এ-র সিকিউরিটি সিস্টেম কি রকম হবে তা নিয়ে আরও আধঘণ্টা আলোচনা হলো সেদিন।

আজকের বোর্ড মীটিঙেও তিনজন ডিরেক্টরকে দেখতে পেল রানা। টেবিলের মাথায় বসেছেন সালেহ চৌধুরী। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন ভদ্রলোক, যদিও দেশ ছেড়ে কোথাও যাননি। সুন্দরবন এলাকার বাসিন্দা, বাবার একটা রাইফেল ছিল, নিজেও শিকার ভালবাসতেন, সেই রাইফেল নিয়ে জঙ্গলে গা ঢাকা দেন তিনি, চোরাগুপ্তা আক্রমণ চালিয়ে প্রচুর পাঞ্জাবী সেনা মারেন। স্বাধীনতার পর দেশের দুর্গতি লক্ষ করে তাঁর মন ভেঙে যায়, জমিজমা বিক্রি করে চলে আসেন ইউরোপে। না খেয়ে থেকেছেন, কিন্তু চাকরির খোঁজ করেননি। কমপিউটর কোর্স শেষ করেন তিনি, সেই সূত্র ধরে কমপিউটর মেরামতের কারখানা খোলেন। তাঁর উন্নতির ইতিহাস যেমন বিচিত্র তেমনি অবিশ্বাস্য। চেষ্টা করলে যে পারা যায়, তিনি তার একটা জ্যান্ত দৃষ্টান্ত। এই একই কথা বাকি সবার সম্পর্কেও বলা যায়।

রানাকে বোর্ডরুমে ঢুকতে দেখে দু'সারি দাঁতের মাঝখান থেকে পাইপটা নামালেন সালেহ চৌধুরী। 'নিউ ইয়র্কে মীটিং ডাকার জন্যে আমি দুঃখিত,' শুধু রানাকে নয়, টেবিলে বসা বাকি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি। 'তবে মনে হলো সবাইকে জড়ো করার জন্যে নিউ ইয়র্কই সবচেয়ে ভাল।' নিউ ইয়র্ক, জুরিখ, লন্ডন, টোকিও বা প্যারিস, আই বি এ-র ডিরেক্টরদের জন্যে সব শহরই সমান কথা, কারণ ব্যবসা উপলক্ষে প্রত্যেকেই ওঁরা প্রতিদিন দুনিয়ার এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত চষে বেড়াচ্ছেন। শামসুল হক বসেছেন সালেহ চৌধুরীর ডান পাশে। বাংলাদেশ ও আমেরিকার নাগরিক ভদ্রলোক। কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনি, বিজনেস অ্যাকাউন্ট্যান্সির জাদুকর বলা হয় তাঁকে। চাকরির আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে নিক্সন সরকারের

বিরাগভাজন হয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের উপমহাদেশ নীতির কট্টর সমালোচক তিনি।

দারা শিকদার বসেছেন সালেহ চৌধুরীর বাম পাশে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সুইজারল্যান্ডে ছিলেন, বর্বর পাকিস্তানী সৈনিকদের অত্যাচারের বিবরণ গোটা ইউরোপে প্রচার করেন তিনি। প্রথম জীবনের ব্যবসা রিয়েল এস্টেট। এমনিতে শান্ত, ভদ্র, কিন্তু রাজাকারদের নাম শুনলে হিংস্র বাঘ হয়ে ওঠেন।

গোলাকার টেবিলের শেষ অর্থাৎ চার নম্বর চেয়ারটায় বসল রানা।

একটা সমস্যা দেখা দেয়ায় ডাকা হয়েছে মীটিংটা। সালেহ চৌধুরীর অনুমতি পেয়ে প্রসঙ্গটা তুললেন শামসুল হক। 'এটাকে এখুনি আমি সমস্যা বলতে রাজি নই। আমার কাছে ব্যাপারটা ধাঁধার মত। গত হপ্তায় বোস্টনের পার্সোন্যাল লাইফ অ্যাশিউরেন্স কোম্পানী আই বি এ-র পাঁচ লাখ শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছে।'

'কত দাম পেয়েছে তারা?' জানতে চাইলেন দারা শিকদার।

'শুরুতে তিনশো পাঁচ, শেষের দিকে তিনশো তিন।'

'বাট দ্যাটস ক্রেজি,' বললেন দারা শিকদার। 'আজ সকালে ওরা লন্ডনে কোট করেছে তিনশো ছয় দশমিক দুই পাঁচ, আর দু'ঘণ্টা পর টোকিওতে যখন এক্সেচেঞ্জ খুলবে, বেচাকেনা শুরু হবে সন্দেহ নেই, তিনশো সাতে...।'

'আমি তা জানি। তবে আমাকে শেষ করতে দিন। জার্মানীর ডুসেসেগমে গত হপ্তায় তিন লাখ শেয়ার বিক্রি করেছে, গড়পড়তা দাম পেয়েছে তিনশো দুই দশমিক দুই...।'

'ওরা পাগল হয়ে গেছে!' দারা শিকদারের কণ্ঠে অবিশ্বাস, চোখ দুটো বিস্ফারিত।

'বলাই বাহুল্য, চোখের পলকে বিক্রি হয়ে যায় শেয়ারগুলো। তবে, সবই ছোট ছোট লটে, একা কেউ পঞ্চাশ হাজার ডলারের বেশি কেনেনি। শেয়ার ট্র্যান্সফারের গোটা ব্যাপারটা চেক করেছি আমি, তাই আমার জানার সুযোগ হয়েছে যে গত এক মাসে আই বি এ-র এক মিলিয়ন শেয়ার হাত বদল হয়েছে। গুরুতর তাৎপর্য হলো, শেয়ারগুলো বিক্রি করা হচ্ছে বড় হোল্ডিংগুলো থেকে, চলে যাচ্ছে ছোটখাট পুঁজিপতিদের হাতে।'

'দাম এখনও খুব একটা কমেনি,' বলল রানা। 'কিন্তু যদি কোন ফাইনানশিয়াল জার্নালিস্ট প্রশ্ন তোলে, দাম পড়ে যেতে বাধ্য। ত্রিশ দিনের মধ্যে দশ লাখ শেয়ার প্রত্যাশার চেয়ে কম দামে বিক্রি হলো, শেয়ার বাজারে প্রতিক্রিয়া তো হবেই।'

'শেয়ারগুলো বিক্রি হয়েছে ছোট ছোট অ্যামাউন্টে,' বললেন শামসুল হক, 'রেগুলার ব্রোকারদের মাধ্যমে, সেজন্যেই কোন আলোড়ন ওঠেনি। কিন্তু বিক্রির এই হার যদি না থামে, আই বি এ ইনস্টিটিউশনগুলোর আস্থা ধরে রাখতে পারবে না।'

সবাই ওঁরা চুপ করে থাকলেন, চিন্তা করছেন। দুনিয়ার সেরা ব্যবসা

প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে গঠিত সমিতি ওদের কোম্পানীকে নেতিবাচক ভোট দিয়েছে। সবার আগে মুখ খুললেন দারা শিকদার, 'কেউ হয়তো আমাদের বিরুদ্ধে গুজব ছড়াচ্ছে।'

'কিন্তু কি গুজব ছড়াবে?' জানতে চাইলেন সালেহ চৌধুরী, মাথা নিচু করে পাইপে তামাক ভরছেন। 'সবগুলো ফ্রন্টেই অত্যন্ত ভাল করছি আমরা। এঞ্জিনিয়ারিং, মাইনিং, স্টীল, এভিয়েশন—কোথাও কোন লোকসান নেই। শুধু অচিন পাখির সাফল্যই তো আমাদের সম্পর্কে দীর্ঘ মেয়াদি আস্থার ভাব এনে দিতে পারে। সবাই জানে, আমাদের উন্নতি ঠেকানো যাবে না। অচিন পাখি বর্তমান দুনিয়ার আকাশে সব চেয়ে নিরাপদ বিমান···।'

'সেজন্যেই সবার চোখ রয়েছে ওটার ওপর,' বলল রানা। 'ওটার যদি কিছু ঘটে···।'

'কি ঘটতে পারে? আমাদের বিমান শতকরা একশো ভাগ নিখুঁত। আমাদের লেটেস্ট ভি-টোল সংস্করণ সব ক'টা টেস্টে পূর্ণ পয়েন্ট পেয়ে উতরে গেছে। আকাশে তোলার জন্যে নিরাপদ বলে সার্টিফিকেট পেয়েছি আমরা, অর্ডার বুকেও কোন জায়গা খালি নেই। তাহলে?' সালেহ চৌধুরী নিরুদ্বিগ্ন, ঘন ঘন পাইপ টানছেন।

'তবু, বোঝাই যাচ্ছে, কেউ একজন গুজব ছড়াচ্ছে,' বললেন দারা শিকদার। 'গুজবটা ছড়ানো হচ্ছে ওপর মহল থেকে, স্টক এক্সেচেঞ্জের মেঝে থেকে নয়।'

'যাই করা হোক, কাজটা আন্তর্জাতিক মাপে করা হচ্ছে। দুনিয়ার চারদিক থেকে খবর আসছে পুঁজি প্রত্যাহারের। এই অবস্থায় সত্যিকার বড় অঙ্কের শেয়ার যদি কোন ইনস্টিটিউশন বিক্রি করে, পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।' শামসুল হকের চেহারা থমথম করছে।

'সেক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের,' বললেন সালেহ চৌধুরী, তাঁর কথায় বা চেহারায় কোন রকম চাঞ্চল্য নেই। 'আমরা যখন জানি, ধরে নিতে হবে আরও অনেকে জানে—আমরা কি করি দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে তারা। কাজেই প্রথমে আমরা এক ধরনের শো করব। প্রচারণা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি আমার অপছন্দ হলেও, একেবারে কিছু না করে লোকের দৃষ্টি কাড়া যাবে না। তুমি, দারা, পাবলিক রিলেশন্স-এর অজুহাতে এমন একটা অনুষ্ঠান করো, যেখানে আমাদের ব্যবসার আসল ছবিটা লোকে দেখতে পায়। বিশেষ করে ছোট পুঁজিপতি আর ব্রোকারদের আমন্ত্রণ জানাবে। তোমাকে স্বাধীনতা দেয়া হলো, যত খুশি খরচ করতে পারো। বড় হোল্ডিং কোম্পানী-গুলোকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ো না, কারণ আমি জানি ওরা গুজব ইত্যাদি ছোট পুঁজিপতি আর ব্রোকারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে।

'আপনি, মি. রানা, আরেকটা কাজ করবেন। গুজবের উৎস ঈর্ষা হতে পারে, আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের উন্নতি দেখে কারা জ্বলে-পুড়ে মরছে। গুজবের উৎসটা জানা গেলে আমাদের করণীয় পরিষ্কার হয়ে যাবে।

'আর তুমি, হক, তুমি মনোযোগ দাও পেপারওঅর্কে। গত কয়েক মাসে যত ডকুমেন্ট আমরা পাবলিককে দেখিয়েছি—প্রতিটি ব্যালেন্স শিট, প্রতিটি ফাইনানশিয়াল স্টেটমেন্ট—সবগুলো খুঁটিয়ে চেক করো। তোমার সম্পর্কে জানি, কাজেই কোথাও কোন সংশোধন লাগবে বলে মনে করি না। তবু সন্দেহ ভরা চোখে আবার সব একবার পরীক্ষা করো।' কথা শেষ করে মুখে পাইপ তুললেন সালেহ চৌধুরী।

খুক করে কেশে জড়তা কাটালেন শামসুল হক, তারপর বললেন, 'স্যার, আমার যেন মনে হচ্ছে, আপনার আস্তিনে কি যেন একটা লুকানো আছে।'

সালেহ চৌধুরীর ঠোঁটে দুর্লভ হাসি ফুটল। 'কি করে বুঝলে? তোমার কাছে কি মনের খবরও গোপন রাখা সম্ভব নয়?'

'আপনি ঘন ঘন পাইপ টানছেন, ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন মি. হক,' বলল রানা।

'তারমানে আপনিও লক্ষ করেছেন?' কৃত্রিম বিস্ময় ফুটল সালেহ চৌধুরীর চেহারায়। রানার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে শামসুল হকের দিকে তাকালেন তিনি। 'তবে শোনো। ইংল্যান্ডের সিংহাসনে যিনি বসবেন, প্রিন্স চার্লস, এবং তাঁর বাবা, হিজ রয়েল হাইনেস দ্য ডিউক অভ এডিনবার্গ, প্রিন্স ফিলিপ, দু'জনেই রাজপ্রাসাদের সংশ্লিষ্ট মহলের মাধ্যমে আমাকে জানিয়েছেন, তাঁরা অচিন পাখি সম্পর্কে ভারি আগ্রহী। তাঁদের এই আগ্রহের মর্ম হলো, অচিন পাখির কন্ট্রোলের সামনে বসার জন্যে তাঁরা ছটফট করছেন। আমার তরফ থেকে প্রস্তাব গেছে, তাঁদের শখ মেটাবার জন্যে একজোড়া ভি-টোল সংস্করণ সরবরাহ করা হবে। এমন হতে পারে, আমরা হয়তো রাজা আর রাজপুত্রকে রাজি করাতে পারব, অচিন পাখি যাতে বাকিংহাম প্রাসাদের সামনের উঠানে ল্যান্ড করতে পারে, ঠিক গার্ডদের পালা বদলের মুহূর্তটিতে...।'

একগাল হাসির সাথে দারা শিকদার বললেন, 'সন্দেহ নেই, ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়বেন স্বয়ং রানী আর রাজকন্যা অ্যানি, উঠানের চারদিকে ভিড় করে থাকবে হাজার হাজার ট্যুরিস্ট?'

'তোমার কল্পনায় একটা ভুল আছে। ঝুল-বারান্দায় ওঁদের সাথে বাংলাদেশের দূতাবাস প্রধানকে দেখতে পাচ্ছ না?'

'ও, হ্যাঁ, অবশ্যই...।' সবাই ওঁরা হেসে উঠলেন।

নিউ ইয়র্কের হার্ভার্ড ক্লাব থেকে কাজ শুরু করল রানা। ক্লাবে পৌঁছে দেখল, ওর জন্যে অপেক্ষা করছে জন ইস্টম্যান। লবি হয়ে স্মোকিং রূমে চলে এল ওরা, বসল কোনার একটা টেবিলে, রানা কফি না বিয়ার খাবে জেনে নিয়ে প্যাডে অর্ডার লিখল ইস্টম্যান, পাতাটা ছিঁড়ে ধরিয়ে দিল ওয়েটারের হাতে।

ড্রিঙ্কের জন্যে অপেক্ষা করার সময় আবহাওয়া ও কমন মার্কেট প্রসঙ্গে আলাপ করল ওরা। ফুটবল প্রসঙ্গ উঠতেই ইস্টম্যান সংশয় প্রকাশ করে জানাল, এত আয়োজন আর উৎসাহ-উদ্দীপনা সত্ত্বেও আমেরিকানরা সকারের ভক্ত হয়ে উঠবে কিনা সন্দেহ আছে তার। যথেষ্ট দেরি করে ফিরে এল

ওয়েটার, যে-কোন ব্যাপারে তাড়াহুড়ো এই ক্লাবে অমর্যাদাকর বলে গণ্য করা হয়।

'ব্যাপারটা কি বলো তো, রানা?' ওরা একা হতেই জানতে চাইল ইস্টম্যান। নিজের ব্যবসা শুরু করার আগে মাইকেল, মারফি, ম্যাডগার্ড অ্যান্ড জন-এর চেয়ারম্যান ছিল ইস্টম্যান। পঁচাশি সাল থেকে ব্রোকারেজ বিজনেসে বেশ ভাল করছে সে, বিশেষ ধরনের মক্কেলদের বিশেষ কেস নিয়ে মাথা ঘামায়। ব্যবসায় পাঁচ বছরের সুনাম আছে, কিন্তু কোম্পানীর তৈরি পণ্যের মান সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে বাজারে, মালিক তার কোম্পানীকে মার্কেটে পরিচিত করে তুলতে চায়—হয় চলতি বছর, কিংবা আগামী বছর—'উপদেশ' পাবার জন্যে জন ইস্টম্যানকে ভাড়া করল লোকটা। বাজার জরিপ করে ইস্টম্যান যদি বোঝে যে কোম্পানীর শেয়ার বাজারে মার খাবে, মক্কেলকে সত্যি কথাটাই বলবে সে। দুনিয়াখ্যাত এক অভিনেত্রীর কথা ধরা যাক। একটা কোম্পানীর সাথে ছবি করার চুক্তি রয়েছে তার। চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। কিন্তু প্রথমে কাউকে কিছু না জানিয়ে সে তার শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিতে চায়। জন ইস্টম্যানকে খুঁজে নেবে সে। এমজিএম থেকে অভিনেত্রীকে বের করে আনবে ইস্টম্যান, ঢোকাবে ফক্স-এ, ফক্স থেকে বের করে নিয়ে যাবে ইউনাইটেড আর্টিস্ট, সিবিএস, ওয়েস্টিং-হাউস বা অন্য কোন কোম্পানীতে, অভিনেত্রীর ভবিষ্যৎ স্বার্থের পক্ষে যেটা ভাল হয়। কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না কিভাবে কি করল ইস্টম্যান, কাজটা যার জন্যে করা হলো সে বাদে।

'ইস্পাত বাংলা এয়ারক্রাফটের পাঁচ লাখ শেয়ার পেলে কি করবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

নিঃশব্দে শিস দেয়ার ভঙ্গি করল ইস্টম্যান। 'তুমি বেচতে চাও…?'

'তা বলিনি। শুধু জানতে চাইছি পেলে কি করবে?'

'কত, আবার বলো!'

'পাঁচ লাখ…।'

ইস্টম্যানের কমপিউটর ব্রেন কাজ শুরু করল। পাঁচ লাখ শেয়ার, প্রতিটি শেয়ারের দাম তিন পাউন্ডের বেশি, সব মিলিয়ে মেলা টাকা। 'মাই গড, রানা! জানতাম তুমি মিসকিন নও, কিন্তু কখনও ভাবিনি যে এত টাকা লুকিয়ে রেখেছ…।'

এ-ধরনের মন্তব্য আর কেউ করলে অপমানকর বলে মনে করা যেত, কিন্তু চাঁছাছোলা ইস্টম্যানের স্বভাব সম্পর্কে জানা আছে রানার। গ্লাসে চুমুক দেয়ার ফাঁকে হাসল ও, বলল, 'আমার টাকা আসলে আমার নয়। এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না।'

'হাতে আমাদের সময় আছে কি রকম?' জানতে চাইল ইস্টম্যান।

'কোন সময় নেই।'

'মাই গড, রানা, ইচ্ছে করলেই এভাবে তুমি ইস্পাত বাংলা এয়ার-ক্রাফটের পাঁচ লাখ শেয়ার বাজারে ঢেলে দিতে পারো না, অন্তত যদি নিদেন

পক্ষে তিনশো করে দাম চাও।'

'আরও বেশি চাই আমি। তিনশো পাঁচ মিনিমাম…।'

'তাহলে বলব, শেয়ারগুলোকে তুমি ফরেন মার্কেটে ছাড়তে রাজি নও।'

'না, তবে সবগুলো এক লটে বিক্রি করতে চাই।'

'আচ্ছা। একবারে, তিনশো পাঁচ মিনিমাম, তবে জানা কথা যত বেশি হয় তত ভাল, বিদেশী বাজারে কম দামে ছাড়ার কোন ইচ্ছে নেই। কাজটা যখন আমাকে দিয়ে করাতে চাইছ, ধরে নিতে পারি ব্যাপারটা চুপচাপ সারতে হবে, যাতে কাকপক্ষীও টের না পায়?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কমিশন কত তা তো তুমি জানোই, তবে খরচাপাতি বেশি পড়বে। বুঝতেই পারছ, তোমার জন্যে সব দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হয় এমন একটা ইন্সটিটিউশন খুঁজে বের করতে হবে আমাকে। বেশিরভাগ ইন্সটিটিউশনই তো ইস্পাত বাংলার সাথে জড়িয়ে আছে।'

'খরচাপাতি যা লাগে লাগবে। ইস্পাত বাংলার সাথে জড়িয়ে নেই এমন একটা ইন্সটিটিউশন খুঁজে বের করো।'

নিজের গ্লাসটা খালি করল ইস্টম্যান। 'তোমার লাঞ্চের সময় হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে, মাথা নাড়ল রানা। 'তোমাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি? তুমি কি আই বি এ ছাড়ার কথা চিন্তা করছ? নিজের ব্যবসা শুরু করতে চাও, একা? দু'চারটে ভাল ব্যবসার কথা বলতে পারি তোমাকে, ইন্টারন্যাশনাল, যদি বলো তো…।'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রানা।

এক সেকেন্ড চিন্তা করল ইস্টম্যান। 'যে-সব শর্ত দিচ্ছ, ভাল একজন ক্রেতা খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে, বুঝতে পারছ তো?'

'আমি জানতাম, এ-লাইনে তুমিই সেরা লোক।'

'আমিই সেরা। তবে এক মহিলাও আছে, আমার চেয়ে খুব কম যায় না। তার কথা বোধহয় ভাবনি তুমি, তা-ই না? দারুণ সুন্দরী মহিলা। কার্লা মিসমোনা…'

'রোমে?'

'নিউ ইয়র্কে আছে সে। শোনা কথা, খুবই নাকি অতিথিপরায়ণ। বিশেষ করে সুদর্শন সুপুরুষ, কম বয়েসী তরতাজা যুবকদের প্রতি তার নাকি ভারি দুর্বলতা। ঠিকানাটা দেব নাকি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমার তোমাকেই পছন্দ, জন।' রানার নির্লিপ্ত চেহারা দেখে রসিকতার লাগাম টেনে ধরল ইস্টম্যান।

বলল, 'ঠিক আছে, দেখি তোমার জন্যে কি করতে পারি।'

তিন

ব্রিটিশ স্কাইব্রিজ এয়ারলাইন্স-এর ৫০০ নম্বর ফ্লাইট রোজ দুপুর বেলা নিউ

ইয়র্ক ছেড়ে যায়। অন্যান্য বারের মত সাতাশে সেপ্টেম্বরের ফ্লাইটেও কোন সীট খালি ছিল না। নিউ ইয়র্ক থেকে কাল সন্ধ্যায় লন্ডন পৌছে যাত্রার প্রথম পর্ব শেষ করেছে প্লেনটা, সাথে সাথে ওটার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে মেইন্টেন্যান্স এঞ্জিনিয়াররা—সারাটা রাত আর প্রায় পুরোটা সকাল ধরে পরীক্ষা করেছে বিমানের প্রতিটি পার্টস।

ভোর চারটের ঘটনা। স্টেথোস্কোপ প্রোব দিয়ে লেফট রাডার ট্রিমারের সার্ভো মেকানিজম পরীক্ষা করছে জহির আব্বাস। ইস্পাত বাংলার স্টাফ এঞ্জিনিয়ার সে, ব্রিটিশ স্কাইব্রিজ এয়ারলাইন্স-এর সাথে যুক্ত। আংশিক ক্ষয়ে যাওয়া বিয়ারিং থেকে সন্দেহজনক একটা শব্দ পেল সে। বিয়ারিংটা বদলাতে সকাল আটটা বেজে গেল। থ্রাস্ট রোলারগুলোর একটায় চুলের মত সরু ফাটল দেখা দিয়েছে। প্লেনটা আরও পঞ্চাশ হাজার মাইল উড়লেও রোলারটার কারণে কোন বিপদ হবার আশঙ্কা ছিল না, তবু সেটার ফটো তুলে প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে ইস্পাত বাংলার হার্টফোর্ডশায়ার ল্যাবে পাঠিয়ে দিল আব্বাস। তার ধারণা অনুসারে জিনিসটা যদি ত্রুটিযুক্ত হয়, ম্যানুফ্যাকচারারের বারোটা বাজিয়ে দেবে ইস্পাত বাংলা।

সাড়ে আটটার দিকে হাত ধুলো জহির আব্বাস, ডাফ ডানকানকে নিয়ে সাত নম্বর টার্মিনাল পেরিয়ে চলে এল ক্যান্টিনে, ব্রেকফাস্ট সারবে। ডানকানকে বলল, 'কাজ যা বাকি আছে, আশা করি বিসিএ-র হাতে প্লেনটা ফিরিয়ে দিতে এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না।'

ডাফ ডানকান চিরকালই অগোছাল আর নার্ভাস প্রকৃতির লোক, এঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে সাধারণত যা দেখা যায় না। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা, দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থে বেশি। হাতে তেল আর গ্রিজ লেগে থাকলেও, প্রায় সময়ই দেখা যায় দাঁত দিয়ে নখ কাটছে সে—এই যেমন এখন। একটা টেবিলে নিয়ে বসাল আব্বাসকে।

ডিম, সসেজ, টোস্ট আর মারমালেড চাইল ওরা। জহির আব্বাস কফি চাইল, ডাফ ডানকান চা। ডানকানের নির্বাচিত টেবিলে চিনি নেই, নিজেই উঠে গিয়ে কাউন্টার থেকে নিয়ে এল আব্বাস।

আব্বাস টেবিল ছাড়া মাত্র তরল পদার্থ ভরা ছোট শিশিটা পকেট থেকে বের করল ডানকান। কেউ তাকে লক্ষ করছে কিনা দেখে নিয়ে তরল পদার্থটুকু ঢেলে দিল কফির কাপে। তাকে বলা হয়েছে, জিনিসটার স্বাদ, গন্ধ বা রঙ নেই। তবু উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে থাকল ডানকান, আব্বাস ফিরে এসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। 'ঠিক এরকম কড়া কফিই দরকার ছিল আমার,' কাপটা খালি করে বলল আব্বাস।

চোখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল ডানকান। ঢোক গিলল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল আব্বাস, তারপর ডানকানের দিকে ফিরল। 'শুধু শুধু দুশ্চিন্তা কোরো না তো। নতুন বিয়ারিংটা নিখুঁত কাজ করছে। একটানা পাঁচ মিনিট ওটার শব্দ শুনেছি আমি। সত্যি, তোমার হাত

খুব ভাল। তুমি সাথে না থাকলে বিয়ারিংটা বসাতে হিমশিম খেয়ে যেতাম আমরা। যান্ত্রিক ক্রটির কারণে কোন অচিন পাখিকে মাটিতে বসিয়ে রাখতে একদম রাজি নই আমি, কিন্তু বিয়ারিংটা যদি ঠিকমত না বসত, আমি বাধ্য হতাম। যাই হোক, সব ভালয় ভালয় সারা গেছে, কাজেই মনটাকে এবার শান্ত করো…।'

বিলে সই করল আব্বাস, অ্যাপ্রন পেরিয়ে অচিন পাখির কাছে চলে এল ওরা। একসাথে প্লেনে উঠল দু'জন, বসল কন্ট্রোলে। 'ওকে, ডানকান,' বলল আব্বাস, 'এসো, সব ক'টাকে দৌড় খাটাই।' রুটিন এঞ্জিন চেক—সব ক'জন আরোহীকে নিয়ে আকাশে ওঠার আগের মুহূর্তে যা যা চেক করবে পাইলট, ওরাও সেগুলো চেক করল। এক এক করে চালু করা হলো চারটে এঞ্জিন। এঞ্জিনের বিভিন্ন পর্যায়ের গতি নোট করা হলো প্যাডে। মিটার রীডিং দেখে টিক চিহ্ন দেয়া হলো ছাপা তালিকায়। অয়েল প্রেশার, ইলেকট্রিক চার্জ পজিটিভ/নেগেটিভ, টেমপারেচার, এয়ার ফ্লো, অয়েল ফ্লো—সব ঠিক আছে। দীর্ঘ তালিকা, টিক চিহ্নের সংখ্যা বাড়তে লাগল। প্রথম পাতাটা ওল্টাল আব্বাস, তারপর দ্বিতীয় পাতাটা।

এক সময় শেষ পাতায় পৌঁছুল সে। কোথাও কোন রকম ক্রটি বা অসঙ্গতি আছে বলে মনে হচ্ছে না, তবু নিজেকে সন্তুষ্ট হতে দিল না জহির আব্বাস। দেয়ই বা কিভাবে, প্রাচীন স্কুল শিক্ষকের মত নার্ভাস ডানকান যেখানে পাশে বসে নজর রাখছে ছাত্র ভুল করে কিনা দেখার জন্যে! অথচ উদ্বিগ্ন হবার মত কোন কারণই খুঁজে পেল না আব্বাস, ডানকানের আচরণ তার বোধগম্য হলো না।

'শান্ত হও তো,' আব্বাস বলল, লক্ষ করল নতুন আরেকটা নখে কামড় দিচ্ছে ডানকান। মিটার রীডিং চেক শেষ করল সে, হেলান দিল সীটে, শিথিল করে দিল পেশী। হঠাৎ প্যানেলের ঘড়ির ওপর চোখ পড়তে বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ জোড়া, ঝট করে নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। 'মাই গড! এত বেলা হয়ে গেছে!' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল সে।

প্লেন থেকে একসাথে নামল ওরা। ফিউজিলাজের দিকে এগোল আব্বাস, শক-প্রুফ মাউন্টিঙে ব্ল্যাক বক্সটা চেক করল। চরম কোন বিপর্যয়ে পড়ে প্লেনটা যদি বিধ্বস্ত হয়, মেকানিক্যাল কারণগুলো ওটার মাধ্যমে জানা যাবে। বক্সটাকে 'রেকর্ড'-এ সেট করল সে, তারপর ঢাকনিতে তালা দিল। এমনকি প্রথম এঞ্জিন চালু হবার আগে থেকেই প্লেনের গতিবিধি নোট করবে ব্ল্যাক বক্স, প্লেনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। শেষ এঞ্জিনটা বন্ধ হবার পরই শুধু রেকর্ডের কাজ থামবে।

ইস্পাত বাংলার সিকিউরিটি গার্ড টেইলপ্লেনের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, শিকারী কুকুরের মত সতর্ক। 'ইট'স অল ইওরস,' বলল আব্বাস, নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল গার্ড। এয়ারলাইন স্টাফরা দায়িত্ব নেয়ার আগে প্লেনটার কাছাকাছি ঘেঁষতে পারবে না কেউ।

আব্বাস আর ডানকান একসাথে চীফ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে ঢুকল, চেক

লিস্টের কার্বন কপিটা হাতবদল করল আব্বাস, মূল কপিটা নিজের অফিসের জন্যে কাছে রাখল।

'বাড়ি ফিরে ঘুম দেবে, ডানকান?' জিজ্ঞেস করল সে।

বিড়বিড় করে কি বলল ডানকান ঠিক বোঝা গেল না। হঠাৎ করে তার প্রতি সহানুভূতি জাগল আব্বাসের।

ডানকানের মা ও বাবা, দু'জনেই বাতে পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। শুধু বাত হলেও কথা ছিল—মায়ের ডায়াবেটিস, যা কোন দিন ভাল হবে না, বাবার ক্যানসার, অপারেশন সম্ভব নয়। যেকোন মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে; তাই কোন হাসপাতালই ওদেরকে নিতে রাজি নয়, অথচ সারাক্ষণ সেবা-শুশ্রূষা দরকার। যতটুকু পারে একাই করে ডানকান, স্ত্রীর কাছ থেকে কোন সাহায্য পায় না। টাকা-পয়সার টানাটানি, মাঝে মধ্যে দু'চারদিনের জন্যে নার্স রাখার সামর্থ্য হয়। সেখানেও সমস্যা, তার স্ত্রী খিটখিটে মহিলা, নার্সদের সাথে একদম বনিবনা হয় না। একটাই ছেলে ওদের, তাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার কাজটাও ডানকানকে করতে হয়। উফ্, কী জীবন, ভাবল আব্বাস। ডানকান যে দাঁত দিয়ে নখ কামড়ায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভাগ্যই বলতে হবে ঘুম খুব কম হয় ডানকানের। তা না হলে মা-বাবার কোন সেবাই তার দ্বারা হত না। কোন কোন ডিউটির রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করেছে আব্বাস, কিন্তু কোন সমাধান বেরোয়নি। বাড়ি ফিরে কাপড়চোপড় ছাড়া হয় না বেচারার, মা-বাবার কামরায় ছুটে যায়। বিকেলে ডিউটিতে আসার আগে আরেকবার তাদের খোঁজখবর নেয়। ঘুম বলতে দুপুরের দিকে দুই কি আড়াই ঘণ্টা। সাধারণত সকাল সাতটার দিকে এয়ারপোর্ট থেকে ছাড়া পায় সে, কিন্তু মাঝে মধ্যে অনেক বেলা হয়ে যায়, এই যেমন আজ।

কার পার্ক এন্ট্রান্স-এর কাছে ডানকানকে বিদায় জানাল আব্বাস। ঘুরে হাঁটা ধরল অ্যাসফল্ট মোড়া চৌরাস্তার দিকে, আই বি এ-র অফিসটা ওদিকেই। দু'তলা বিল্ডিং, সম্প্রতি তৈরি করা হয়েছে। বাইরেটা ইঁট আর কংক্রিট দিয়ে মোড়া হলেও, ভেতরের কাঠামো কঠিন ইস্পাতের। জানালার কাঁচগুলো বুলেটপ্রূফ, দরজার তালা অর্ডার দিয়ে তৈরি করানো, মাস্টার কী ব্যবহার করেও খোলা যাবে না। বিল্ডিঙের প্রতিটি কোণে চারটে পোল-এর ওপর রয়েছে সার্চলাইট, বাইরের কেউ চুপিচুপি ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না। বিল্ডিংটাকে ঘিরে রয়েছে ইস্পাত ও কংক্রিট দিয়ে তৈরি বাংকার।

বাইরের দরজা খুলে ছোট লবিতে চলে এল জহির আব্বাস। দশটা বাজে। আয়েশা, রিসেপশনিস্ট তথা টেলিফোন অপারেটর, এক কোণে নিজের ডেস্কে বসে আছে। তার পিছনে বোর্ডে এঞ্জিনিয়ারদের নাম ছাপা রয়েছে। প্রতিটি নামের পাশে 'আউট' লেখা। জহির আব্বাসকে ঢুকতে দেখেই তার নামের পাশে 'ইন' লিখল আয়েশা। লবিটা কিভাবে পেরিয়ে এল আব্বাস, বলতে পারবে না সে। কপাল থেকে এখন হু হু করে ঘাম বেরিয়ে আসছে, অনুভব করছে পাঁজর আর ঊরু বেয়ে নেমে যাচ্ছে কয়েকটা ধারা।

তার নিজের অফিস কামরা দোতলায়, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে জান বেরিয়ে যাবার উপক্রম হলো। 'আপনি অসুস্থ নাকি, আব্বাস ভাই?' পিছন থেকে উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল আয়েশা।

অলসভঙ্গিতে দুর্বল হাতটা নাড়ল আব্বাস, পিছন ফিরে তাকাল না, ধাপের ওপর থামলও না। সিঁড়ির মাথাতেই তার কামরা, সেক্রেটারির কামরা হয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। শিরিন আখতার একটা রিপোর্ট টাইপ করছে। ইমিডিয়েট বসের অবস্থা দেখে 'গুডমর্নিং'টা মুখেই আটকে গেল তার। চেয়ার ছাড়তে যাচ্ছে, হাত নেড়ে তাকে বারণ করল আব্বাস।

'আমার কিছু হয়নি,' বলল সে। 'একটু গরম লাগছে।'

নিজের কামরায় ঢুকল আব্বাস, কিন্তু চেয়ারে বসতে সাহস হলো না। অনুভব করল বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড, গায়ের চামড়া পুড়ছে, যেন গরম পানিতে গোসল করছে সে। অথচ গায়ের ঘাম ঠাণ্ডা, কেমন যেন একটা গন্ধও পাচ্ছে।

ডেস্কে তিনটে টেলিফোন। একটা বিল্ডিঙের ভেতর যোগাযোগ করার জন্যে। দ্বিতীয়টা আয়েশা ও শিরিন আখতারের মাধ্যমে সাধারণ এক্সচেঞ্জের সাথে যোগাযোগ করার জন্যে। তৃতীয়টা রেডিও টেলিফোন, সাথে রয়েছে স্ক্যাম্বলার মেকানিজম। এক কোণে রয়েছে রেডিও, ওটার সাহায্যে এয়ারপোর্টের যে-কোন আই বি এ এঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলতে পারে সে—গার্ড ও এঞ্জিনিয়ারদের প্রত্যেকের সাথে একটা করে ওয়াকি-টকি আছে। রেডিওর পাশে রয়েছে একটা টেপ-রেকর্ডার। টলতে টলতে কামরার মেঝেটুকু পেরুল সে, টেপ-রেকর্ডারটা চালু করল। স্ক্যাম্বলারে এখন যা-ই বলা হোক, সব রেকর্ড হয়ে যাবে।

রুমাল বের করে মুখটা মুছল আব্বাস। কাপড়টা সাথে সাথে ভিজে আর ভারী হয়ে গেল। রুমালটা ডেস্কের ওপর রেখে দিয়ে কিউবিকল থেকে তোয়ালে নামাল, সেটা দিয়ে ঘাড় আর গলা, হাত আর মুখ ভাল করে মুছল। মুছতে না মুছতে আবার ভিজে গেল চামড়া। চোখের দৃষ্টি ঠিক আছে, শ্বাস-প্রশ্বাস আগের চেয়ে ভাল, হৃৎপিণ্ড এখন আর লাফাচ্ছে না। হাতটা নিজের সামনে লম্বা করে দিল আব্বাস। পাথরের মত স্থির। মাথাটাও ঠিকমত কাজ করছে, চিন্তা-ভাবনা জট পাকিয়ে যাচ্ছে না। শুধু স্মৃতিতে বিশাল একটা গর্ত তৈরি হয়েছে। প্লেনে বসে তালিকায় টিক চিহ্ন দিয়েছে সে, কিন্তু তালিকার মাঝামাঝি জায়গার কোন বিবরণ মনে করতে পারছে না। শুরুটা পরিষ্কার মনে আছে, এক ও দু'নম্বর পাতায় কি আছে বলতে পারবে। শেষটাও মনে করতে পারছে, দশ ও এগারো পাতার পুরোটা। কিন্তু, হায় আল্লা, মাঝখানের পাতাগুলোর কথা মনে নেই কেন? মনে আছে, ওর পাশে বসেছিল ডানকান, হাতের নখ খুঁটছিল দাঁত দিয়ে, রোজকার মত নার্ভাস হলেও প্রতিটি জিনিস বারবার করে চেক করে দেখে নিচ্ছিল। ভাব, মিয়া, ভাব! ডায়ালগুলোয় কি দেখেছ স্মরণ করার চেষ্টা করো। ভাব, চিন্তা করো! তিন নম্বর পাতায় কি আছে তুমি জানো। কিন্তু চেক করার সময় কি দেখেছ মনে করতে পারছ না

কেন?

প্যাডটার ওপর চোখ বুলাল আব্বাস। এক ও দু'নম্বর পাতার প্রতিটি বিষয়ের পাশে টিক চিহ্ন রয়েছে। পাতা উল্টে তিন নম্বরে চোখ রাখল, ধারণা করল টিক চিহ্ন দেখতে পাবে না। কিন্তু না, প্রতিটি বিষয়ের পাশেই টিক চিহ্ন রয়েছে। কালো পেলিক্যান কালি, নিজের কলমে এই কালিই ব্যবহার করে সে। চার নম্বর পাতায়ও তাই, সব ক'টা টিক চিহ্ন দেয়া হয়েছে। কিন্তু…তাহলে…মনে করতে পারছে না কেন? ছ'নম্বর পাতা। অন্তত এটার কথা তো তার মনে থাকবেই, কারণ থ্রাস্ট বিয়ারিংটা বদলেছে তারা। ছ'নম্বর পাতায় পাঁচটা টিক চিহ্ন দেখে নিশ্চিতভাবে বোঝা গেল, থ্রাস্ট বিয়ারিংটা ঠিকভাবেই বসানো হয়েছে। কথাটা তার মনে থাকা উচিত। এই তো মাত্র খানিক আগে বদলেছে তারা এটা। কিন্তু দু'নম্বর পাতার টিক চিহ্নগুলো তার কলমের সাহায্যে দেয়া হলেও, দেয়ার কথা তার মনে নেই। সেই সময়টা ওর স্মৃতিতে কোন ছাপ ফেলেনি। কেন? রহস্যটা কি?

স্ক্যাম্বলার টেলিফোন তুলে নিয়ে বিশেষ একটা নম্বরে ডায়াল করল আব্বাস। মিষ্টি নারীকণ্ঠ সাড়া দিল, 'ফোর, জিরো।'

'ওয়ান ওয়ান ফাইভ। এ ওয়ান। ফোর,' জবাব দিল আব্বাস। সাঙ্কেতিক শব্দগুলোর অর্থ সাথে সাথে বুঝতে পারল মেয়েটা। 'আমি আই বি এ-র স্টাফ এঞ্জিনিয়ার ব্রিটিশ স্কাইব্রিজ হিথরো থেকে বলছি (ওয়ান ওয়ান ফাইভ)। অত্যন্ত জরুরী বার্তা দিতে চাই, দেরি করানো যাবে না (এ ওয়ান)। জনাব মাসুদ রানার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিন (ফোর)।'

অনুরোধ জানিয়ে ক্রেডলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সে।

এখনও দরদর করে ঘামছে আব্বাস। মাসুদ ভাই কোথায় আছেন কে জানে, ভাবল সে। তবে, দুনিয়ার যে-প্রান্তেই থাকুন তিনি, ওরা তাঁকে কিছুক্ষণের মধ্যেই খুঁজে বার করবে। কিছুক্ষণ মানে কতক্ষণ? অস্থির হয়ে উঠল আব্বাস। আবার টেলিফোনের রিসিভার তুলল সে। একই নম্বরে ডায়াল করল। সাড়া দিল মেয়েটা, 'ফোর, জিরো।'

আব্বাস বলল, 'ওয়ান ওয়ান ফাইভ। এ ওয়ান। থারটিথ্রী।'

(৩৩) মানে, আমার একজন ডাক্তার দরকার।

'কোথায়?'

'আমার অফিসে, এ ওয়ান।'

'প্রথমবারই বুঝেছি,' বলল মেয়েটা। 'কোন্টা আগে দরকার আপনার? এইমাত্র আমি লাইনে পেলাম ফোরকে।'

'তার সাথে কথা বলব আগে, সেই ফাঁকে আপনি তেত্রিশের ব্যবস্থা করুন।'

'চিন্তা করবেন না। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ব্যবস্থা করছি।'

যান্ত্রিক শব্দকোলাহল শোনা গেল অপরপ্রান্তে, তারপর মাসুদ রানার পরিচিত ভরাট কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'মাসুদ ভাই, আমরা যদি কলটা শেষ করতে না পারি…নাইন নাইন.

সেভেন. ফাইভ জিরো জিরো/জিরো এইট/ওয়ান ওয়ান।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা, অর্থটা মনে মনে আওড়াল। 'আমরা যদি কলটা শেষ করতে না পারি, ব্রিটিশ স্কাইব্রিজ নিউ ইয়র্ক ফ্লাইট ৫০০ বাতিল করে দিতে হবে, দেখতে হবে মেইন্টেন্যান্সের কাজ কোথাও অসম্পূর্ণ আছে কিনা (জিরো সেভেন), কোথাও কোন মেকানিক্যাল ত্রুটি আছে কিনা (জিরো এইট), বা কোথাও কিছু স্যাবোটাজ করা হয়েছে কিনা (ওয়ান ওয়ান)।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তোমার কিছু দরকার আছে?'

'তেত্রিশ চেয়ে আগেই মেসেজ দিয়েছি।'

'গুড ম্যান। হোয়াট'স দ্য স্টোরি?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না...আপনার মনে হতে পারে আমি পাগল হয়ে গেছি। আজ সকালে প্রি-ফ্লাইট চেক করেছি...।'

'ব্রিটিশ স্কাইব্রিজ ফ্লাইট ৫০০?'

'হ্যাঁ। মেইন্টেন্যান্সের কাজে আধ ঘণ্টা বেশি সময় লাগে আমাদের। রাতে আমরা একটা বিয়ারিং বদলেছি। পার্টটার নম্বর...এবিসেভেন/ওয়ান ফোর ফোর ফোর থ্রী নাইন/সেভেন জিরো জিরো জিরো ওয়ান...।'

'লিখে নিয়েছি। প্রি-ফ্লাইটে এত সময় লাগল কেন?'

'সেটাই আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। সম্পূর্ণ নরম্যাল চেক ছিল। বিয়ারিংটা ঠিকমত, সহজেই বসানো হয়। প্রতিটা বিষয় আমি নিজে চেক করেছি, ডানকানও চেক করেছে...কিন্তু...কিন্তু, দু'নম্বর পাতার পর থেকে দশ নম্বরের আগে পর্যন্ত চেকিঙের কোন ঘটনা আমি মনে করতে পারছি না। স্মৃতি থেকে ওই সময়ের ঘটনাগুলো সম্পূর্ণ মুছে গেছে...।'

'স্টারবোর্ড লিঙ্ক কানেকটর-এর অয়েল প্রেশার কত ছিল?'

'ওটার কথাই বলছি আমি। ধেত্তেরি, পুরানো স্মৃতি থেকে আমি আপনাকে বলতে পারি ওই রীডিংটা লিখতে হয় চার নম্বর পাতায়...।'

'ওটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রীডিং, আব্বাস। নিশ্চয়ই তুমি...।'

'জানি, মাসুদ ভাই, জানি! কিন্তু রীডিংটা আজ কি ছিল মনে পড়ছে না...যেন রীডিংটা আমি আজ দেখিইনি। অথচ চেক লিস্টে টিক চিহ্ন দেয়া রয়েছে। তারমানে নিশ্চয়ই আমি ওটা পড়েছি, রীডিংটাও ঠিক ছিল, তা না হলে টিক চিহ্ন দেব কেন! কিন্তু মনে নেই...।'

'আর কিছু?' দ্রুত জানতে চাইল রানা। 'চেক করতে আধঘণ্টার বেশি সময় লাগে, অনেক ঘটনার খুঁটিনাটি তুমি মনে করতে পারছ না, যদিও তালিকায় টিক চিহ্ন দিয়েছ তুমি...আর কিছু, আব্বাস?'

'হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার। অসম্ভব ঘামছি আমি। জীবনে এভাবে কখনও ঘামিনি। শরীরটা সব সময় ফিট রাখি, তাই ঘামটাম আমার হয়ই না বলতে গেলে...দু'গেম স্কোয়াশ খেলেও ঘামি না। কিন্তু কেন কে জানে খানিক আগে থেকে দরদর করে ঘামছি...।'

'আজ কিছু খেয়েছ?'

'সাত নম্বর বিল্ডিঙে ব্রেকফাস্ট করেছি।'

'কার সাথে?'
'আমার সাথে ডাফ ডানকান ছিল, স্কাইব্রিজের।'
'চা বা কফি খেয়েছ?'
'কফি।'
'টেবিল ছেড়ে কোথাও গিয়েছিলে?'
ভেবে দেখার জন্যে সময় নিল আব্বাস, সহজে মনে পড়ল না। ইতোমধ্যে গোটা মুখ ভিজে গেছে ঘামে। 'হ্যাঁ, চিন্তা করতে গিয়ে মনে পড়ল। চিনি আনার জন্যে একবার উঠেছিলাম।'
'টেবিলে আর কেউ ছিল? নাকি শুধু ডাফ ডানকান?'
'শুধু আমরা দু'জন।'
'এই মুহূর্তে কোথায় সে, জানো?'
'নিশ্চয়ই বাড়িতে।'
'মা-বাবার সাথে একই বাড়িতে থাকে।'
'আপনার মনে আছে, মাসুদ ভাই?'
'এখনও কি তারা অসুস্থ? কি যেন···ডায়াবেটিস আর ক্যানসার?'
'সেই সাথে বাত। ডানকান নিজেই সেবা করে তাদের···।'
'নিজের পালস গোনো, আমাকে শোনাও,' নির্দেশ দিল রানা।
শিরার ওপর আঙুল রেখে গুনতে শুরু করল আব্বাস।
'ঠিক আছে, থামো এবার।'
হঠাৎ নক হলো দরজায়। ঘাড় ফেরাতেই শিরিন আখতারকে দেখতে পেল আব্বাস, পিছনে চশমা পরা এক যুবক, হাতে কালো একটা ব্যাগ। 'উনি একজন ডাক্তার, স্যার। বলছেন, আপনি তাকে ডেকেছেন।'
'হ্যাঁ,' বলল আব্বাস।
দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল ডাক্তার, ব্যাগটা ডেস্কের ওপর রাখল।
'ইটস থারটি থ্রী,' ফোনের রিসিভারে বলল আব্বাস।
'লাইনে আছি আমি, তোমাকে পরীক্ষা করে কি বলে শুনব।'
আব্বাসের দিকে হাসিমুখে এগিয়ে এল ডাক্তার। 'সমস্যাটা কি?'
ডাক্তারের উদ্দেশে চিৎকার করার ঝোঁকটা অনেক কষ্টে দমন করল আব্বাস। 'সন্দেহ করছি আমাকে কিছু খাইয়ে দেয়া হয়েছে।'
আব্বাসের চোখের একটা পাতা উল্টে দেখল ডাক্তার। ব্যাগ থেকে ছোট একটা টর্চ বের করে চোখে আলো ফেলল। 'কি হতে পারে জিনিসটা, আপনার কোন ধারণা আছে—ড্রাগ বা পয়জন?'
'পার্থক্যটা কি?'
'ড্রাগ হলে আপনি জ্ঞান হারাবেন, পয়জন হলে পটল তুলবেন।'
'আপনি তো দেখছি ভারি রসিক···।'
'হাঁ করুন।'
'আজ সকালে মুখ ধোয়া হয়নি···।'
'ওটা কোন সমস্যাই নয়। খানিক পরই হয়তো আমরা আপনার পেট

থেকে সমস্ত আবর্জনা পাম্পের সাহায্যে বের করে আনব।'

দ্রুত, দক্ষতার সাথে আব্বাসকে পরীক্ষা করল ডাক্তার। পালস রেট, ব্লাড প্রেশার, হার্টবিট, স্কিন টেমপারেচার, কিছুই বাদ দিল না। পরীক্ষা শেষ করে আব্বাসকে সোফায় শুয়ে পড়তে বলল সে। ধীর পায়ে হেঁটে চলে এল টেলিফোনটার কাছে। রিসিভার তুলে বলল, 'মাসুদ ভাই? আমি তরুণ চ্যাটার্জি।'

'কি বুঝলে, তরুণ?'

'ওঁর ধারণা, ওকে ড্রাগ খাওয়ানো হয়েছে। ড্রাগ কিংবা পয়জন। কিন্তু আমার পরীক্ষায় কিছুই ধরা পড়ছে না। হার্ট, পালস, টেমপারেচার সামান্য অস্বাভাবিক। অবশ্যি খুব বেশি ঘামছেন, তবে সেটা অতিরিক্ত ভয়ের কারণেও হতে পারে। উনি যদি মনে করেন ওনাকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে…।'

'তোমার সাজেশন কি?'

'এদিকে একটা নার্সিং হোম আছে, বেশি দূরে নয়। হোমটার সাথে ছোট একটা ল্যাবও আছে। ওনাকে ওখানে ভালভাবে পরীক্ষা করতে পারব। দু'জন কনসালট্যান্টকেও ডাকা দরকার বলে মনে করছি।'

'ল্যাবটা নিরাপদ তো?'

'অবশ্যই, মাসুদ ভাই।'

'নাড়াচাড়া করলে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাবে না তো?'

'আমার তা মনে হয় না। আমি তো তার অসুস্থতার কোন কারণই দেখতে পাচ্ছি না।'

'রিসিভারটা ওকে একটু দেবে? ধন্যবাদ, তরুণ—খুব তাড়াতাড়ি আসতে পারায়।'

'ঘটনাক্রমে এয়ারপোর্টেই ছিলাম আমি, মাসুদ ভাই।'

সোফায় আধ শোয়া ভঙ্গিতে বসে রয়েছে আব্বাস, ফোনের রিসিভারটা তার হাতে ধরিয়ে দিল ডাক্তার। দেখল, ঘামে তার সমস্ত কাপড়চোপড় ভিজে গেছে। মুখ দেখে মনে হলো, এই মাত্র যেন শাওয়ারের নিচে থেকে সরে এসেছে, তোয়ালে ব্যবহার করেনি।

ডাক্তারের সব কথাই শুনতে পেয়েছে আব্বাস। তার পরীক্ষায় তেমন কোন অসুস্থতা ধরা পড়েনি। কিন্তু তবু ঘামছে সে। রিসিভারটা নেয়ার সময় ডাক্তার তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল। ভাবছে, শুধুই কি ভয়? শুধু ভয়ে কেউ কি এরকম ঘামে? ভয় ছাড়াও আরও অনেক কারণে ঘামতে পারে মানুষ…।

রিসিভারটা কানে ঠেকিয়ে নরম সুরে বলল আব্বাস, 'আমি আব্বাস, মাসুদ ভাই…।' বলেই মারা গেল স্টাফ আই বি এ-র এঞ্জিনিয়ার জহির আব্বাস, তার হাত থেকে খসে পড়ল টেলিফোনের রিসিভার।

চার

জহির আব্বাসের সাথে টেলিফোনে কথা বলল রানা হংকং থেকে। খানিক আগে ইয়াকোমো টোমা-র কাছে আই বি এ-র পাঁচ লাখ শেয়ারের জন্যে একটা দর চেয়েছে ও। জানে, আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেটে কথাটা পাড়বে টোমা, কোটেশন আসবে সুইজারল্যান্ড থেকে। টোমা তার সহজাত জাপানী ব্যবসা-বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছে, ইস্পাত বাংলা এয়ারক্রাফটের পাঁচ লাখ শেয়ার জীবনে কোনদিনই দেখতে পাবে না সে, প্রাপ্য এক হাজার আমেরিকান ডলার 'কনসালটেশন' ফি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাকে। এই এক হাজার ডলার সায়গনের কালোবাজারে পাঁচ হাজার ডলার সমমানে বিক্রি করা যাবে, কাজেই শেয়ার বিক্রি করার নিছক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে তার আপত্তি থাকার কারণ নেই। রানার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে উঠেপড়ে লাগল সে, জানে সফল হলে রানা তাকে আরও এক হাজার ডলার দেবে। টোমা আই বি এ-র অফিস থেকে মাত্র বেরিয়ে গেছে, এই সময় হিথরো থেকে টেলিফোন এল। জহির আব্বাস আর ডাক্তারের সাথে উপগ্রহের মাধ্যমে কথা বলল রানা। রিসিভার নামিয়ে রাখার দু'ঘণ্টা পর আই বি এ-র একটা এক্সিকিউটিভ অচিন পাখি হংকং থেকে রওনা হলো ওকে নিয়ে। প্লেন টেক-অফ করার আগে কয়েকটা নির্দেশ পাঠাল ও। ব্রিটিশ স্কাইব্রিজ এয়ারলাইন্সের ৫০০ নম্বর ফ্লাইট বাতিল করা হলো না, অন্য একটা অচিন পাখি পাঠানো হলো হিথরোতে। ত্রুটিযুক্ত প্লেনটাকে ট্রাক্টর-এর সাহায্যে টেনে আনা হলো আই বি এ-র হ্যাঙ্গারে, চারদিক থেকে সেটাকে ঘিরে থাকল সিকিউরিটির লোকজন। হ্যাঙ্গারে নিয়ে আসার সাথে সাথে এঞ্জিনিয়াররা কাজে লেগে গেল, প্লেনটার প্রতিটি পার্টস খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবে তারা। ব্রিটিশ স্কাইব্রিজ ইস্পাত বাংলার হেড অফিসে লিখিত অভিযোগ জানাল, কিন্তু কোম্পানীর ল ইয়ার চুক্তিপত্র খুলে দেখিয়ে দিল, কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই যে-কোন সময় সার্ভিস থেকে একটা অচিন পাখিকে প্রত্যাহার করে নেয়ার অধিকার ইস্পাত বাংলা সংরক্ষণ করে।

বিকেলের দিকে হিথরোতে পৌঁছুল রানা। একটা গাড়িতে চড়ে টারমাক পেরুল, পৌঁছে গেল ইস্পাত বাংলার অফিসে, কাস্টমস আর ইমিগ্র্যান্ট অফিসাররা ওখানেই অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। ইতোমধ্যে ওর আগমন সংবাদ পেয়ে গেছে ডাক্তার, জহির আব্বাসের অফিসে দেখা হলো দু'জনের।

'ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত, মাসুদ ভাই,' বলল ডাক্তার তরুণ। 'এরই মধ্যে দু'জন কনসালট্যান্ট প্যাথোলজিস্টের সাথে কথা বলেছি আমি। দু'জনই বলছেন, আমিও তাঁদের সাথে একমত, জহির আব্বাস মারা গেছে স্রেফ তার হার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায়।'

'বিষক্রিয়ার কোন লক্ষণ নেই? কোন রকম আঘাত বা···?'

'না। সব রকমভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি আমরা, মাসুদ ভাই। অত্যন্ত ভাল স্বাস্থ্য, কোন রোগ ছিল না, জীবনে কখনও সিগারেট ছোঁয়নি, মদ খায়নি, খাওয়াদাওয়া করত পরিমিত। না, কোন ড্রাগও পাওয়া যায়নি। প্রফেসর গিলবার্ট ড্রাগ সম্পর্কে একজন অথরিটি···।'

'হিপনোটিজম?'

'সে-কথা আমিও ভেবেছি, মাসুদ ভাই,' বলল তরুণ। 'জ্যাগ হোপস-এর সাথে কথাও বলেছি—এ-লাইনে তিনিই সেরা। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সম্মোহনে এটা সম্ভব কিনা—কাউকে হিপনোটাইজ করে বলা হলো নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখো, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সাবজেক্ট তাই করল? হোপস বললেন, অসম্ভব।'

'আব্বাসকে কোথায় রাখা হয়েছে?'

'মর্গে। পুলিসকে খবর দেয়া হয়েছে, তবে ব্যস্ততা দেখাবার কোন সুযোগ পাচ্ছে না তারা। তিনটে মেডিকেল রিপোর্টেই বলা হয়েছে, মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিক কারণে। আব্বাস সাহেবের নিজের ডাক্তারকেও খবর দেয়া হয়েছিল। পাঁচ বছর হলো কোন অসুখবিসুখ হয়নি আব্বাস সাহেবের, কাজেই দেখাসাক্ষাৎও হয়নি—তাঁর পক্ষে ডেথ সার্টিফিকেট দেয়া সম্ভব নয়।'

'তদন্ত হবে, তাই না?'

'ওপেন অ্যান্ড শাট কেস। ডেথ বাই ন্যাচারাল কজেস।'

'নট কজেস আননোন?'

'উঁহুঁ। করোনারকে আমরা বলব, হার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জহির আব্বাস মারা গেছেন। সেটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ।'

'কিন্তু যদি করোনার জিজ্ঞেস করেন, হার্ট বন্ধ হলো কেন?'

'বলব আমরা জানি না।'

'বেশ। অফিশিয়াল দিকটা বুঝলাম। কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত ধারণা?'

'তিনি মারা গেছেন, নাকি খুন হয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'মাসুদ ভাই, মেডিকেল সায়েন্সে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি, কিন্তু এখনও এমন অনেক রহস্য আছে যা আমরা ভেদ করতে পারি না। অবশ্যই জহির আব্বাসের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। অবশ্যই তাঁকে খুন করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে অন্তত আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু—পরবর্তী প্রশ্ন—কে বা কি তাকে খুন করল? এই প্রশ্নে সরাসরি পরিষ্কার কিছু বলার যোগ্যতা আমাদের কারও নেই। যা বলব, অস্পষ্ট মনে হবে, মনে হবে হেঁয়ালি করছি। আমাদের অচেনা কোন "এজেন্সি"-র সাহায্যে মারা গেছে সে। অজ্ঞাতনামা কোন লোক মানুষের অজানা কোন বিষ ব্যবহার করে থাকতে পারে।'

ডাক্তারকে বিদায় করে দিয়ে পেরিমিটার রোড ধরে হ্যাঙ্গারে চলে এল রানা, উত্তরহীন প্রশ্নগুলো অন্যমনস্ক করে রাখল ওকে। ডাক্তার তরুণের কথাগুলো আসলেই কি হেঁয়ালি? আব্বাস কি অজানা কোন 'এজেন্সি'র কারণে মারা গেছে? আব্বাস নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করেছিল, তা না হলে

ইমার্জেন্সি কল করত না।

বন্ধ দরজার ভেতর হ্যাঙ্গারে রয়েছে অচিন পাখি, দরজার বাইরে কড়া পাহারা। রানাকে দেখামাত্র চিনতে পারলেও, গার্ড-অফিসে ঢুকে ছাড়পত্র পাবার আয়োজন সম্পন্ন করার অনুরোধ জানাল গার্ডরা। স্ক্যানার-এর প্যানেলে আঙুলের ছাপ দিতে হলো রানাকে, ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট চিনতে পেরে ইতিবাচক সাড়া দিল কমপিউটর। ভেতরে ঢুকে রানা দেখল, গোটা প্লেনটাকে ঘিরে কাজ করছে এঞ্জিনিয়াররা। চীফ সার্ভিস এঞ্জিনিয়ার, ইস্পাত বাংলার হার্টফোর্ডশায়ার থেকে এসেছে, একজন এঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলছে। এঞ্জিনিয়ার কয়েকটা পার্টস পরীক্ষা করছে। সেগুলোর একটা হাতে নিয়ে রানার সামনে এসে দাঁড়াল চীফ এঞ্জিনিয়ার শাহাবুদ্দিন আহমেদ। রানাকে পথ দেখিয়ে অফিস কামরায় ঢুকল সে। ডেস্কের ওপর সাদা একটা কাগজের ওপর জিনিসটা রাখল। 'আমরা মরীচিকার পিছনে ছুটছি, মাসুদ ভাই। এটাই সেই থ্রাস্ট বিয়ারিং, মেসেজে আপনি যেটার কথা বলেছিলেন। পরীক্ষা করে কোথাও কোন ত্রুটি পাইনি আমরা। বসানোও হয়েছিল ঠিকভাবে। বসিয়েছিল ডাফ ডানকান। আপনি জানেন, এঞ্জিনিয়ার হিসেবে তার নাম আছে। শুধু থ্রাস্ট বিয়ারিং নয়, প্লেনের প্রতিটি পার্টস খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছি আমরা। আপনি যদি বলেন, ওটা নিয়ে নিউ ইয়র্ক যেতে রাজি আছি আমি।'

'বিয়ারিংটা কমপ্লিটলি পরীক্ষা করেছ? ভুল বুঝো না, বলছি না যে···।'

'উই চেকড দ্য ইন্সটলেশন। পারফেক্ট। ফ্রীকশন কোএফিশিয়েন্ট এগজ্যাক্টলি রাইট। অ্যালাইনমেন্টে কোন গোলযোগ নেই। টেমপারেচার আন্ডার লোড, ঠিক আছে। লুব্রিক্যান্ট ফিড, ঠিক আছে। এরপর আমরা বিয়ারিংটা হার্টফোর্ডশায়ারে পাঠিয়ে দিই। এইমাত্র আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে ওটা। হার্টফোর্ডশায়ারে ওটার রোলার হার্ডনেস, রিং হার্ডনেস আর পলিশ পরীক্ষা করা হয়। এখন আমরা নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, থ্রাস্ট বিয়ারিং সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত।'

'ডাফ ডানকান কি বলছে?' জানতে চাইল রানা।

'তার সাথে কথা বলার সুযোগ হয়নি আমার,' চীফ সার্ভিস এঞ্জিনিয়ার বলল। 'তার বাড়িতে একটা গাড়ি পাঠানো হয়েছে, কিন্তু জানা গেছে কাল রাতে এয়ারপোর্ট থেকে বাড়িতে ফেরেনি সে। গাড়িটা তার বাড়ির সামনেই রাখা হয়েছে, ফিরলেই যাতে এয়ারপোর্টে নিয়ে আসতে পারে।'

'আমার ধারণা,' বলল রানা, 'লোকটা হয়তো কোনদিনই আর বাড়ি ফিরবে না।'

অ্যাসোসিয়েটেড হোটেল, পার্ক লেনে, একটা স্যুইট ভাড়া করা হয়েছে পিটার গুডউইল, ডিক ব্রুস আর উইলিয়াম কার্টারের জন্যে। হোটেল হিসেবে অ্যাসোসিয়েটেডকে বেছে নেয়ার কারণ হলো, হোটেলটায় তিনটে এলিভেটর আর দুটো বার আছে, একটা রেস্তোরাঁ রয়েছে ছাদের ওপর। এলিভেটরে চড়ে যার খুশি যেখানে যাক, লবি থেকে কোন প্রশ্ন করা হয় না। অবিবাহিত যুবক-

যুবতীরা গোপনে মিলিত হতে চাইলে এই হোটেলটাই বেছে নেয়। স্যুইটটা ভাড়া করা হয়েছে মি. হোপল্যান্ড-এর নামে, প্রতি হপ্তায় ডাকযোগে ভাড়া মেটানো হয়।

নির্দেশে যেমন বলা হয়েছে, তিন নম্বর এলিভেটর ধরে চব্বিশ তলায় উঠে এল ডাফ ডানকান। এলিভেটর থেকে সরাসরি রেস্তোরাঁয় বেরিয়ে এল সে। এরইমধ্যে ব্রেকফাস্ট পরিবেশন করা হয়েছে টেবিলে। এলিভেটর থেকে নেমে কয়েক পা সামনে বাড়ল সে, তারপর অন্যমনস্কতার ভান করে পকেটে কি যেন খুঁজল, না পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল, আবার ফিরে এল এলিভেটরে।

এরপর সতেরোতলায় নেমে এল ডানকান। করিডর ধরে হেঁটে শেষ মাথার একটা দরজার সামনে দাঁড়াল সে, চাপ দিল কলিং বেলের বোতামে। খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকল ডানকান। খোলা দরজার পিছনে অপেক্ষা করছিল উইলিয়াম কার্টার, ডানকান ভেতরে ঢুকতেই ব্যস্ততার সাথে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। বাথরুমের পাশ দিয়ে পথ দেখাল সে, ঢুকল সিটিংরুমে। ডিক ব্রুস আর পিটার গুডউইল ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে, পা'জামার ওপর দু'জনেই ড্রেসিং গাউন পরে রয়েছে। বেডরুমের দরজাটা খোলা, ভেতরে একজোড়া বিছানা দেখতে পেল ডানকান।

তিনজনই ওরা মুখ তুলে ডানকানের দিকে তাকিয়ে থাকল।

নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছে ডানকান।

'কফি খাবে?' জিজ্ঞেস করল ডিক ব্রুস। দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নাড়ল ডানকান। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরতে চাই আমি,' বলল সে। 'টাকাটা পেলেই চলে যাব।'

'কাজটা ঠিকমত হয়েছে তো?' জিজ্ঞেস করল পিটার গুডউইল।

মাথা ঝাঁকাল ডানকান।

'কখন, কিভাবে খাওয়ালে জিনিসটা?' জানতে চাইল ব্রুস।

'ব্রেকফাস্টের সময়, ওর কফিতে, তোমরা যেমন বলেছিলে। শুধু একটা ব্যাপার···আমি খুব নার্ভাস ফিল করছিলাম··· যেই টেবিল ছেড়ে চিনি আনতে যায় সে···উঠে যেতেই আর দেরি করিনি, ওর কাপে ঢেলে দিয়েছি শিশির সবটুকু···।'

'ডাবল ডোজ, তাই না? মারাত্মক···।'

পিটার দাঁড়িয়ে আছে ডানকানের পিছনে, সামান্য বাম দিক ঘেঁষে। সতর্ক করার ভঙ্গিতে ব্রুসের উদ্দেশে মাথা নাড়ল সে, জানে তার নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে না ডানকান। 'চেক করার সময় কি ঘটল?' শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল সে।

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল ডানকান, জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভেজাল, তারপর আবার দাঁত দিয়ে কামড় দিল নখে। 'তোমরা যেমন বলেছিলে, ঠিক সেভাবেই কাজ হয়েছে। প্রথম দু'পাতা মনোযোগ দিয়ে কাজ করে সে, কিন্তু তারপর একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। পাতায় যে টিক চিহ্ন দিতে হবে, মনে করিয়ে দিতে হয়। তিন নম্বর পাতার মাঝামাঝি জায়গার একটা

রীডিং ভুল পড়লাম আমি। বাঁ দিকে, ফরওয়ার্ড ব্যাফল প্লেট মেকানিজম-এর অয়েল প্রেশার। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পঞ্চাশ পাউন্ড হবার কথা, দশ পার্সেন্ট কমবেশি হতে পারে···।'

'এ-সব আমরা জানি,' গমগম করে উঠল ডিক ব্রুসের ভারী গলা। 'তোমার রীডিংটা বলো।'

'প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পাঁচশো পাউন্ড।'

'সে তোমার রীডিংটা মেনে নিল?'

'কোন প্রশ্ন ছাড়াই।'

'টিক চিহ্নও দিল?'

'হ্যাঁ।'

'স্রেফ কৌতূহল,' বলল পিটার। 'অয়েল প্রেশার রীডিং কি ছিল? আসলটা?'

'প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে একান্ন দশমিক পাঁচ পাউন্ড। খানিকটা ঘাবড়ে যাই আমি···একটা বিয়ারিং বদলাতে হয়। তবে নতুনটা ঠিকমতই বসিয়েছি আমরা। দেখো, গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়েছে। টাকার প্রয়োজনে তোমরা যা বলেছ তাই করেছি আমি। কিন্তু আব্বাসকে কেন ড্রাগ খাওয়ানো হলো, কেন ভুল রীডিং বলে পরীক্ষা করা হলো তাকে, এ-সব কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না। আমরা জানি, প্লেনটার কোথাও কোন ত্রুটি নেই···।'

'এ-সবের কি অর্থ তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না,' আশ্বাস দেয়ার সুরে বলল কার্টার। 'এ-কথা মনে করার কোন কারণ নেই একটা অসিন পাকির ক্ষতি করতে চাইছি আমরা। আমরা আসলে একটা ড্রাগ পরীক্ষা করছি। তুমি আমাদেরকে সাহায্য করেছ, সেজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। কোম্পানী তোমার অবদানের কথা মনে রাখবে।'

ব্যাখ্যাটা শোনার পরও ডানকানের চেহারা থেকে নার্ভাস ভাব ও সন্দেহের ছায়া দূর হলো না।

'বুঝতে পারছ না কেন, আব্বাসকে সব কথা জানিয়ে ড্রাগ খাওয়ালে ডাক্তাররা সঠিক রেজাল্ট পেতেন না। ব্যাপারটার সাফল্যই নির্ভর করছিল গোপনীয়তার ওপর।'

'কিন্তু এভাবে লুকিয়ে দেখা করার দরকারটা কি ছিল? আমরা তো কাজের জায়গাতেও কথা বলতে পারতাম। ছাদে উঠে আবার নেমে আসতে হলো আমাকে, কেন? ছদ্মনামে কামরা ভাড়া করার কি দরকার ছিল?'

'তুমি বড় বেশি চিন্তা করো, ডাফ,' হেসে উঠে বলল কার্টার। 'সে যাই হোক, ওভারটাইমের জন্যে ভাল টাকা দেয়া হচ্ছে তোমাকে।'

'বাকি দুশো ডলার পেতে পারি এখন?' জিজ্ঞেস করল ডানকান। 'আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে।'

'টাকা তো তোমার ঘরেই রাখা আছে,' টেবিলে সবার জন্যে কফি পরিবেশন করল পিটার গুডউইল। 'যেরকম নার্ভাস বোধ করছ, কড়া এক

কাপ কফিই তোমার দরকার।' কাপটা ডানকানের হাতে ধরিয়ে দিল সে।

কফির কাপটা শেষ করে আরেক তলা ওপরে চলে এল ডানকান, কাল বিকেলে বুক করা কামরাটার ভেতর ঢুকল। ওর সাথে কার্টারও এসেছে। ডানকান দরজা খুলছে, এই সময় ওদের দেয়া ড্রাগ কাজ শুরু করল। তাকে ধরে ফেলল কার্টার, পাঁজাকোলা করে বয়ে নিয়ে এল কামরার ভেতর।

ডানকানকে মেঝেতে শোয়ানো হলো। এক এক করে সব কাপড় খুলে বিবস্ত্র করা হলো তাকে। কাপড়গুলো একটা চেয়ারের পিছনে গুছিয়ে রাখল কার্টার। তারপর আবার ডানকানকে দু'হাতের ভাঁজে তুলল সে, বয়ে নিয়ে এল বাথরুমের ভেতর। এবার শাওয়ারের নিচে শোয়ানো হলো তাকে। নব ঘুরিয়ে গরম পানির শাওয়ারটা ছেড়ে দেয়া হলো। আরেকটা নব ঘোরাতেই পানির উত্তাপের মাত্রা শতগুণ বেড়ে গেল। মারা যেতে পনেরো মিনিট সময় নিল ডানকান, ইতোমধ্যে আগুনের মত গরম পানিতে তার দেহ থেকে বিষের সমস্ত চিহ্ন বেরিয়ে গেছে।

নিজেদের স্যুইটে ফিরে এল কার্টার। বাকি দু'জন কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়েছে। যে যার জিনিসপত্র ব্যক্তিগত ব্রীফকেসে ভরে নিল ওরা। সুটকেসে প্রত্যেকেরই কিছু কাপড়চোপড় রয়ে গেল, তবে সুটকেস বা কাপড়গুলো কোন সূত্র হিসেবে কাজ করবে না। লবির একটা টেলিফোন বুথ থেকে হোটেলে ফোন করল কার্টার, জানিয়ে দিল মি. হোপল্যান্ড হোটেল ত্যাগ করছেন, লাগেজগুলো স্টোরে পাঠিয়ে দিতে হবে। স্যুইটের ভাড়া আজ দুপুর বারোটায় পরিশোধ করা হয়েছে, কাজেই হোটেল কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক একটা ঘটনা হিসেবেই দেখল। এই মুহূর্তে তারা অন্য একটা বিষয় নিয়ে দারুণ উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে।

হোটেলের এক মেইড দু'হাজার পাঁচশো তেরো নম্বর কামরায় এইমাত্র সম্পূর্ণ নগ্ন একটা শরীর আবিষ্কার করেছে। শাওয়ারের পানি অত্যধিক গরম হওয়ায় লোকটা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে বলে সন্দেহ করা হলো। হোটেলের খাতা দেখে পরিচয় জানা গেল তাঁর। মি. জন মিচেল, ব্রাজিল থেকে এসেছেন। ডেস্ক ক্লার্ক তাঁর সম্পর্কে একটা কথাই স্মরণ করতে পারল, ভদ্রলোক কি কারণে কে জানে ভারি ম্রিয়মাণ ছিলেন।

ব্যাপারটা ধাঁধার মত লাগছে রানার। হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হবার মত লোক আর যেই হোক, জহির আব্বাস ছিল না। দুটো ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল সে। এক, তাকে বিষ বা ড্রাগ খাওয়ানো হয়েছে। দুই, প্লেনে স্যাবোটাজ করা হয়েছে কিংবা মেইন্টেন্যান্স-এ ত্রুটি রয়ে গেছে। নিশ্চিত ছিল বলেই সিকিউরিটির সাথে যোগাযোগ করার জন্যে ইমার্জেন্সি কল করে সে। পরবর্তী ঘটনা, জহির আব্বাস মারা গেল।

তদন্তে দেখা গেল, হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মারা গেছে আব্বাস। কোন মেডিকেল বা প্যাথোলজিক্যাল কারণ খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হলো বিশেষজ্ঞরা। ওদিকে, চীফ এঞ্জিনিয়ার শাহাবুদ্দিন আহমেদ নিশ্চয়তা দিয়ে

বললেন, প্লেনে কোন স্যাবোটাজ করা হয়নি, সার্ভিসিঙেও কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা, ডাফ ডানকান নিখোঁজ।

ঘটনাগুলোর একটারও কি বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে? জহির আব্বাসের মৃত্যু স্বাভাবিক হতে পারে। ডাফ ডানকান বাড়ি ফেরেনি, এমন হতে পারে ব্যক্তিগত কোন সঙ্কটে পড়েছে সে।

'অচিন পাখিকে আমি কি সার্ভিসে রাখব, মি. রানা?' শাহাবুদ্দিন আহমেদ জানতে চাইলেন।

মাথাটা একদিকে কাত করল রানা। যথেষ্ট কারণ ছাড়া প্লেনটাকে মাটিতে বসিয়ে রাখতে পারে না ও। 'বেড়াবার ইচ্ছে আছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'প্রস্তাবটা আমিই দিতে যাচ্ছিলাম,' বললেন চীফ এঞ্জিনিয়ার। 'ব্রিটিশ স্কাইব্রিজের ফ্লাইটেই নিউ ইয়র্ক থেকে ঘুরে আসি একবার।'

রানার মার্সিডিজটা এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, গাড়ি চালিয়ে সেন্ট্রাল লন্ডনে চলে এল ও। মেফেয়ার এলাকায়, গ্রসভেনর সিনেমা হলের ওপর, একটা ফ্ল্যাট রয়েছে ওর। ফ্ল্যাটে ঢুকেই শুনতে পেল টেলিফোন বাজছে। না, রঙ নাম্বার। রিসিভার নামিয়ে রেখে কাবার্ড খুলে ছোট্ট একটা গ্লাসে সামান্য জিন আর টনিক ঢালল ও, গ্লাসটা হাতে নিয়ে সিটিংরূম থেকে বেডরূমে চলে এল। কাপড়চোপড় খুলে বাথরূমে ঢুকল, দাঁড়াল শাওয়ারের নিচে।

অনেকক্ষণ ধরে গোসল করার পরও উদ্বেগ আর নিরানন্দ ভাবটা মন থেকে দূর হলো না। গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করল ও।

খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। এগারোটা বাজে। এইমাত্র গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। কোথায় যেন কি একটা ত্রুটি রয়েছে, অথচ ধরা পড়ছে না ওর চোখে। বড় ধরনের কোন ষড়যন্ত্র চলছে আই বি এ-র বিরুদ্ধে? কিন্তু প্রমাণ কোথায়? তবে কিছু যে একটা ঘটছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কি সেটা?

রাস্তা দিয়ে ধীরবেগে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িগুলো। রাস্তার উল্টো দিক দিয়ে অলস পায়ে হেঁটে যাচ্ছে একজন পুলিস। একটা দোরগোড়া থেকে উঁকি দিল এক তরুণী, খালি ট্যাক্সি পাবার আশা নেই বুঝতে পেরে রাস্তায় নেমে পড়ল সে, পুলিসকে পাশ কাটিয়ে হন হন করে হাঁটা ধরল। এমনভাবে হাত নাড়ল পুলিসটা, রানা আন্দাজ করল, মেয়েটা তাকে শুভরাত্রি জানিয়েছে। আবার বাজতে শুরু করল টেলিফোন। আবারও রঙ নাম্বার।

রিসিভার নামিয়ে রেখে বিছানায় উঠল রানা, কিন্তু ঘুম এল না। খানিক পর গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে মেঝেতে দাঁড়াল, ঘুমের দ্বিতীয় ওষুধটা হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর রাখা রেডিওটা অন করল। বিবিসির ওভারসীজ সার্ভিস ধরল ও। তিনটে পনেরো বাজে। এইমাত্র খবর পড়া শেষ করল বনিতা কারসন। সুইচবোর্ড অপারেটরকে অনুরোধ করতেই পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে স্টুডিওর সাথে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল। রেডিওটা

তখনও বাজছে, কাল আবার এই একই সময়ে অনুষ্ঠান প্রচার করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ঘোষিকা। তারপরই অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল বনিতা।

'প্রোগ্রামটা ভালই হয়েছে,' বলল রানা।

'হু ইজ দিস, প্লীজ?'

'তোমার একজন শ্রোতা…।'

'ওরে পাজী…।'

'চিনে ফেললে গলাটা?'

'কিভাবে চিনলাম ঈশ্বরেই বলতে পারবে। কতদিন তোমার গলা শুনি না। মাঝে মাঝে ভাবি, শুধু কি একা আমার ওপর এতটা নিষ্ঠুর তুমি, নাকি সব মেয়ের ব্যাপারেই? কোথায় থাকো, জুরিখে না নিউ ইয়র্কে, একটা খবর পর্যন্ত পেতে পারি না?'

'ঘুম আসছে না, ভাবলাম ওষুধ দরকার। তোমার কথাই প্রথম মনে পড়ল। কোথাও ব্রেকফাস্ট খাওয়াতে পারি তোমাকে, বনিতা?'

'লন্ডনে, রাতের এই সময়ে? নাকি সেবারের মত হ্যাঁচকা টান দিয়ে প্যারিসে নিয়ে গিয়ে তোলার ইচ্ছে, যাতে নৌকা বাইচ-এ তোমার সঙ্গিনী হতে পারি আমি? শোনো, তোমার অভাব বোধ করছি, বুঝলে? তুমি একটা ব্রুট, তা না হলে আমাকে এত কষ্ট দাও কেন?'

'আসবে?'

'ঘুমের ওষুধ দরকার, কথাটা যদি আক্ষরিক অর্থে সত্যি হত, নিজেকে ধন্য মনে করতাম, রানা,' কারসন বনিতার কণ্ঠে বিষণ্ণ সুর। 'আমি জানি, তুমি আমাকে ছোঁবে না পর্যন্ত, গিলে খাওয়া তো দূরের কথা।'

'এত দিনে নিশ্চয়ই অনেক কথা জমা হয়েছে তোমার। আমাকে শোনাবে না? আমারও যে তোমাকে ভাল লাগে, সেটা ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেবে না? আমি যে কাউকে, কোন মেয়েকে, ইচ্ছে করে কষ্ট দিই না, সেটা আরেকবার বলার সুযোগ আমি পাব না?'

হঠাৎ আকুল হয়ে পড়ল বনিতা। আবেগে গলা বুজে এল তার। ইচ্ছে হলো, এক নিমেষে রানার পাশে চলে আসে। 'আমার জীবনে তুমি একাধারে বর ও অভিশাপ। কোথায় তুমি, রানা? কোত্থেকে কথা বলছ?'

'আমার ফ্ল্যাট থেকে।'

তোমার ফ্ল্যাট তো দুনিয়ার সবখানে একটা করে আছে। জুরিখ ফ্ল্যাট, নাকি লন্ডন ফ্ল্যাট থেকে বলছ?'

'লন্ডন।'

'সত্যি তুমি একটা পাষাণ। লন্ডনে এসেছ অথচ আমাকে জানাওনি!'

'ব্যস্ত ছিলাম, বনিতা।'

'আমার জন্যে বাথটাবে পানির ব্যবস্থা করো, পানিতে সেন্ট ঢালো, দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি। অবশ্য যদি এই অসময়ে ট্যাক্সি পাই।'

'তুমি বললে গাড়ি নিয়ে আসতে পারি আমি।'

'এনার্জি খরচা কোরো না, আমার গোসলের পর ওটুকু দরকার হবে—

আজ আমি কোন কথা, কোন অজুহাত শুনব না!'

বাথটাবে সেন্ট ঢেলে বেরিয়ে এল রানা, ফ্রিজে মার্টিনি রাখল, এই সময় আবার ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল ফোনটা।

এবার রঙ নাম্বার নয়। 'ড. তরুণ অনুরোধ করায় আপনাকে ফোন করছি আমি,' ব্যাখ্যা দিলেন প্রফেসর গিলবার্ট। 'ও বলল, রাত যতই হোক, আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনার জহির আব্বাস সম্পর্কে ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার জানা গেছে।'

দশ মিনিট পর কারসন বনিতা রানার ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখল বাথটাবে পানি ভরা রয়েছে, মিষ্টি গন্ধ উঠে আসছে পানি থেকে। ফ্রিজে মার্টিনিও রয়েছে। খুঁজতে হলো না, রানার লেখা চিরকুটটা সহজেই চোখে পড়ল তার। 'সত্যি অত্যন্ত দুঃখিত। জরুরী একটা কাজ, হঠাৎ যেতে হচ্ছে। আশা করি শিগ্গিরই ফিরতে পারব।'

'ওরে পাজী!' কিচেনে ঢুকে কফি তৈরি করল বনিতা, তারপর প্রচুর সময় নিয়ে গোসল করার জন্যে বাথটাবে নামল।

কিং'স ক্রস স্ট্রীটের এক বাড়ির বেসমেন্টে প্রফেসর গিলবার্টের ল্যাবরেটরি। সদর দরজায় তালা নেই, সামনে হলরুমের ভেতর দিকের দরজাটাও খোলা। দরজা পেরিয়েই সিঁড়িটা দেখতে পেল রানা, নিচের দিকে নেমে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় মৃত্যু ও জীবনের গন্ধ পেল ও, অর্থাৎ ফরমালিন আর ডিজইনফেকট্যান্ট-এর। সিঁড়ির নিচে ওর জন্যে অপেক্ষা করছেন প্রফেসর। ছোটখাটো মানুষটা, গোলাপের মত রাঙা তাঁর মুখ, চোখে দ্যুতিময় দৃষ্টি নিয়ে সুবোধ এক স্কুলছাত্র যেন। ধবধবে সাদা ল্যাবরেটরি কোট পরে আছেন ভদ্রলোক, ওপরের একটা পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা কাঁচি। পথ দেখিয়ে ল্যাবে নিয়ে যাবার সময় রানা লক্ষ করল, প্রফেসর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। তাড়াতাড়ি নিচের দিকে তাকাল রানা, দেখল তাঁর বাম বুটটা ডান বুটের তুলনায় আকারে অর্ধেক, এবং প্রায় গোলাকার। অন্য কোন লোকের পা যদি এরকম বিকৃত বা ছোট হত, অশুভ একটা ভাব ফুটে উঠতে পারত তার গোটা অস্তিত্বে। কিন্তু প্রফেসর গিলবার্টের বেলায় উল্টোটা ঘটেছে, তাঁর এই ত্রুটির জন্য তাঁকে বরং আরও কোমলহৃদয় ও অসহায় লাগছে।

'রাতটা আপনার খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে,' বলল রানা।

রানার হালকা রেনকোটটা নিয়ে দরজার কাছাকাছি কাবার্ডে ঝুলিয়ে রাখলেন প্রফেসর। 'চারদিক নিঝুম হয়ে গেলে কাজ করে আনন্দ পাই,' বললেন তিনি। 'ল্যাব কর্মীরা আশপাশে থাকে না, ফোন বাজে না। আমার ধারণা, সকাল হলে কিছু লালচে মুখ দেখার সুযোগ হবে। প্রফেশন্যালরা নিজেদের ভুল স্বীকার করতে পছন্দ করে না। অথচ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তাদের দলে আমিও আছি। আমরা তিনজন একটা রিপোর্ট তৈরি করলাম, নিশ্চয়তা দিয়ে বললাম, জহির আব্বাসের শরীরে টক্সিক

জাতীয় কিছু পাওয়া যায়নি। রিপোর্টের সারমর্ম ঠিকই আছে, টক্সিক কিছু সত্যি আমরা পাইনি। কিন্তু পাইনি কোথায়?'

প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করল রানা, 'কোথায়?'

'শরীরের ভেতর,' বললেন প্রফেসর। 'কাটাছেঁড়ার পর পরীক্ষা করা হয়েছে, কোথাও কোন রকম বিষ পাওয়া যায়নি। কিন্তু শরীরের বাইরে?'

'শরীরের বাইরে টক্সিক··· ঠিক বুঝলাম না, প্রফেসর।'

বিজয়ীর হাসি দেখা গেল প্রফেসর গিলবার্টের গোলাপ রাঙা মুখে।

'রিপোর্ট লেখার পর আবার কি মনে করে পরীক্ষা করতে গেলেন আপনি?' জানতে চাইল রানা।

'অস্বাভাবিক ঘাম। ব্যাপারটা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।' ল্যাবরেটরির ভেতর দিয়ে পথ দেখালেন প্রফেসর। একটা বেঞ্চের পাশে দুটো চেয়ার রয়েছে। বেঞ্চের ওপর মাইক্রোস্কোপ, কয়েকটা স্লাইড ইত্যাদি দেখা গেল। পাশের র‍্যাকে রয়েছে টেস্ট-টিউব। একটা চেয়ারে বসে কামরার চারদিকে চোখ বুলাল রানা। 'বিষ সম্পর্কে আপনি কতটুকু কি জানেন, মি. রানা?' জানতে চাইলেন তিনি।

'বেশি কিছু না।'

'আপনি জানেন কি, কিছু বিষ নার্ভাস সিস্টেমকে আক্রমণ করে?'

'কথাটা শুনেছি।'

'সাধারণত মারা যাবার পর লাশের শরীরে এ-ধরনের বিষের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। বলাই বাহুল্য, মি. আব্বাসের সমস্ত অ্যানালেসিস সম্পন্ন করি আমরা, কিন্তু স্টমাক বা তার ডাইজেসটিভ ট্র্যাক্ট-এ কোন ফরেন সাবস্ট্যান্স পাইনি আমরা, তার বাউয়েল বা ব্লাডারেও কিছু ছিল না।'

হাসিখুশি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বিস্মিত না হয়ে পারল না রানা। তাঁর কাজটা মোটেও আনন্দদায়ক নয়, প্রায় সারাটা রাত ধরে একটা লাশ কাটাছেঁড়া করেছেন তিনি।

'আমরা এমনকি লাশের স্কিন থেকে পাওয়া নামমাত্র ঘামও উদ্ধার করেছি, পরীক্ষাতে প্রমাণ হয়েছে তাতেও কিছু নেই।'

'অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন আপনি···।'

'পরিশ্রম নয়, মাই ডিয়ার চ্যাপ। একজন প্রফেশন্যাল হিসেবে সমস্যাটা আমাকে চ্যালেঞ্জ করছিল। কাজটায় আমি ভারি আনন্দ পেয়েছি।'

'কিন্তু আপনার সন্দেহ হলো কেন? কেন আবার নতুন করে পরীক্ষা শুরু করলেন?'

'ড. তরুণের একটা কথা। পরীক্ষার ফলাফলে সন্তুষ্ট না হয়ে যাবার সময় বলে গেল সে, কি যেন দেখেও দেখতে পাচ্ছি না আমরা। এর আগেও এ-ধরনের মন্তব্য করেছে সে, প্রতিবারই দেখা গেছে কথাটা অমূলক ছিল না। কাজেই সিদ্ধান্ত নিলাম, রাতটা ল্যাবেই কাটাব—দেখব সত্যি সত্যি কিছু চোখ এড়িয়ে গেছে কিনা।'

'বেশ, তারপর?'

'জিনিসটা আসলে ওই ঘামের মধ্যেই পাওয়া গেল। ঘাম আসলে প্রচুর বডি সাবস্ট্যান্স বহন করে। বিষটা ঘামের সাথে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। এই বিষটার সাইড এফেক্ট হলো, বডি টেমপারেচার অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দেয়া। সোয়েট গ্ল্যান্ডগুলো খুলে যায়, ঘামের সাথে বেরিয়ে যাবার পথ করে নেয় পয়জনটা। একটা লাশ যখন পরীক্ষার জন্যে আনা হয়, নগ্ন অবস্থায় প্রচুর নাড়াচাড়া করা হয় সেটা, কাজেই বেশিরভাগ ঘাম শুকিয়ে যায়। তাতে তেমন কোন সমস্যা হয় না, কারণ ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পরও সামান্য পরিমাণ লবণ ত্বকের সাথে লেগে থাকে, অ্যানালেসিসের জন্যে সামান্য একটু পেলেই চলে। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই আমরা পেয়েছি। ত্বক থেকে চেঁছে নিয়েছি লবণ। কিন্তু পরিচিত কোন বিষ পাওয়া যায়নি—না আর্সেনিক, না অন্য কিছু।

'কিন্তু সৌভাগ্যবশত, মি. আব্বাসের লাশ খুব বেশি নাড়াচাড়া করা হয়নি। আর তাই, আমি যখন তাঁর বাম হাতটা তুললাম, দেখলাম বগলের নিচে এক ফোঁটা অবশিষ্ট রয়েছে। মাত্র এক ফোঁটা, কিন্তু আমার কাজের জন্যে যথেষ্ট।'

'ওই ঘামের ফোঁটায় আপনি বিষ আবিষ্কার করলেন?'

'আ হাইলি টক্সিক সাবস্ট্যান্স, কিন্তু কণামাত্র। অ্যামাইল নাইট্রেট নামে অ্যামপুলগুলোর নাম শুনেছেন আপনি? বিশেষ এক ধরনের হার্ট-এর রোগীদের দেয়া হয়? রোগী যদি বুঝতে পারে অ্যাটাক হবে, রুমালে রেখে একটা অ্যামপুল ভাঙে সে, অ্যামাইল নাইট্রেট-এর গন্ধ শোঁকে, ফলে হার্ট সচল থাকে। একটা সাইড এফেক্ট হলো, রোগীর মুখ লালচে হয়ে ওঠে, শরীর ঘামতে শুরু করে। এই জিনিসটাও অ্যামাইল নাইট্রেট থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে—প্রায় একই অ্যাকশন, এবং সম্পূর্ণ অরগ্যানিক। এটার বৈশিষ্ট্য হলো, এক ঘণ্টার মধ্যে সোয়েট গ্ল্যান্ডের মাধ্যমে শরীর থেকে কর্পূরের মত উবে যাবে, ধরতে পারার মত কোন চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না।'

'যদি না এক দু'ফোঁটা ঘাম রোগীর বগলের তলায় জমে থাকে?'

'ঠিক তাই। ঘটনাটা যে অস্বাভাবিক, সন্দেহ নেই। বিষটা যখন প্রয়োগ করা হয়, সাবজেক্ট কাপড়চোপড় পরে ছিল। বগলের তলার ঘাম শুষে নেয় কাপড়, পিছনে কোন নমুনা রেখে যায় না। এই কেসে নিজেদেরকে আমরা ভাগ্যবান বলতে পারি, কারণ ঘাম শুকিয়ে যাবার আগেই লাশের কাপড় খুলে ফেলা হয়েছিল, এবং সাধারণ পোস্ট মর্টেমের জন্যে একটা লাশ যতটা নাড়াচাড়া করা হয় এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।'

'কাজ পাগল একজন প্যাথোলজিস্ট পেয়েছি আমরা; ভাগ্যও সে-কারণে আমাদেরকে সহায়তা করেছে।'

'হ্যাঁ, এটুকু কৃতিত্ব দিতে পারেন আমাকে।' প্রফেসর গিলবার্ট হাসলেন। 'তবে আমাকে কাজ পাগল করে তোলে ড. তরুণ। কৃতিত্বের একটা ভাগ তারও পাওনা।'

'বিষটার কোন নাম আছে, প্রফেসর গিলবার্ট?'

'একটা কেমিক্যাল নাম আছে, অবশ্যই, তবে নামটা আপনার তেমন

কোন সাহায্যে আসবে না। নামটা হলো, নাইট্রোমিথাইলেথিলক্সি।'

হাত তুলে তাঁকে বাধা দিল রানা। 'কেমিক্যাল নাম জানতে চাইছি না,' বলল ও। 'জানতে চাইছি ট্রেড নাম আছে কিনা।'

'না, কোন ট্রেড নেম নেই। আমি যতটুকু জানি, কমার্শিয়ালি তৈরি করা হয় না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বিষ হিসেবে ব্যবহারের কোন ইতিহাসও নেই···।'

'প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলতে পারেন আমাকে?'

'বডি টেমপারেচার বাড়িয়ে দেবে। সম্ভবত হার্টের গতি দ্রুত হবে। দ্রুত হবে পালস রেট। আপনি ঘামবেন। এগুলো বাইরের লক্ষণ।'

'ভেতরে কি ঘটবে?'

'ভেতরে কি ঘটবে আমাদের ঠিক জানা নেই। আপনার নার্ভাস সিস্টেমের একটা অংশ ধ্বংস করে দেবে, সন্দেহ নেই। তবে বাকি অংশটাকে ঠিকমত কাজ করতে বাধা দেবে না। আপনি সম্ভবত হাঁটতে পারবেন, হাসতে পারবেন, কথা বলতে পারবেন—যে-কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতই। আপনার রিফ্লেক্সও মোটামুটি ঠিক থাকবে—ধরুন, কেউ আপনাকে ঘুসি মারতে যাচ্ছে, আপনি সেটাকে এড়াবার জন্যে দ্রুত সরে যেতে পারবেন।'

'কিন্তু বিষের প্রভাবে আপনার নার্ভাস সিস্টেমের একটা অংশ কাজ করবে না?'

'হ্যাঁ। কিছু সময়ের জন্যে কাজ করবে না।'

'কিছু সময় মানে?'

'বুঝতেই তো পারছেন, জিনিসটা নিয়ে খুব বেশি এক্সপেরিমেন্ট করা হয়নি, কাজেই সায়েন্টেফিক কোন অ্যানসার আমি আপনাকে দিতে পারব না। সময়ের ব্যাপারটা···কয়েক মিনিট হতে পারে, আবার কয়েক ঘণ্টাও হতে পারে। নির্ভর করবে কতটা বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে, শরীর প্রক্রিয়া ঘামের মাধ্যমে ওটাকে বের করে দিতে কতটা সময় নেয়, বডি টেমপারেচার, পারিপার্শ্বিক উত্তাপ, রোগীর শারীরিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর। বিষয়টা আসলে সিলেকটিভ···।'

'সিলেকটিভ মানে? সাবজেক্টের কোন্ অংশটা সিলেক্ট করবে ওই বিষ, বলতে পারেন?'

'আরও গবেষণা ছাড়া এ-ব্যাপারে কিছু বলতে ভাল লাগছে না আমার। সবার ক্ষেত্রেই একই অংশ আক্রান্ত হবে, কারণ ড্রাগটা বায়োকেমিক্যাল পদ্ধতিতে কাজ করে, নার্ভাস সিস্টেমের বিশেষ একটা কেমিস্ট্রির ওপর কার্যকরী। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোন্ অংশটা, আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে, আপনি যদি সাবজেক্ট হতে চান, নমুনা হিসেবে খানিকটা ড্রাগ খেতে রাজি হন, এবং আমার সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধুকে সুযোগ দেন আপনাকে পরীক্ষা করার, তাহলে হয়তো···।'

হেসে উঠল রানা, তবে হাসির আওয়াজটা আড়ষ্ট ও বেসুরো। গিনিপিগ হবার কোন ইচ্ছেই ওর নেই। অজানা কোন বিষ খেয়ে তো নয়ই। 'সাইড

এফেক্ট?'

মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'গবেষণা ছাড়া বলা সম্ভব নয়।'

'ওভারডোজের প্রতিক্রিয়া?'

'এই ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ওভারডোজের প্রতিক্রিয়া পরিষ্কার ফুটে উঠবে। হার্ট অ্যাকটিভিটি বাড়িয়ে দেবে, অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছুটন্ত গাড়ির এঞ্জিনের মত। এঞ্জিনের ক্ষেত্রে পিস্টন রিঙ বা ভালভগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। কিছু একটা মেকানিক্যালি ভাঙবে। হার্টের ব্যাপারে ঠিক তাই ঘটা উচিত তা যদি ঘটে, আমরা তা দেখতে পাব। কিন্তু মি. আব্বাসের হার্ট ছিল সম্পূর্ণ, সর্ব অর্থে, পারফেক্ট—ফিজিক্যাল ড্যামেজ-এর কোন লক্ষণ পাওয়া যায়নি।'

'আসুন, আমরা হাইপথেসিস-এর সাহায্য নিই,' বলল রানা। 'এক লোক তার রুটিনের অংশ হিসেবে অনেকগুলো কাজ করে। শারীরিক অর্থে কাজগুলো হলো, কিছু ডায়ালের লেখা পড়া, তারপর প্যাডে টিক চিহ্ন দেয়া। সে যখন ডায়ালগুলো পড়ে, অবশ্যই তার "ক্রিটিক্যাল অ্যাবিলিটি" ভূমিকা পালন করে, কাজেই ডায়ালে যদি ভুল কিছু থাকে তাহলে টিক চিহ্ন দেবে না সে, ঠিক?'

'এখানে আমাকে একটা প্রশ্ন করতে দিন, প্লীজ,' বললেন প্রফেসর গিলবার্ট। 'ডায়ালের ভুল বলছেন যেটাকে, সেটা কি নৈতিক কোন ভুল, নাকি তারতম্যগত কোন অসঙ্গতি?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'না, নৈতিকতার কোন ব্যাপার জড়িত নয়। ভুলটা তারতম্যগত অসঙ্গতির পর্যায়েই পড়ে। তবে, একজন এঞ্জিনিয়ারের কাছে এ-ধরনের অসঙ্গতি মানেই হবে কোথাও কোন মারাত্মক গোলযোগ ঘটেছে।'

'সঙ্গতি বা অসঙ্গতি ধরার কাজটা করে মেমোরি,' বললেন প্রফেসর। 'মেমোরির একটা অংশ যদি ধ্বংস করে দেয় ওই ড্রাগ? তাহলে কি ঘটবে?'

'কি ঘটবে?'

'সাবজেক্ট অসঙ্গতিটা ধরতে পারবে না।'

'অর্থাৎ ডায়ালের লেখা ঠিক আছে ধরে নিয়ে টিক চিহ্ন দিয়ে যাবে সে?' জানতে চাইল রানা।

'সম্ভবত, হ্যাঁ। কারণ তার শারীরিক তৎপরতা ড্রাগের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। তার সমস্ত আচরণ স্বাভাবিক বলে মনে হবে। সে যদি স্মোকার হয়, একটা সিগারেট চাইবে, প্যাকেট থেকে বের করবে, ধরাবে, পান করবে…।'

'উপভোগ করবে কি?' জানতে চাইল রানা।

'সে-কথা বলতে পারি না। কারণ উপভোগ করাটাও নির্ভর করে মেমোরির ওপর।'

চুপচাপ বসে থাকল দুজন। দু'জনেই ভাবছে। কল্পনায় রানা দেখতে পেল, ডায়ালে বিপজ্জনক অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও একের পর এক টিক চিহ্ন দিয়ে চলেছে জহির আব্বাস তার প্যাডে। রানা জানে, আব্বাসের পাশে বসে

ছিল ডাফ ডানকান, আব্বাসের প্রতিটি কাজ লক্ষ করেছে সে। লোকটা কি আগের মতই এখনও তার আঙুলের নখ কাটে দাঁত দিয়ে? ডানকান নিরুদ্দেশ. আব্বাস মারা গেছে, এবং চীফ এঞ্জিনিয়ার বলছে প্লেনের কোথাও গোলযোগ নেই। ধরে নিতে হয়, ডায়ালগুলো সঠিক তথ্যই সরবরাহ করেছে আব্বাস আর ডানকানকে, তারাও বিশ্বস্ততার সাথে টিক চিহ্ন দিয়েছে। কিন্তু প্লেনে যদি কোন ক্রটি নাই থেকে থাকে, ড্রাগটা ব্যবহার করা হলো কেন? এখন রানার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, একসাথে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় আব্বাসের কফির কাপে ড্রাগটা মিশিয়ে দেয় ডানকান—সম্ভবত কফির কাপে। টেবিল ছেড়ে একবার উঠে গিয়েছিল আব্বাস, চিনি আনার জন্যে। কেন বা কিসের জন্যে আব্বাস টেবিল ছেড়েছিল সেটা বড় কথা নয়, সে টেবিল ছাড়ায় তার খাবার বা কফিতে ড্রাগ মেশানোর একটা সুযোগ পেয়ে যায় ডানকান। আব্বাস টেবিল না ছাড়লেও সুযোগটা তৈরি করে নিত সে। হয়তো নিজেই চিনির পট সরিয়ে রেখেছিল।

'আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না, ড্রাগটার কারণেই মৃত্যু হয়েছে আব্বাসের?' প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তা কি করে হয়!' প্রফেসর গিলবার্টের হাসিখুশি মুখে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। 'উঁহুঁ, আমার তা মনে হয় না।' হঠাৎ হাসলেন ভদ্রলোক, ক্লান্ত দেখাল তাঁকে। 'ফ্র্যান্সিস বেকন-এর একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। "আই ডোন্ট বিলিভ এনি ম্যান ফিয়ারস টু বি ডেড, বাট ওনলি দ্য স্ট্রাইক অভ ডেথ।" প্রচুর ঘাম বেরুচ্ছে দেখে মি. আব্বাস বুঝতে পেরেছিলেন, কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। তখনও, মনে রাখবেন, তার প্রাণশক্তি অটুট রয়েছে—আপনাকে টেলিফোন করা থেকেই সেটা বোঝা যায়। যতটুকু বলা হয়েছে আমাকে, বুঝতে অসুবিধে হয়নি, বিশেষ ধরনের কোড ব্যবহার করেন তিনি—তারমানে, তাঁর স্মরণ শক্তি ঠিকমতই কাজ করছিল। ওই একই কোড ব্যবহার করে তিনি এমনকি একজন ডাক্তারকেও ডাকেন। আমার কোন সন্দেহ নেই, স্মৃতি-ধ্বংসী ড্রাগ ততক্ষণে কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু ড্রাগটা সিস্টেম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল বলে তখনও তিনি প্রচুর ঘামছিলেন। কি থেকে কি বা কেন কি ঘটছে তাঁর জানার কথা নয়। ধীরে ধীরে তাঁর টেমপারেচার বাড়ছিল। তিনি জানতেন, তাঁকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে। কিন্তু জানতেন না, ড্রাগটা আর কোন ক্ষতি করবে না। টেলিফোনে ডাক্তার তরুণ আপনাকে জানাল, কোন রকম ড্রাগের কোন চিহ্ন সে দেখতে পাচ্ছে না। আমার বিশ্বাস, মি. আব্বাস এটার অর্থ করেন, এমন একটা বিষ তাঁকে খাওয়ানো হয়েছে যার সম্পর্কে কারও কোন ধারণা নেই, এবং এটার কোন চিকিৎসাও সম্ভব নয়।'

'কিন্তু ড্রাগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে মৃত্যু হয়নি তার?'

'না। আমার বিশ্বাস, তিনি মারা গেছেন ভয়ে।'

ছ'টার খানিক পর ফ্ল্যাটে ফিরে রানা দেখল ওর বিছানায় ঘুমিয়ে রয়েছে

বনিতা। রেনকোট খুলে এক কাপ কফি বানিয়ে কাপে শুধু চুমুক দিয়েছে, উঁকি দিয়ে দেখতে যাচ্ছে বনিতার ঘুম ভাঙল কিনা, টেলিফোনটা বাজতে শুরু করল।

'ধরে থাকুন, প্লীজ,' অপারেটর বলল। 'নিউ ইয়র্ক থেকে আপনার একটা কল আছে।'

রিসিভারটা কানে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে রানা, অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা শব্দগুলোকে পাখির কূজন বা মার খাওয়া বিড়ালের কাতরানির মত লাগল। তারপর ভেসে এল সকৌতুক একটা কণ্ঠস্বর, সাথে সাথে চিনতে পারল রানা। 'ঘুমে চোখ বুজে আসছে, শুতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ভাবলাম এই মুহূর্তে তুমি নিশ্চয়ই যোগ-ব্যায়াম বা ওই ধরনের কিছু করার প্রস্তুতি নিচ্ছ। সত্যি, তোমাদের সংস্কৃতি আমার খুব ভাল লাগে···।'

'আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে তুমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ,' বলল রানা। 'প্যাঁচাল বাদ দিয়ে আসল কথায় এসো। আমার শেয়ারের কি হলো?'

নিস্তব্ধতা নেমে আসায় আবার বিচিত্র সব শব্দকোলাহল শোনা গেল। তারপর ইস্টম্যান বলল, 'কিভাবে কথাটা বলব ঠিক বুঝতে পারছি না, রানা। যদিও জানি না রহস্য বা মানেটা কি, কিন্তু এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে তোমার এই শেয়ারগুলো হাত বদল করা অত্যন্ত কঠিন হবে। বিশ্বাস করো, সবার সাথে কথা বলেছি আমি, কিন্তু কেউ ওগুলো চায় না।'

'তুমি নিউ ইয়র্কের ক্লোজিং প্রাইস দেখেছ?'

'অবশ্যই, এবং দারুণই বলব আমি—তিনশো আট। তারচেয়ে বড় কথা, সানফ্রান্সিসকোর ক্লোজিং প্রাইসও দেখেছি আমি, আই বি এ স্থির হয়ে আছে তিনশো আট দশমিক শূন্য চার-এ। কিন্তু তুমি তো জানো কারা কিনছে, রানা। বড় কোন কোম্পানী নয় ছোটখাট পুঁজিপতিরা—আই বি এ-র শেয়ারের ওপর চিরকাল লোভ ছিল যাদের, কিন্তু আগে কখনও কেনার সুযোগ পায়নি, কারণ হোল্ডিং কোম্পানীগুলো আই বি এ-র সমস্ত শেয়ার আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। কাজেই আমরা একটা সমস্যার মুখে পড়েছি, রানা।

'আমি যদি শেয়ারগুলো বাজারে ছাড়ি, ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, তাতে দর কমে আসতে বাধ্য। ওগুলো আমি অনায়াসে আগামী তিরিশ দিনের মধ্যে বিক্রি করে দিতে পারি, প্রতিবার অল্প অল্প করে, কিন্তু ওগুলো ডাম্প করতে যাওয়াটা হবে আত্মহত্যার সামিল। আমি আশা করেছিলাম সবগুলো শেয়ার গছাবার মত একজন ক্রেতা পেয়ে যাব, কিন্তু আমার মন ভেঙে গেছে। কোন ইনস্টিটিউটই আগ্রহী নয়। কাজেই, রানা, এবার আমাকে সব কথা খুলে বলতে হবে তোমার। তুমি তোমার শেয়ার বিক্রি করে দিতে চাও, এটা স্রেফ বিশ্বাস্য নয়। তুমি আসলে বেচতে চাও না, তোমার আসলে কিছু তথ্য দরকার, ঠিক?'

'ঠিক,' বলল রানা। জন ইস্টম্যানকে বিশ্বাস করতে হবে ওর, তা না হলে তার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। তাকে চেনে ও, কথাটা গোপন রাখবে, কাজ করবে একা শুধু ওর স্বার্থে। ইস্পাত বাংলা এত বড়

একটা প্রতিষ্ঠান যে ছল-চাতুরি করার কথা ভাববে না সে।

'তাহলে মন দিয়ে শোনো,' বলল ইস্টম্যান। 'কাল দিনটা তোমার খুব খারাপ যাবে, যদি না আগে থাকতে কোন ব্যবস্থা নাও। স্যাম বুলহ্যামকে চেনো?'

'চিনি।'

'স্যাম, তুমি হয়তো জানো না, বেশ ক'টা ব্লু চিপ কোম্পানীর ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করে···।'

'আমি জানি।'

'কিন্তু একটা জিনিস তুমি জানো না। স্যাম বুলহ্যামের সাথে খানিক আগে কথা হয়েছে আমার। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার শেয়ারগুলো তাকে আমি গছাবার চেষ্টা করি। কুৎসিত হেসে আমাকে ব্যঙ্গ করল সে।'

'ব্লু চিপ' কোম্পানীগুলো আই বি এ-র প্রায় বিশ লাখ শেয়ার ধরে রেখেছে।

'অবশ্য শুধু ব্যঙ্গ করেনি, কিছু উপদেশও দিল আমাকে। কাল সকালে নিউ ইয়র্ক মার্কেট খোলার আগে তোমার যে-কোন কাগজ-পত্র আমি যেন বিপজ্জনক আবর্জনা ভেবে আর কাউকে গছিয়ে দিই। সকাল হতে আর মাত্র দশ ঘণ্টা দেরি, রানা।'

'সে তোমাকে কোন কারণ জানিয়েছে?'

'জানিয়েছে, কিন্তু কারণটা তোমাকে জানাতে আমার বাধছে···।'

'সেক্ষেত্রে আমার ধারণা সত্যি হলে তুমি শুধু হ্যাঁ বলো,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'আই বি এ-র দুই মিলিয়ন শেয়ারের ওপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে স্যাম বুলহ্যামের। কাল সকালে মার্কেট খুললে ওগুলো ডাম্প করার প্রস্তাব দেবে সে···।'

রানাকে বাধা দিয়ে ইস্টম্যান বলল, 'তোমার অনুমান নির্ভুল।'

'এবং আমার চেয়ে অনেক কম দামে বিক্রি করবে সে?'

'হ্যাঁ। কেউ যদি তোমাকে দুশো পঞ্চাশ বা ষাটও বলে, সকালের লন্ডন মার্কেটে, শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিলে ভাল করবে তুমি—অন্তত আমার পরামর্শ এটাই। তা যদি করো, স্যাম বুলহ্যামকে একটা ছ্যাঁক দিতে পারবে···।'

'সে লন্ডন মার্কেট ব্যবহার করছে না কেন?'

'টাকাটা তার নয়। তাছাড়া, ছুটিতে রয়েছে সে। জ্যামাইকায়।'

বনিতার জন্যে রেখে যাওয়া চিরকুটটা টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে এখনও। গলা লম্বা করে বেডরুমের ভেতর তাকাল রানা। ঘুমের মধ্যে নড়েনি বনিতা। পকেট থেকে কলম বের করে কাগজটার ওপর নতুন করে লিখল ও 'মাফ চাই, প্লীজ। জরুরী কাজে আবার বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। ফিরে এসে তোমাকে ফোন করব।'

বেডরুমে ঢুকে বিছানার পাশের কেবিনেটে রাখল কাগজটা, ঘুম থেকে উঠেই যাতে দেখতে পায় বনিতা। ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠল মেয়েটা, চাদরের

তলায় লোভনীয় মোচড় খেল শরীরটা। 'ওরে পাজী!' বিড়বিড় করে বলল সে, ঘুম ভাঙেনি, অবয়বে তৃপ্তি ভরা হাসির প্রলেপ।

লিভিং রুমে ফিরে এল রানা, রিসিভার তুলে ডায়াল করল একটা নম্বরে। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা অচিন পাখি রেডি চাই আমি। ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করুন—মন্টেগো বে, জ্যামাইকা।'

পাঁচ

পাওনা ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিল পিটার গুডউইল, সহকর্মীদের জানাল দু'হপ্তার জন্যে ওয়েলস-এ হাঁটতে যাচ্ছে সে।

'তোমাকে দরকার হলে যোগাযোগ করব কিভাবে?' তার সেকশন বস্ জিজ্ঞেস করল।

'যোগাযোগ করার একটাই উপায় আছে,' সহাস্যে জবাব দিল পিটার গুডউইল। 'ব্ল্যাক মাউন্টেনে উঠে আমার নাম ধরে জোরে ডাকতে হবে...।'

পাওনা ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছে ডিক ব্রুসও। কোচে চড়ে দু'হপ্তা ওয়েস্ট কান্ট্রি চষে বেড়াবে সে। 'এই ছুটির আকর্ষণীয় দিকটি হলো,' সহকর্মীদের জানাল সে, 'আগে থেকে বলার কোন উপায় নেই ঠিক কোথায় যাচ্ছি। মিস্ট্রি ট্যুর বলতে পারো—চাকরির একঘেয়েমি দূর করার উত্তম দাওয়াই।'

হার্টফোর্ডশায়ার এভিয়েশন ফ্যাক্টরি থেকে বিদায় নেয়ার সময় সহকর্মীদের চা খাওয়াল উইলিয়াম কার্টার, বলল, 'ফ্রান্সে ফিরে যেতে ভালই লাগবে আমার। তোমাদের অফিস টাইম আর ইংলিশ রুটি মেরে ফেলছে আমাকে।'

কোন রকম গোপনীয়তা থাকল না, হারউইচ থেকে হুক অভ হল্যান্ডগামী ফেরিতে মিলিত হলো ওরা তিনজন, লাঞ্চের সময় একই টেবিলে বসল, কথা বলল নিঃসংকোচে। বোটটা অর্ধেক ভরেছে মাত্র, বেশিরভাগ লোকই যাচ্ছে ছুটি কাটাতে, আশপাশের টেবিলে কি ঘটছে না ঘটছে সে-ব্যাপারে তাদের কারও কোন আগ্রহ নেই।

'বুদ্ধিটা তাহলে কাজে লাগছে?' উইলিয়াম কার্টার এক গাল হাসল। 'এখন তাহলে আমাদের ঠিক করে ফে[illegible] হয়, কখন আর কোথায়।'

'কাজ যে হবে তা তো আমি বলেছিলাম,' স্বভাবসুলভ কর্কশ কণ্ঠে বলল ডিক ব্রুস। চমৎকার বুদ্ধিটা তার মাথা থেকেই বেরিয়েছে—যেভাবেই হোক আকাশ থেকে ফেলে দিতে হবে একটা প্লেনকে, কিন্তু দেখে যেন মনে হয় ডিজাইনে ত্রুটির জন্যে ঘটনাটা ঘটেছে। টেইলপ্লেন অ্যাসেম্বলিতে কারিগরি ফলাবে ওরা। ফলে নিজস্ব জেনারেটিং সিস্টেম থাকা সত্ত্বেও প্লেনটা ইলেকট্রিক পাওয়ার হারাবে। উড়ন্ত অবস্থায়, নির্দিষ্ট এক সময়ে, কোন রকম আগাম নোটিস না দিয়েই, পঙ্গু হয়ে যাবে প্লেন। প্ল্যানটার একটা মাত্র খুঁত

হলো, প্রি-ফ্লাইট চেক-এর সময় শুধু এঞ্জিনিয়ার তার একটা মিটারের সাহায্যে ক্রটিটা ধরতে পারবে। পাইলট যখন প্রি-টেক-অফ চেক করে, মিটারটা তার সাথে থাকে না।

ড্রাগ-এর খবরটা আনে উইলিয়াম কার্টার। জিনিসটা সংগ্রহও করে সে। বেশ ক'বছর আগে ফ্রান্সের একটা এভিয়েশন মেডিকেল সেন্টারে কিছু ড্রাগের ওপর গবেষণা হয়েছিল, আরোহীদের ওপর বিভিন্ন ড্রাগের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে। ডিক ব্রুস প্লেনটাকে মাঝ আকাশে অচল করার প্ল্যান দিল, আর ঠিক তারপরই উইলিয়াম কার্টারের মনে পড়ল ড্রাগটার কথা, মানুষের স্মৃতিতে যেটা গর্ত তৈরি করতে পারে। ড্রাগটা এঞ্জিনিয়ারদের খাওয়াতে পারলে, টেইলপ্লেন অ্যাসেম্বলিতে যতই ক্রটি থাকুক, পরীক্ষা করে তারা রায় দেবে, প্লেন আকাশে ওঠার সম্পূর্ণ উপযোগী। জহির আব্বাসকে প্রথম গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করে ওরা, তবে ওষুধটায় কি রকম কাজ হবে জানা ছিল না বলে প্লেনটার কোন ক্ষতি করেনি।

হুক অভ হল্যান্ডে পৌঁছুল বোট। ট্যুরিস্টদের সাথে নেমে এল ওরা। ট্রেনে উঠল, আমস্টারডাম যাবে। ট্রেনে ওঠার পর তিনজন আলাদা হয়ে গেল। আমস্টারডামে পৌঁছে আলাদাভাবে চলে এল টার্মিন্যালে। তারপর শিফলগামী একটা বাসে চড়ল। শিফল থেকে কেএলএম ফ্লাইট ধরে রোমের উদ্দেশে রওনা হলো ওরা।

জ্যামাইকার মন্টেগো বে এয়ারপোর্ট তৈরি করা হয়েছে উপকূলরেখার ওপর, সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে এসে সহজেই ল্যান্ড করতে পারে প্লেন। এয়ারপোর্টের পোর্টাররা সামরিক ধাঁচের শর্টস আর শার্ট পরা, আরোহীদের লাগেজ আনলোড না হওয়া পর্যন্ত এক লাইনে সুশৃঙ্খলভাবে অপেক্ষা করে, দুনিয়ার বেশিরভাগ এয়ারপোর্টের মত লাগেজ দখল করার জন্যে নোংরা টানা-হ্যাঁচড়া নেই এখানে। ব্যাগ ইত্যাদি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় আরোহীদের, সময়টা যাতে বিরক্তিকর হয়ে না ওঠে তার জন্যে জ্যামাইকান ট্যুরিস্ট বোর্ড-এর তরফ থেকে সবাইকে বিনামূল্যে পানীয় পরিবেশন করা হয়। লাগেজ আসার পর আর কোন ঝামেলা নেই, কারণ ইতোমধ্যে কাস্টমস অফিসাররা তাদের তল্লাশী শেষ করেছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সি, তোমার পছন্দমত যে-কোন একটায় ওঠো তুমি, ভাড়া ঠিক করার সময় পুলিস তোমাকে সাহায্য করবে। এত রকম সুযোগ ও স্বস্তি দুনিয়ার আর কোন এয়ারপোর্টে পাওয়া যাবে না।

আই বি এ-র অচিন পাখি প্রাইভেট ফ্লাইট হিসেবে মন্টেগো বে-তে ল্যান্ড করার পর, দুটো কারণে খানিকটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো। প্রথম কারণ, এর আগে কখনও প্লেনটা ল্যান্ড করেনি এখানে, এবং নির্দেশ ইত্যাদি অচিন পাখির নিজস্ব কমপিউটরের মাধ্যমে কন্ট্রোল টাওয়ারে রিলে করা হলো। দ্বিতীয় কারণ, আই বি এ-র অচিন পাখি মাত্র একজন আরোহীকে নিয়ে এসেছে।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে রানা, চীফ পোর্টার ওর সামনে উদয় হলো।

রানার হাত থেকে ব্রীফকেসটা চেয়ে নিল সে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে চীফ কাস্টমস অফিসারের হাতে ধরিয়ে দিল। ব্রীফকেস খুলে ভেতরটা পরীক্ষা করলেন চীফ কাস্টমস অফিসার, নির্লিপ্ত চেহারা, চক দিয়ে একটা চিহ্ন আঁকলেন লেভেলের ওপর, ব্রীফকেসের চকচকে গা নোংরা করতে চাইলেন না। পথ দেখিয়ে রানাকে আউটার হলে নিয়ে এল চীফ পোর্টার, অপেক্ষারত কাসিমের হাতে তুলে দিল ব্রীফকেসটা। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল কাসিম, কিন্তু কথা বলল না। এক হাতে ব্রীফকেস নিয়ে লিংকন কন্টিনেন্টাল-এর পাশে দাঁড়াল সে, অপর হাত দিয়ে গাড়ির পিছনের দরজা খুলল। এয়ার কন্ডিশনারটা সচল ছিল এতক্ষণ, ভেতরটা ঠাণ্ডা। সামনের দরজা দিয়ে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল কাসিম, ছেড়ে দিল গাড়ি। এয়ারপোর্ট এলাকা থেকে বেরিয়ে আসার পর হাসল রানা, বলল, 'কি হে, কাসিম, কেমন আছ তুমি?'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল কাসিম। ভক্তি আর বিনয়ে হাসিমাখা চোখ দুটো প্রায় বুজে এল তার। আলকাতরার মত ঘন কালো চেহারায় দাঁতগুলো যেন সাদা মুক্তো। 'জাস্ট ফাইন, বস্, জাস্ট ফাইন।'

'গাড়িটা ঠিক আছে তো?'

'জাস্ট ফাইন, বস্।'

'ধরে নিতে পারি তোমার মা আর বাবা জাস্ট ফাইন, তোমার বোনেরাও জাস্ট ফাইন···তা, বিয়েসাদী করবে কবে?'

'জাস্ট ফাইন ধরনের একটা কনে পেলে একদিনও দেরি করব না, বস্।' হঠাৎ গম্ভীর হলো কাসিম, সেই সাথে উদ্বেগ ফুটে উঠল চেহারায়। 'বস্, আপনার কাউকে পছন্দ হলো, নিজের জন্যে?' এর আগে যে-ক'বার জ্যামাইকায় বেড়াতে এসেছে রানা, ওর সাথে একটা না একটা সুন্দরী মেয়ে ছিল। প্রতিবারই ভুল বুঝেছে কাসিম, ধরে নিয়েছে সঙ্গের মেয়েটি বসের স্ত্রী হবে। কিন্তু প্রতিবারই ওর ভুল ভেঙে দিয়েছে রানা। তারপর থেকে সুযোগ পেলেই রানাকে বিয়ে করার তাগাদা দেয় সে।

'অপেক্ষা করো, দেখবে হঠাৎ একদিন তোমাকে আমি চমকে দিয়েছি!'

ভেগা কটেজ-এর দিকে ছুটছে গাড়ি, এই পথ ধরে দু'জনেই বেশ ক'বার গেছে ওরা। ভেগা কটেজ একটা পারিবারিক হোটেল, উপকূল থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে, হোটেলের সামনে চোখ জুড়ানো সৈকতের বিস্তৃতি। আই বি এ-র সেন্ট্রাল সুইচবোর্ডের মাধ্যমে খবর পেয়েছিল কাসিম, বরাবরের মত রানার জন্যে তিনটে কামরা বুক করেছে সে, প্রতিটির সাথে দুটো করে ঝুল-বারান্দা, ঝুলে আছে ক্যারিবিয়ানের গাঢ় নীল পানির ওপর। রানার জন্যে সযত্নে তুলে রাখা সুটকেসটা আগেই হোটেলে নিয়ে এসেছে কাসিম, ভেতরে রয়েছে মোজা, শার্ট, আন্ডারঅয়্যার ও ট্রপিক্যাল ওয়েটস্যুট, সবগুলো সম্প্রতি ইস্ত্রি করা হয়েছে। সুটকেসটা মাঝখানের কামরায় পেল রানা।

'মি. রানার অতিথিরা কখন আসবেন?' ডোরম্যান জানতে চাইল, হোটেলে নতুন সে।

'কিছুই দেখছি জানো না তুমি,' জবাব দিল কাসিম। 'আমার বস্, মি.

রানা, প্রাইভেসী পছন্দ করেন।'

রানা জ্যামাইকায় এলে কাসিম ওর শোফার, ব্যাটম্যান, বডিগার্ড ও ইনফরমেশন সার্ভিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। লিংকন কন্টিনেন্টালটা রানারই কেনা, অনুপস্থিতিতে কাসিম সেটাকে ট্যাক্সি হিসেবে ব্যবহার করে—টাকার কুমীর ব্যবসায়ী ট্যুরিস্টদের নিয়ে দ্বীপের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, গলফ কোর্সে দিয়ে আসে, নাইটক্লাব থেকে নিয়ে আসে, প্রতি মুহূর্তে খোলা রাখে চোখ আর কান। কিংসটন, ওকো রিয়োস, মন্টেগো বে, গুরুত্বপূর্ণ কোন লোক যেখানেই আসুক, তার সম্পর্কে ঠিকই জানতে পারবে কাসিম। তথ্যগুলো রানার জন্য সংগ্রহ করে রাখবে সে, যদি দরকার হয়। ধনী শিল্পপতিদের অর্ধেকেরও বেশি ছুটি কাটাতে আসে জ্যামাইকায়, কাসিমের দেয়া খুঁটিনাটি তথ্য প্রায় সময়ই কাজে লেগে যায় রানার।

'মি. বুলহ্যাম কোথায়, কাসিম?' ডোরম্যান চলে যেতে জানতে চাইল রানা।

আনন্দের আতিশয্যে দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে এল কাসিমের গলা দিয়ে, নিজের উরুতে বার কয়েক চাপড় মারল সে, তার চকচকে কালো মুখে ভাঁজ পড়ল কয়েকটা। 'মি. বুলহ্যাম, স্যার, গোটা দ্বীপে হাসির সাপ্লাইয়ার সেজে বসে আছেন। মন্টেগো বের ইয়ট ক্লাবের কাছাকাছি নোঙর ফেলেছে তাঁর বনবন, আহ্লাদে আটখানা চেহারা নিয়ে বোট থেকে নেমে এসেছেন তিনি, কিন্তু তারপর আর বোটে পা ফেলেননি⋯।'

'কেন, কাসিম? কুমীর তাকে গিলে খেয়েছে?'

'ইয়েস, স্যার, ইন আ ম্যানার অভ স্পীকিং, ইয়েস, স্যার। একটাই কুমীর, কিন্তু ডাঙায় বা পানিতে অত সুন্দরী কুমীর আপনি আর দেখেননি। আমরা তাঁর নাম দিয়েছি হোয়াইট লেডি। আচ্ছা, বলুন তো, রোদেই যদি না বেরুলেন, তাহলে আর জ্যামাইকায় আসার দরকার কি ছিল? তবে, হ্যাঁ, মি. বুলহ্যাম ভারি পছন্দ করেন হোয়াইট লেডিকে। তা না হলে হোয়াইট লেডির সাথে তিনিও কেন ঘরকুনো হয়ে পড়লেন?'

'কে এই হোয়াইট লেডি, কাসিম?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, বস্,' বলল কাসিম, সিলিঙের দিকে চোখ তুলে মণি দুটো চারদিকে ঘোরাল। 'তাঁর নামটা ভারি বিদঘুটে, উচ্চারণ করতে পারি না।'

'তার সম্পর্কে কিছুই তুমি জানো না? কোথায় উঠেছে? কোন হোটেলে, নাকি এস্টেটে? কার সাথে রয়েছে সে? তাড়াতাড়ি করো, কাসিম, আমার সময় কম।'

বসের সময় কম শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠল কাসিম। 'দ্বীপে তিনি এলেন মি. ফন মপেলডর্ফ-এর সাথে, বস্, একটা প্রাইভেট প্লেনে করে। কিন্তু তাকে রেখে ইউরোপে ফিরে গেলেন মি. মপেলডর্ফ। সেই থেকে ফুলমুন হোটেলে ছিলেন হোয়াইট লেডি।'

'তারপর?'

'তারপর, মি. বুলহ্যাম দ্বীপে পৌঁছুবার সাথে সাথে, ফুলমুন থেকে হোয়াইট লেডি একটা ছেলেকে তার কাছে পাঠালেন। তিন দিনের মধ্যে, বস্, কালাহান বীচ ভাড়া করলেন মি. বুলহ্যাম, ফুলমুনের ভাড়া মিটিয়ে দিলেন, হোয়াইট লেডিকে নিয়ে দু'জন একসাথে উঠলেন কালাহান বীচে। হোয়াইট লেডি রোদ পছন্দ করেন না, আল্লাই মালুম কেন। মি. বুলহ্যামকে কি জাদু করেছেন হোয়াইট লেডি, তাও আল্লাই বলতে পারবে, ভদ্রলোক বনবনে চড়ে বেড়াতে বেরুচ্ছেন না।'

'ফন মপেলডর্ফ, কেমন?' কি যেন স্মরণ করল রানা। 'ইউরোপিয়ান প্লেবয়দের প্রেম-ভালবাসার খবর রাখা ভারি কঠিন, তবে ক'দিন আগে কোথায় যেন শুনলাম মিস কালাব্রিয়া তার পিছু নিয়েছে, নাকি মিস অ্যাকাপুলকা? আজকাল কি যেন নাম বলে নিজের, ভেরোনিকা বা জেসিকা...।'

'ঠিক, বস্, জেসিকা, তবে বাকি অংশটা আমাকে উচ্চারণ করতে বলবেন না। পারি না বলেই আমরা তাকে হোয়াইট লেডি বলে ডাকি।'

স্যাম বুলহ্যাম তাহলে জেসিকা অর্থাৎ সাবেক মিস কালাব্রিয়া অথবা অ্যাকাপুলকার সাথে বিছানা ভাগাভাগি করছে। ফন মপেলডর্ফের পরিত্যক্ত জিনিস ওটা। বুলহ্যামের যা বয়েস, এরকম কমবয়েসী একটা মেয়েকে এড়িয়ে গেলেই বোধহয় ভাল করত সে।

'মেয়েটা সম্পর্কে কি জানো তুমি, কাসিম?'

'ফুলমুনের হাউজ-বয় বলল, তিনি নাকি আপাদমস্তক ধবধবে সাদা, বস্। মি. মপেলডর্ফ চলে যাবার পর হোয়াইট লেডি নাকি সাংঘাতিক নিঃসঙ্গ বোধ করেন।'

নিজের কিছু কিছু কাজ একদম পছন্দ করে না রানা। এটাও সে-ধরনের একটা। অন্য লোকের নৈতিকতা তার উদ্বেগের বিষয় নয়। বুলহ্যাম বা রহস্যময়ী হোয়াইট লেডি কি করল না করল তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা নয় ওর, যদি না তাদের আচরণ ইস্পাত বাংলা এয়ারক্রাফটের স্বার্থহানির কারণ ঘটায়।

আই বি এ-র অস্তিত্ব হুমকির মধ্যে পড়েছে। গুজবটা একবার যদি মার্কেটে ছড়িয়ে পড়ে, আই বি এ-র বাজারদর হুহু করে নামতে শুরু করবে। রানা জানে, আই বি এ-র ব্যবসা অন্য যে-কোন কোম্পানীর চেয়ে ভাল চলছে, আই বি এ-র প্রশাসনে কোন জটিলতা বা সমস্যা নেই, যে-কোন লোক এখানে টাকা খাটিয়ে নিরাপদ বোধ করতে পারে। কিন্তু একটা কোম্পানীর জন্যে সবচেয়ে বড় শত্রু হলো গুজব আর ভিত্তিহীন প্রচারণা। আই বি এ-র বিরুদ্ধে এই দুই শত্রুকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। পাল্টা কোন ব্যবস্থা করা না গেলে স্যাম বুলহ্যামের মত লোকেরা কোম্পানীটাকে পঙ্গু করে দিতে পারে। সেজন্যেই কোম্পানীর সুনাম বজায় রাখার জন্যে যে-কোন তথ্য বা ঘটনা ব্যবহার করা ওর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। মন্টেগো বে-তে পা ফেলার পর ওর প্রথম কাজ হলো হেড অফিস জুরিখে একটা টেলিগ্রাম পাঠানো। এ-ধরনের অদ্ভুত অনুরোধ পেয়ে হেড অফিসের লোকজন ওকে

পাগল ভাবতে পারে। এর আগে কখনও কোন বিউটি কুইন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ডোশিয়ে চায়নি রানা।

স্থানীয় সময় সাতটায় টেলিগ্রামটা পাঠাল রানা, নিউ ইয়র্ক মার্কেট খুলতে এখনও চার ঘণ্টার মত দেরি আছে। প্লেনে মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমালেও, শরীরে কোন ক্লান্তি নেই। কাপড়চোপড় খুলে সুইমিং ট্রাঙ্ক পরল ও, নভেম্বরের গরম জ্যামাইকা-রোদের মধ্যে ডক্টর'স কেভ-এ বিশ মিনিট সাঁতার কাটল। সকালের এই সময়টায় লোকজন নেই বললেই চলে, কফি শপটা এখনও খোলেনি। নিজের স্যুইটে ফিরে এল ও, লাইটওয়েট স্যুট পরল, অর্ডার দিয়ে হালকা ব্রেকফাস্ট আনাল দু'জনের জন্যে। ব্রেকফাস্ট সেরে লিংকন কন্টিনেন্টালে চড়ল ওরা, গন্তব্য কালাহান বীচ। কোস্ট রোড ধরে যেতে হবে, রোজ হল থেকে বেশি দূরে নয়।

কালাহান নামে একজন ডায়মন্ড টাইকুন ছিলেন, জ্যামাইকা দ্বীপের উত্তর উপকূলে ত্রিশের দশকে একটা দোতলা বাড়ি তৈরি করেন তিনি। সব মিলিয়ে একশো পঞ্চাশ একর জায়গা, তার মধ্যে সিকি মাইল সৈকত—সম্পূর্ণ নির্জন। সৈকতটা অর্ধচন্দ্র আকৃতির, সাদা বালি চিকচিক করছে। অর্ধচন্দ্রের মাঝখানে গভীর একটা হারবার তৈরি করেন কালাহান, জীবিতকালে সেখানে সমুদ্রগামী একটা ইয়ট বেঁধে রাখতেন। স্থানীয় লোকেরা বাঁকা চোখে দেখত তাঁকে, জায়গাটার নাম রাখে তারা কালাহান বীচ। ত্রিশের দশকে কালাহান বীচে যে-সব পার্টি দেয়া হত, কোনটাতেই শালীনতা বা আব্রুর কোন অস্তিত্ব থাকত না। কালাহান নিজে তুখোড় জুয়াড়ি ছিলেন। জানা যায়, রুলেতে একবার তিনি সিকি মিলিয়ন পাউন্ড হেরে যান।

উনিশশো চল্লিশ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে চাকরি করার সময় খুন হন কালাহান, মারা যাবার পর জানা যায় তার সমুদয় দেনার পরিমাণ দুই মিলিয়ন পাউন্ডের কম নয়। সেই থেকে কালাহান বীচ হাতবদল হতে শুরু করে। ইদানীং শোনা যাচ্ছে কোন এক আমেরিকান হোটেল চেইন কালাহান বীচ কিনে নিতে চাইছে, তাদের ইচ্ছে নিম্নবিত্ত ট্যুরিস্টদের জন্যে স্বল্পখরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা। স্থানীয় লোকদের মধ্যে এ-ব্যাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। প্রতি বছর প্রচুর ট্যুরিস্টদের টানবে বটে, কিন্তু তারা কম খরচে ছুটি কাটিয়ে যাবে—বড় বড় হোটেল আর রেস্তোরাঁগুলো মার খাবে প্রচণ্ড।

এই মুহূর্তে কালাহান বীচের মালিক একটা জ্যামাইকান/ব্রিটিশ/বাহামানিয়ান সিন্ডিকেট। প্রতি মাসে দু'হাজার পাউন্ড খসাতে পারলে যে-কেউ ভাড়া নিতে পারে কালাহান বীচ। রানা অন্তত জানে, স্যাম বুলহ্যামের পিছনের পকেটে এর চেয়ে বেশি টাকা থাকে, কারণ বছরে এক মিলিয়ন ডলারের চেয়ে বেশি আয় করে সে।

কালাহান বীচে একা পৌঁছুল রানা। হাউজ-বয় গুইসেপি বলল, অপেক্ষা করুন, মনিব বাড়ি আছেন কিনা দেখতে হবে। নিউ ইয়র্কের ঠিকানা লেখা একটা ভিজিটিং কার্ড দিল তাকে রানা, কোম্পানীর নাম নেই। খানিক পরই পথ দেখিয়ে টেরেসে নিয়ে আসা হলো ওকে। একা একটা ইজিচেয়ারে বসে

আঙুর আর কফি খাচ্ছে স্যাম বুলহ্যাম। পঞ্চান্ন বছর বয়েসে লোকটার বুক আর পেট এক হয়ে গেছে, আলাদা করে চেনার উপায় নেই, মোটাসোটা বিরাট দেহ। চেয়ার ছেড়ে রানার সাথে করমর্দন করল সে, সবিনয়ে কফি সাধল। সাদা লিনেন শর্টস পরে আছে সে, রঙচঙে ফুল আঁকা হাওয়াইয়ান শার্ট। মাথা নেড়ে কফির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল রানা।

রানা চেয়ারে বসার পর নিজে ইজিচেয়ারে বসল বুলহ্যাম। 'আপনি কোন্ ব্যবসায় আছেন, মি. রানা?' জানতে চাইল সে।

মিষ্টি করে হাসল রানা। তাহলে এই নিয়মে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বুলহ্যাম। খুব ভাল করেই জানা আছে তার রানা কে বা কি, তবে ও যে সিকিউরিটির বিশেষ দায়িত্ব পালন করছে তা সম্ভবত জানে না। তার জানার কথা, ইস্পাত বাংলার টেকনিক্যাল সেলস-এর দায়িত্বে রয়েছে রানা। 'সব ধরনের ব্যবসা, মি. বুলহ্যাম। স্টীল। কেমিকেলস। এভিয়েশন। লেদার। ফুটঅয়্যার।'

'তেল নয়?'

'কিছু পেট্রোকেমিকেল ইন্টারেস্ট আছে বটে, তবে তেল নয়।'

'এবং ধরে নেয়া হচ্ছে আপনি কোন্ গোষ্ঠীর সাথে আছেন আমার তা অজানা নয়?'

'অবশ্যই।'

'বোধহয় ইস্পাত বাংলা এয়ারক্রাফট, তাই না?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কী সৌভাগ্য আমার, আপনার মত একজন ব্যক্তি গরীবের সাথে দেখা করতে এসেছেন...।'

বে-র চারদিকে চোখ বুলাল রানা। বিল্ডিঙের কোন ছায়া পড়ে না সৈকতে, কাজেই বালিতে সারাদিন রোদ লাগে। নারকেল গাছের পাতা দিয়ে ছাওয়া কয়েকটা আশ্রয় বানানো হয়েছে, নিচে চেয়ার টেবিল পাতা। পানির কিনারায় নারকেল গাছের গুঁড়ি দিয়ে একটা কুঁড়েঘর তৈরি করা হয়েছে, সম্ভবত অতিথিদের জন্যে। ডান দিকে অ্যাসফল্ট টেনিস কোর্ট, পাশেই আউটডোর জিমনাশিয়ামের কাঠের কাঠামো। সরু একটা খালের শেষ মাথায় বালি খুঁড়ে সুইমিং পুল তৈরি করা হয়েছে, কিনারায় ডাইভিং স্টেজ, সাঁতার দিয়ে সরাসরি সাগরে চলে যাওয়া যায়। সুইমিং পুলের ধারে নিচু ছাদের চেঞ্জিং রুম, রুমগুলোর বাইরে লাউঞ্জিং সীট। সেইলিং ডিঙিটা বালির ওপর তোলা দেখল রানা। একটা মোটর বোটও রয়েছে চৌকো পাল আর জ্যামাইকান পতাকাসহ। পানির ওপর চকচকে বয়া ভাসতে দেখল রানা, সারফেসের নিচে অ্যান্টি-শার্ক নেট ধরে রেখেছে ওগুলো। বিউটি কুইন অর্থাৎ জেসিকার ছায়ামাত্র কোথাও দেখা গেল না। তবে, কাসিম তো আগেই জানিয়েছে, হোয়াইট লেডি রোদ পছন্দ করেন না। যে-দেশে প্রায় সব ট্যুরিস্টই রোদ মেখে তামাটে হয়ে থাকে, সেখানে একটা ধবধবে সাদা চামড়া উত্তেজক হলেও হতে পারে, ভাবল রানা, তুমি যদি সে-ধরনের

সফিসটিকেশনের মূল্য দাও।

'জায়গাটা চমৎকার, তাই না?' জিজ্ঞেস করল স্যাম বুলহ্যাম।

'একটু বোধহয় বেশি নির্জন।'

'আপনি অসময়ে এসেছেন। গত হপ্তায় এলে আপনাকে আমি তিনটের মধ্যে থেকে যে-কোন একটা বেছে নেয়ার সুযোগ দিতে পারতাম··· তিনজনই বিউটি কুইন প্রতিযোগিতায় নাম লেখাবার যোগ্য, একজনেরও বয়স সতেরোর বেশি নয়।' কথা শেষ করে গলা ছেড়ে হাসল স্যাম বুলহ্যাম।

রানা হাসল না, যদিও চেহারায় কোন রকম রাগ বা বিতৃষ্ণার ভাবও ফুটল না। রসিকতা রসিকতাই, সেটা নোংরা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে অপমান করছে, কারও কিছু করার নেই। তাড়াহুড়ো করে প্রসঙ্গ তোলার দরকার নেই, উপলব্ধি করল ও। বুলহ্যামকে নিজের গতিতে এগোতে দেয়াই ভাল। লোকটা জানে কেন তুমি এখানে এসেছ। জানে না শুধু তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কতটা জানো তুমি। বিড়াল ইঁদুরকে লক্ষ্য করছে, ইঁদুর নজর রাখছে বিড়ালের ওপর। কিন্তু কে বিড়াল, আর কে ইঁদুর? রানা জানে, কি চিন্তা করছে বুলহ্যাম। আই বি এ-র লোকটা কি চায়? এখানে এসেছে কেন? কতটুকু কি জানে সে? এগুলো প্রাথমিক চিন্তা। কিন্তু তারপর, সন্দেহটা মাথাচাড়া দেবে—আমি কি কিছু দেখেও দেখছি না? আই বি এ-র বাজারদর কমিয়ে দেয়ার আগে আমার কি আরও কিছু জানা উচিত? আমি কি ওদেরকে ছোট করে দেখছি? বাজার সম্পর্কে ভুল ধারণা করা সাজে না স্যাম বুলহ্যামের, হিসেবে ভুল হয়ে গেলে তার সুনাম ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে। তার সুখ্যাতি নির্ভর করে প্রতিবার সঠিক হিসেবের ওপর, নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর। আই বি এ-র শেয়ার বিক্রি করে দেয়ার পরামর্শ দিল সে, তারপর যদি শেয়ারের বাজার দর পড়ে যায়, তার সুখ্যাতি আকাশচুম্বি হয়ে উঠবে, বড় বড় পার্টিরা তার দর্শনলাভের জন্যে হন্যে হয়ে ঢুঁ মারবে অফিস আর বাড়িতে। কিন্তু বিক্রি করার পরামর্শ দেয়ার পর যদি বাজার দর স্থির থাকে বা বাড়ে, রাতারাতি সুনাম হারিয়ে পথে বসতে হবে তাকে। বিড়াল আর ইঁদুর, কিন্তু কে কোন্‌টা?

'দ্বীপে কি মনে করে, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করল স্যাম বুলহ্যাম। 'উপলক্ষ্যটা কি—ব্যবসা, নাকি আনন্দ-ফুর্তি?'

'দুটোই।'

'এখানে আপনার কোন সম্পত্তি আছে?'

'না, একটা হোটেলে উঠেছি। ভেগা কটেজে।'

'জায়গাটা সম্পর্কে শুনেছি। একটু বেশি রক্ষণশীল, সম্ভবত। তবে আরামদায়ক।'

'আমার ভাল লাগে।'

'কবে পৌঁছুলেন আপনি? আপনাদের তো আবার গায়ের রঙ দেখে আন্দাজ করা মুশকিল।'

'আজ সকালে।'

'সকালে? কিন্তু এখনও তো প্লেনের সময় হয়নি!'

'আমাদের নিজেদের প্লেনে।'

'অসিন পাকি, তাই কি?'

'হ্যাঁ।'

'গ্রেট প্লেন···।'

'আমাদের গর্ব।'

'আপনাদের জন্যে সোনার খনি ছিল ওটা—এক সময়।'

'আজও ওটা সোনার খনি, ভবিষ্যতে হীরার খনি হবে,' শান্ত দৃঢ়তার সাথে বলল রানা।

'কিন্তু আমি যেন অন্য রকম শুনছি···।'

ভালই, ভাবল রানা, টেবিলে অন্তত কার্ড ফেলা শুরু হয়েছে। 'কানে এলেই সব কথা বিশ্বাস করবেন, আপনাকে আমার সেরকম মানুষ মনে হয়নি।' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'মি. বুলহ্যাম, আপনি কি প্রচুর পড়াশোনা করেন?'

'পড়ি, হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে কেচ্ছা-কাহিনী ততটা নয়।'

'কোম্পানী অ্যাকাউন্টস?'

'অবশ্যই, তবে সেগুলো বানোয়াট হলে পড়ি না।'

'আপনি কখনও আই বি এ-র অ্যাকাউন্টস দেখেছেন?'

'আপনি ঠাট্টা করছেন? ছাপা সংস্করণটা দেখেছি আমি···ওটা তো ট্যুরিস্ট আর যারা বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে তাদের জন্যে।'

'আমার ব্যাগে হাউজ অ্যাকাউন্টের কপি আছে, মি. বুলহ্যাম।'

'মাই গড। সার্টিফায়েড?'

'আপনি জানেন, আমরা রবসন অ্যান্ড মরিসন, উডকক অ্যান্ড ডানফোর্ড-কে ব্যবহার করি।'

'হ্যাঁ, শুনেছি। ওগুলো সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী, চাঁদার বিনিময়ে পড়তে দেন বুঝি?'

'অসুবিধে কি।'

'চাঁদা কত?'

'সময় থাকতে, আপনার সবটুকু সময় ওগুলোর পেছনে ব্যয় করতে হবে।'

'এই যেমন, কোথাও কোন ফোন করা চলবে না, কেমন?'

'ঠিক ধরেছেন, কোন ফোন করা চলবে না,' বলল রানা। প্যাঁচ কষাকষিটা উপভোগ করছে ও। কে কি বলছে দু'জনেই জানে, তবে কেউ নিজের ভূমিকা সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না। আই বি এ হাউজ অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করার সুযোগ বুলহ্যামকে দেবে রানা, বুলহ্যাম যদি নিউ ইয়র্কের ব্রোকারদের ফোন করে আই বি এ-র শেয়ার বিক্রি করার নির্দেশ না দেয়। রানা জানে, হাউজ অ্যাকাউন্টে কোন খুঁত নেই, একটা ব্যালেন্স শীট পড়ার যোগ্যতা রাখে এমন যে-কোন লোক ওটায় একবার চোখ বুলালেই বুঝতে পারবে যে বাজারে এই সময় বিশ লাখ শেয়ার বিক্রি করা স্রেফ

পাগলামি। তবে, টেক্কা যদি যথেষ্ট বলে বিবেচিত না হয়, তাহলে এখনও টেবিলে জোকার ফেলার সময়। 'ছ'মাসের ভ্যালুর সম্পর্কে আপনার ভবিষ্যদ্বাণী কি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'সংখ্যায় কত?'

'পাঁচ লাখ শেয়ার।'

' "এ" শেয়ার?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

চেয়ার ছেড়ে টেরেসে পায়চারি শুরু করল স্যাম বুলহ্যাম। মাঝে মধ্যে অগ্রিম কেনা হয় শেয়ার, কথা পাকা হবার সময় দরদাম ঠিক করা হয়। ছ'মাসের মধ্যে শেয়ারের দাম দু'দিকের যে-কোনদিকে অনেক বেশি উঠতে বা নামতে পারে—একজন মানুষ বিরাট ধনী বা পথের ফকির হয়ে যেতে পারে। 'আপনাদের শেয়ারগুলো আপনারা ধরে রাখতে পারেন,' বলল ও।

আবার বসল বুলহ্যাম। সরাসরি তার চোখে তাকাল রানা। প্যাঁচ কষার পালা শেষ হয়েছে। 'সালেহ চৌধুরী, শামসুল হক, দারা শিকদার ও মাসুদ রানা, এঁদের নিয়ে গঠিত একটা কনসোর্টিয়াম-এর প্রতিনিধিত্ব করছি আমি,' বলল রানা।

'আপনার ডাইরেক্টররা···।'

'হ্যাঁ, তবে এ-ব্যাপারটায় আমরা ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়েছি। আমরা আপনাকে ছ'মাসের ফরওয়ার্ড-প্রাইস দিতে প্রস্তুত আছি, পাঁচ লাখ আই বি এ শেয়ারের জন্যে। আই বি এ-র প্রতিটি শেয়ারের দাম পাবেন আপনি—চারশো আট।'

'জেসাস ক্রাইস্ট! ছ'মাসের মধ্যে আই বি এ-র শেয়ারের বাজারদর যাই হোক না কেন, আপনি আমার কাছ থেকে পাঁচ লাখ কিনবেন প্রতিটি চারশো আটে? নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছেন আপনি। তাছাড়া, আই বি এ-র পাঁচ লাখ শেয়ার আমার কাছে আসলে নেইও···।'

'আমাদের কাছে আছে। এবং আপনার কাছে বিক্রি করতে রাজি আছি আমরা, আজকের বাজারদর অনুসারে, ছ'মাসের মধ্যে ডেলিভারি পাবেন। আজকের বাজারদরটাও শুনে নিন—এক ঘণ্টা পর নিউ ইয়র্ক আই বি এ-র প্রতিটি শেয়ার বিক্রি হবে তিনশো আটে।'

উন্মাদের মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল স্যাম বুলহ্যাম। টেবিলের ওপর বার কয়েক চাপড় মারল সে, চোখের কোণ থেকে পানি মুছল। তার শান্ত হবার অপেক্ষায় থাকল রানা। 'উফ! দম আটকে মারা পড়ব! আপনি আমাকে হাফ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং অফার করছেন, ছ'মাসের মধ্যে নীরস কোন ব্যাপার নয়, নয় কোন ভাঁওতাবাজি! আপনার কাছ থেকে শেয়ারগুলো কিনব আমি, আবার আপনার কাছেই বিক্রি করব, নিজের পকেটে ভরব পাঁচ লাখ পাউন্ড, অথচ একটা পয়সাও আমাকে খাটাতে হবে না। আর আমাকে বড়শিতে গাঁথার জন্যে আপনি আই বি এ-র হাউজ অ্যাকাউন্ট টোপ হিসেবে ব্যবহার করছেন··· জেসাস ক্রাইস্ট, মি. রানা, আপনার প্রশংসা করার ভাষা

আমার জানা নেই, ফর গডস সেক!'

'যদি কিছু মনে না করেন,' বলল রানা, 'গুইসেপিকে ডেকে এবার আমার সেই কফি দিতে বলুন।'

ছয়

বে-তে সাঁতার কাটার আমন্ত্রণ জানাল স্যাম বুলহ্যাম, বোট নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর প্রস্তাব দিল, এমনকি হোটেল ছেড়ে দু'একদিন কালাহান বীচে থাকার অনুরোধও করল সে, কিন্তু প্রস্তাবগুলো সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল রানা। আইবিএ অ্যাকাউন্টস বুলহ্যামের কাছে রেখে গাড়িতে ফিরে এল ও, কাসিম ওকে পৌঁছে দিল ভেগা কটেজে। কালাহান বীচ ত্যাগ করার সময়ও বিউটি কুইন জেসিকার ছায়ামাত্র দেখতে পায়নি ও।

ভেগা কটেজে ফিরে আবার কাপড়চোপড় ছাড়ল রানা, স্যুইট থেকে বেরিয়ে সৈকতের কিনারা ধরে এগোল, তারপর আধ ঘণ্টা সাঁতার কাটল—মেদবহুল, অশ্লীল, কর্কশ লোকটার প্রতি যে রাগ ও ঘৃণা জন্মেছে সেগুলো মুছে ফেলার জন্যে।

পানিতে আধ ঘণ্টা কাটাবার পর ড্রাইভার সহ একটা ওয়াটার-স্কি বোট ভাড়া করল রানা। পানিতে তুমুল আলোড়ন তুলে খোলা সাগরে বেরিয়ে এল ওরা, মন্টেগো বে পিছনে ফেলে চলে এল কালাহান বীচের কাছে। স্কি করছে, ওর মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে ল্যান্ড করল কয়েকটা প্লেন। আগামী বছর ওগুলোর বদলে ওখানে ল্যান্ড করবে অচিন পাখি, গর্বের সাথে ভাবল রানা।

স্যুইটে ফিরে শাওয়ার সারল, তোয়ালে দিয়ে গা মুছল, বসল ঝুল-বারান্দায়, তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে রোদের তাপ, বারান্দায় চোখ ধাঁধানো আলো। শুধু শর্টস পরে রয়েছে রানা। নিউ ইয়র্কে ফোন করে সুলতা রায় চৌধুরীর সাথে পনেরো মিনিট কথা বলল ও, কথা বলল শামসুল হকের সাথে। ফোনে একটা ডিকটেশন দিল, টেপ হয়ে গেল অপরপ্রান্তে, পৌঁছে যাবে ওর জুরিখ অফিসে—ফলে অন্তত দিন দু'য়েক অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হবে ওর জুরিখ সেক্রেটারিকে। রানা এজেন্সির কয়েকটি শাখার প্রধানদের সাথে কথা বলল, এবং সবশেষে ঢাকার সাথে কথা বলল তিন মিনিট।

রিসিভার নামিয়ে রেখে শরীরটা আরাম কেদারায় এলিয়ে দিল রানা। এখন শুধু অপেক্ষার পালা। অ্যাকাউন্টস পড়ার জন্যে স্যাম বুলহ্যামকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছে ও, কাল সকালে কালাহান বীচে গিয়ে শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব সম্পর্কে বুলহ্যামের সিদ্ধান্ত জানতে চাইবে। পাঁচ লাখ শেয়ার, মেলা টাকার ব্যাপার, টোপটা বুলহ্যাম গিলবে বলেই মনে হয়। বুলহ্যামের লাভটা বিরাট বলে মনে হতে পারে, মনে হতে পারে বোকার মত তাকে টাকা পাইয়ে দিচ্ছে রানা, আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। বুলহ্যামকে দেয়া প্রতিটি টাকার

রয়েছে পাবলিসিটি ভ্যালু—সে যদি বিক্রির পরিবর্তে শেয়ার কেনে, তার দেখাদেখি বড় বড় হোল্ডিং কোম্পানীগুলোও তখন নিজেদের শেয়ার বিক্রি না করে ধরে রাখার কথা চিন্তা করবে। ফলে বাজারে শেয়ারের অধোগতি বন্ধ হবে। তারপর, যখন 'ভার্টিক্যাল টেক অফ লিফট প্লেন'-এর প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে জানবে মানুষ, শেয়ারের মূল্য তখন চারশোর চেয়ে অনেক ওপরে উঠে যেতে বাধ্য। বুলহ্যামকে যে টাকাটা দেয়া হবে সেটা অপচয় নয় কোন অর্থেই, বরং ইনভেস্টমেন্ট বলা যেতে পারে।

ভেগা কটেজে হালকা লাঞ্চ সেরে দুপুরের প্রচণ্ড গরমে দিবানিদ্রার কাছে আত্মসমর্পণ করল রানা। ধীরে ধীরে খালি, নির্জন হয়ে গেল সৈকত, আগুন ঝরা রোদের মধ্যে বাইরে টিকতে পারছে না মানুষ। মাঝে মধ্যে ভেগা কটেজের টেরেস থেকে ভঙ্গুর হাসির শব্দ ভেসে এল, কিন্তু তা-ও এক সময় থেমে গেল, হোটেলের ওপর নেমে এল নিস্তব্ধতা। দরজার সামনে এমনকি পোর্টারও ঝিমুচ্ছে, চিবুকটা ঠেকে রয়েছে বুকের ওপর।

বেলা আড়াইটার সময় এল ওরা। তিনজন।

মোটা, কর্কশ কাপড়ের শর্টস পরে আছে; পায়ে জুতো বা গায়ে জামা নেই, তবে চোখে সানগ্লাস রয়েছে। একজনের মাথায় ঘাসের তৈরি জিপিজাপা হ্যাট। একজন একজন করে ঘুম-কাতুরে ডোরম্যানকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল তারা, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দোতলার করিডরে। রানার স্যুইটটা এখানেই।

রানার দরজার সামনে তারা থামল না। করিডর ধরে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে এল, কাঁটাতারের বেড়া টপকাল, পৌঁছুল ওপরের ঝুল-বারান্দায়, জানে বারান্দা সংলগ্ন কামরাগুলোয় বোর্ডাররা এত গরমে কেউ জেগে নেই বা জেগে থাকলেও নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত যে বাইরে কি ঘটছে না ঘটছে দেখার অবকাশ নেই। রানা যে-ঘরে ঘুমোচ্ছে তার পাশের ঘরের ওপরের ঝুল-বারান্দায় চলে এল ওরা, ওখান থেকে লাফ দিয়ে নিচের ঝুল-বারান্দায় নামল, শিকারী বিড়ালের মত নিঃশব্দে। ওদের একজন পা টিপে টিপে স্ক্রীনের দিকে এগোল, স্ক্রীনটা পাশাপাশি দুটো ঝুল-বারান্দাকে আলাদা করেছে। স্ক্রীন আর রেইল-এর মাঝখানে আঠারো ইঞ্চি ফাঁক, প্রাইভেসী রক্ষার জন্যে যথেষ্ট সরু, আবার কেউ যদি পাশের কামরার বাসিন্দার সাথে ঘনিষ্ঠতা করতে চায় তাকে বাধা না দেয়ার জন্যে যথেষ্ট চওড়া। পর্দার ওই ফাঁকে দাঁড়িয়ে কান পাতল লোকটা। কামরার ভেতর থেকে কোন শব্দ আসছে না। লোকটার কালো শরীর চকচক করছে ঘামে। তার কাঁধ দুটো বিশাল, পেট অ্যাথলেটদের মত চাপা, পেশল উরু, শক্ত সমর্থ পা। বাকি দু'জনকে ইঙ্গিত দিল সে, একই ধাঁচের গড়ন তাদের। ফাঁকটা গলে ভেতরে ঢুকল, একজন একজন করে। টেরেস হয়ে ঢুকে পড়ল আউটার রুমে।

ভেতরের কামরার দরজাটা বন্ধ, এয়ার কন্ডিশনারের গুঞ্জন ভেসে আসছে, সেই গুঞ্জনে ছোটখাট বাকি সব শব্দ চাপা পড়ে গেল। তিনজন পাশাপাশি দাঁড়াল তারা, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে, তারপর ছুটে গিয়ে আঘাত

করল দরজায়। এক ধাক্কাতেই কাজ হলো, ভেঙে গেল ভেতরের তালা। কামরার ভেতর ঢুকল ওরা।

দরজা ভাঙার শব্দে ঝট করে চোখ মেলল রানা। তীব্র আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ দুটো। চোখ মিটমিট করছে, ওকে লক্ষ্য করে লাফ দিল তিনজন। উপস্থিত বুদ্ধির নির্দেশে বিছানার ওপর শরীরটা গড়িয়ে দিল রানা, ফলে আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা থেকে বেঁচে গেল ও। তবে বিছানার কিনারায় পৌঁছুবার আগে·প্রথম লাথিটা ওর কিডনিতে লাগল, বিছানার কিনারা থেকে ছিটকে আলমিরার গায়ে পড়ল ও, ব্যথায় অন্ধকার দেখল চোখে। লাফ দিয়ে বিছানা টপকে ওর দিকে ছুটে এল ওরা।

ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছে রানা। পিছন দিকে কনুই চালাল ও, অনুভব করল শত্রুদের একজন প্রচণ্ড গুঁতো খেয়েছে তলপেটের নিচে। অসহ্য যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা। দ্বিতীয় লোকটা রানার ঘাড়ের একটা পাশ লক্ষ্য করে লাথি চালাল। কানের ওপর লাগল লাথিটা, মনে হলো বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে ওখানে। তবে, লোকটার একটা পা দু'হাতে ধরে ফেলেছে রানা। পা-টা প্রচণ্ড শক্তিতে মুচড়ে ধরে সামনের দিকে ঠেলে দিল ও, লোকটার গোড়ালির পেশী ছিঁড়ে গেল। বেশ কিছুদিন আর হাঁটতে হবে না বাছাধনকে।

তৃতীয় লোকটা বিছানার ওপর থেকে লাফ দিল। তার পা দুটো ভাঁজ হয়ে রয়েছে পিছন দিকে। হাড়সর্বস্ব হাঁটু নিয়ে রানার পাঁজরে পড়ল সে। ব্যথায় নীল হয়ে গেল রানা, ধারণা করল পাঁজরের অন্তত একটা হাড় ভেঙে গেছে।

.শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ও। কিন্তু লোকটা তার বোঝা রানার ওপর থেকে নামাতে রাজি নয়। হাঁটু জোড়া আরও ওপরে তুলল সে, তুলে আনল রানার চিবুকের নিচে গলায়, রানার মাথাটা আলমিরার সাথে বিকট শব্দে ঠুকে দিল।

শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। গলার ওপর আরও দেবে বসছে হাঁটু দুটো। জ্ঞান হারাবে, বুঝতে পারছে রানা। মরিয়া হয়ে হাত চালাল ও, অনুভব করল কোথাও লেগেছে, কিন্তু ঠিক কোথায় বোঝার সময় পেল না, তার আগেই শিথিল হয়ে গেল পেশী, জ্ঞান হারিয়েছে। জ্ঞান হারাবার আগেই একটা ভয় পেল রানা—মৃত্যু ভয় নয়, পঙ্গু হয়ে যাবার ভয়। জ্যামাইকানদের মারপিট করার ধরনই হলো, একের পর এক লাথি মেরে শত্রুর এমন সর্বনাশ করা। জীবনে যাতে আর সে হেঁটে-চলে বেড়াতে না পারে। মুঠি খুব কমই ব্যবহার করে ওরা, ব্যবহার করে কনুই, হাঁটু আর পা। ওরা চলে যাবার পর দুর্ভাগা লোকটাকে আর সনাক্ত করার উপায় থাকে না।

রানার কপালেও ঠিক তাই ঘটত যদি না সেই মুহূর্তে শব্দ হত দরজায়।

করিডর ধরে আসছিল কাসিম, শব্দ শুনে বুঝতে পারে ভেতরে মারপিট হচ্ছে। মালির ছোট কোদালটা করিডরের এককোণে দেখতে পেয়ে তুলে নিল সে, ছুটে এসে রানার দরজায় আঘাত করল।

জ্যামাইকানদের চেহারা হয়েছে দেখার মত। প্রথমজনের টেসটিকল থেঁতলে গেছে, কোন রকমে দাঁড়াতে পারল সে। দ্বিতীয় লোকটার গোড়ালির পেশী ছিঁড়ে গেছে, এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। তৃতীয় লোকটার গলায় আঘাত করেছে রানা, এখনও কণ্ঠনালী চেপে ধরে খক খক করে কাশছে, হাঁসফাঁস করছে বাতাসের জন্যে।

দরজায় কোদালের আঘাত পড়তেই ছিটকে বারান্দায় বেরিয়ে এল ওরা, ঝুল-বারান্দা থেকে লাফ দিল বারো ফুট নিচের পানি লক্ষ্য করে। ওদের একজন সঙ্গী বোট নিয়ে অপেক্ষা করছিল, বন্ধুদের পানিতে লাফ দিতে দেখে বোটটা নিয়ে কাছে চলে এল সে। কোনমতে আঁচড়ে খামচে বোটে উঠে পড়ল তিনজনই। নাক ঘুরিয়ে খোলা সাগরের দিকে ছুটল বোট।

তিন-চারটে ঝুল-বারান্দা থেকে কয়েকটা মাথা উঁকি দিল। কোদাল দিয়ে দরজা ভাঙার শব্দটা সবাই তারা শুনেছে। এই সময় ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এল কাসিম, চেহারায় শান্ত গাম্ভীর্য, কোন দিকে না তাকিয়ে হাতের কোদালটা ছুঁড়ে দিল পানির দিকে, ছুটন্ত বোট লক্ষ্য করে।

শূন্যে ডিগবাজি খেতে খেতে ছুটল কোদাল।

খ্যাচ করে একটা শব্দ হলো। তৃতীয় জ্যামাইকানের পিঠে গেঁথে গেছে কোদালটা। কোদালের ধারাল প্রান্তটা বুকের হাড় ভেঙে বেরিয়ে এসেছে সামনের দিকে। লোহার পাতটা দু'হাতে ধরে হাঁপাতে লাগল লোকটা, তারপর সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, সেজদা দেয়ার ভঙ্গিতে। পিঠে কোদাল গাঁথার সাথে সাথে শিউরে উঠে চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল ঝুল-বারান্দার কয়েকটা মেয়ে, কিন্তু চিৎকারগুলো হঠাৎ করে থেমে গেল—তাদের বয়ফ্রেন্ড বা স্বামীরা ধমক দিয়ে ভেতরে টেনে নিয়ে গেল বোধহয়। স্থানীয় খুন-খারাবির সাথে নিজেদের জড়াতে রাজি নয় তারা।

আহত লোকটার কথা ভেবে সময় নষ্ট করল না কাসিম। জানে, ইতোমধ্যে মারা গেছে সে, খানিক পরই তাকে তার সঙ্গীরা সাগরে ফেলে দেবে—লাশটা খোরাক হবে হাঙ্গরদের।

এক ছুটে কামরায় ফিরে এল সে, বাথরুম থেকে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে এনে রানার মুখ মুছিয়ে দিল। তারপর বিছানার ওপর তুলল ওকে। কানের ওপর রানার খুলি থেকে রক্ত ঝরছে।

পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে টেবিলের ওপর রেখে দিল কাসিম। করিডরে পায়ের শব্দ হলো, একদল পুলিস করিডরের ভাঙা দরজায় নক করছে। কিন্তু সেদিকে কান দিল না সে। স্থানীয় পুলিসের সাথে সদ্ভাব আছে তার, পরে সব ঘটনা ব্যাখ্যা করলেই হবে।

বিছানার ওপর নড়ে উঠল রানা। ওর মুখটা আরেকবার যত্নের সাথে মুছিয়ে দিল কাসিম। চোখ মেলল রানা। দেখল, ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে কাসিম, কাঁদো কাঁদো চেহারায় রাজ্যের উদ্বেগ। রানাকে চোখ খুলতে দেখে মেঘ সরে গিয়ে যেন রোদ ফুটল তার চেহারায়।

'তিনজন, বস্। লোহার মত শরীর।'

'জানি। ওদের কাউকে তুমি চিনতে পেরেছ?'
'পেরেছি, বস্। মার্টিন কক-এর চেলা ওরা।'
'সব ক'টা পালিয়েছে?'
'একটা বোটে করে। তবে যেন দেখলাম, একজনের পিঠে একটা কোদাল গাঁথা রয়েছে—চোখের ভুলও হতে পারে, বস্।' কাসিমের চোখে দুষ্টু হাসি।
ক্ষীণ হাসল রানা। 'হঠাৎ এসে তুমি বোধহয় ওদেরকে অবাক করে দাও?'
'ইয়েস, বস্। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকি। আপনাকে ওরা ফুটবলের মত ব্যবহার করছিল।'
পাঁজরে ব্যথা অনুভব করল রানা। 'একজন ডাক্তার দরকার, কাসিম।'
'কালো, না সাদা?'
'কিছু আসে যায় না, ভাল হলেই হলো, এমন যে সহজে মুখ খুলবে না।'
'কালো?'
'বেশ, তাই—নিজে কালো বলে আমারও ওদেরকে পছন্দ।'
'আপনি কালো!' মুখ টিপে হাসতে হাসতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল কাসিম।

পুলিসকে কাসিম জানাল, তারা কিছু দেখেনি বা শোনেনি। টাকা-পয়সা হাত বদল হওয়ায় তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করল ওরা। খানিক পর রানাকে হোটেল থেকে বের করে এনে গাড়িতে তুলল সে। এয়ারপোর্টের কাছাকাছি ডাক্তারের বাড়ি, রানার কানের ওপর খুলিতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন তিনি, পরামর্শ দিয়ে বললেন তিন দিন বিছানা ছেড়ে নামা চলবে না। রানাকে দুটো ঘুমের ট্যাবলেটও দিলেন তিনি।
ট্যাবলেট দুটো কাসিমের হাতে গুঁজে দিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল রানা। 'একটা কথা আমাকে বলতে ভুলে গেছ তুমি, কাসিম,' বলল ও, মন্টেগো বে-র দিকে ছুটছে লিংকন কন্টিনেন্টাল। 'হঠাৎ ওই সময়ে তুমি উদয় হলে কোত্থেকে—কেন? তুমি জানতে, তোমাকে আমার সন্ধের আগে দরকার হবে না।'
চটাস করে নিজের কপালে চাঁটি মারল কাসিম। 'ইয়া আল্লা, এত ভুলো মন হলে চলে কি করে! বস্, আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম, মি. স্যাম বুলহ্যাম আর হোয়াইট লেডি কালাহান বীচ ছেড়ে চলে গেছেন—বোট নিয়ে।'
'যত তাড়াতাড়ি পারো জেটিতে নিয়ে চলো আমাকে।'
ইয়ট ক্লাবের পাশে জেটিতে পৌঁছে ওরা জানতে পারল, বিকেলের জোয়ারের সময় যাত্রা করেছে বনবন। যাত্রার আগে বোটের স্টোর ভরা হয়েছে। গন্তব্য জানা যায়নি।
ভেগা কটেজে ফিরে রানা দেখল, ওর জন্যে কাগজের বড় একটা প্যাকেট অপেক্ষা করছে ডেস্কে। প্যাকেটের ভেতর হাউজ অ্যাকাউন্টস-এর

কাগজগুলো পাওয়া গেল। সাথে একটা চিরকুট। স্যাম বুলহ্যাম লিখেছে, 'খুবই লোভনীয় প্রস্তাব। ব্যাপারটা নিয়ে এক সময় আমরা আলোচনা করতে পারি।'

নির্দেশ দিল রানা, অচিন পাখি এই মুহূর্তে টেক-অফ করার জন্যে প্রস্তুত হোক। তারপরই নিউ ইয়র্কে ফোন করল ও। আই বি এ-র শেয়ার আরও পড়ে গেছে। আজ সকালে দাম পাওয়া গেছে দুশো সত্তর দশমিক চার পাঁচ, দু'বছরের মধ্যে এটাই সবচেয়ে কম দর। শুধু তাই নয়, সুলতা রায় চৌধুরী ওকে জানালেন, দর আরও নামছে।

স্যাম বুলহ্যাম বেচে দিয়েছে।

সাত

ইটালিয়ান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের ৭৭৫ নম্বর ফ্লাইট লন্ডনের উদ্দেশে দা ভিঞ্চি এয়ারপোর্ট ছেড়ে যাবে ১৯০০ ঘণ্টায়। সকালেই আই বি এ-র তত্ত্বাবধানে সার্ভিসিং করা হয়েছে প্লেনটা, সেই থেকে সারাদিন হ্যাঙ্গারে দাঁড়িয়ে আছে। ১৬৪৫ ঘণ্টায় অ্যাপ্রনে নিয়ে আসা হলো ওটাকে, প্লেনে চড়ার জন্যে ইস্পাত বাংলা এয়ারক্রাফটের অফিস থেকে বেরিয়ে এল সুবীর নন্দী, প্রি-ফ্লাইট চেক-এর সময় হয়েছে। প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের ভেতর দিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে সে, সাথে একটা ক্লিপবোর্ড আর কলম। হঠাৎ কি মনে করে কয়েক পা পিছিয়ে সিগারেটের দোকানে দাঁড়াল, এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা দিয়াশলাই কিনল। 'স্টাফ ওনলি' লেখা সাইড ডোর দিয়ে টারম্যাকে বেরিয়ে এল সুবীর, এখানে আই বি এ-র অচিন পাখি অপেক্ষা করছে।

যাত্রার জন্যে ফুয়েল ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে অচিন পাখি, সুবীর চেক করে অনুমতি দিলেই ডিপারচার অ্যাপ্রনে চলে যাবে। প্লেনের কাছাকাছি এসে চারদিকে চোখ বুলাল সে, কিন্তু ড্যানি ফেটাসকে কোথাও দেখল না। ড্যানি ইটালিয়ান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের এঞ্জিনিয়ার, চেকিং-এর সময় তার উপস্থিত থাকার কথা। ড্যানিকে দেখতে না পেয়ে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করল সুবীর, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ককপিটে, ধারণা করল প্লেনের ওপর দেখতে পাবে তাকে।

স্কিপারের সীটে বসে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল সুবীর নন্দী। ড্যানির দেখা নেই। ক্লিপবোর্ডটা হাতে নিল সে। লক্ষ করল, নিচে থেকে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে গার্ড। তার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সুবীর, তারমানে এঞ্জিন স্টার্ট দিতে যাচ্ছে সে, এলাকাটা যেন পরিষ্কার থাকে। ক্লিপবোর্ডে কলমটা নেই দেখে মেজাজটা আরও খারাপ হয়ে গেল তার, আসার পথে নিশ্চয়ই কোথাও ফেলে দিয়েছে। সাথে দ্বিতীয় কোন কলম নেই উপলব্ধি করে আরও একটু উত্তপ্ত হলো মেজাজ। 'শালার ড্যানিটা মরল নাকি!' সে থাকলে অন্তত

একটা কলম দিয়েও তো সাহায্য করতে পারত।

প্লেনটা একাই চেক করতে পারে সুবীর, কিন্তু ইস্পাত বাংলা নিয়ম বেঁধে দিয়েছে, চেকিঙের সময় দু'জনকে উপস্থিত থাকতে হবে। নিয়ম আর শৃঙ্খলার প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে তার। ড্যানিকে সে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, ষোলোশো পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টায় চেক করা হবে, এবং তার জানার কথা নিয়মবিরুদ্ধ কোন কাজ করা সুবীর নন্দীর স্বভাব নয়। ককপিটের চারদিকে তাকাল সে, হঠাৎ স্বস্তি বোধ করল ওর ডান হাতে ফাঁকের কাছে একটা বল পয়েন্ট পেন্সিল দেখে। ইটালিয়ান ইন্টারন্যাশনালের পাবলিসিটি পেন্সিল, আরোহীদের উপহার দেয়া হয়। পেন্সিলের কাঠামোর ভেতর খানিকটা তরল পদার্থ রয়েছে, ঝাঁকি দিলে বেরিয়ে আসে, সেই সাথে উন্মোচিত হয় লোগো আর এয়ারলাইনের নাম। রিপোর্ট শীটের মাথায় নিজের নাম লিখল সুবীর, তারিখ আর সময় লিখল, লিখল ফ্লাইট নম্বর, এয়ারলাইনের নাম, অচিন পাখির সাঙ্কেতিক সংখ্যা।

মর ব্যাটা ড্যানি, আমি অপেক্ষা করতে রাজি নই। একা চেক করা কোম্পানীর নিয়ম বিরুদ্ধ হলেও, তার সামনে দ্বিতীয় যে পথটা খোলা আছে সেটা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। চেক করা না হলে অচিন পাখিকে মাটিতে বসিয়ে রাখতে হবে। তা রাখা হলে, জবাবদিহি করতে করতে জান বেরিয়ে যাবে না!

সিদ্ধান্ত নিয়ে কমপিউটরের বোতামে চাপ দিল সুবীর। এঞ্জিন স্টার্ট প্রোগ্রাম সচল হলো। অপেক্ষা করছে সে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রথম এঞ্জিনটা চালু হলো, সেই সাথে শুরু হলো টেস্ট পর্ব।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। এখনও আসেনি ড্যানি। চেক লিস্টের শেষ পাতায় শেষ টিক চিহ্নটি দিল সুবীর। প্লেন থেকে নেমে এল সে, মাথা ঝাঁকাল অপেক্ষারত গার্ডের দিকে তাকিয়ে, তালা দিল ব্ল্যাক বক্সে, তারপর এঞ্জিনিয়ার্স কোয়ার্টারের দিকে হাঁটা ধরল ড্যানি ফেটাসের খোঁজে।

কিন্তু ড্যানিকে কোথাও পাওয়া গেল না।

আই বি এ-এর চীফ এঞ্জিনিয়ারকে রিপোর্ট দেয়ার জন্যে তার অফিসে এল সুবীর নন্দী, 'ফিট ফর সার্ভিস' সার্টিফিকেট সহ রিপোর্টটা হস্তান্তর করল। আই বি এ-এর অফিসে ফেরার সময় টার্মিনালে খোঁজ করল ড্যানির। কফি বার-এর পাশে দাঁড়ানো এক লোককে চেনা চেনা লাগল তার, কিন্তু ঠিক কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না। অফিসে ফিরে এসে দৈনিক বিবরণ লিখল সে, সময়মত ড্যানির উপস্থিত হতে না পারার ব্যাপারটা উল্লেখ করল। বিবরণ লেখা শেষ করে আজকের মত অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

নিজের গাড়ির দিকে হাঁটার সময় লোকটাকে আবার দেখল সুবীর, খানিক আগে যাকে টার্মিনালের ভেতর দেখেছে, কিন্তু এবারও ঠিক চিনতে পারল না। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রোমের পথে রওনা হলো সে। দরদর করে ঘামছে। বাড়ি ফিরেই গোসল করতে হবে, ভাবছে ও।

পার্ক করা ফিয়াট থেকে ড্যানি ফেটাস দেখল, গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্ট ত্যাগ করল সুবীর নন্দী। ভাল, ভাল। ডিউটির পরও যদি এয়ারপোর্টে থাকত সুবীর, রোমের একটা নম্বরে ফোন করতে হত ড্যানিকে—সেই রকম নির্দেশই দেয়া হয়েছে তাকে। তবে সুবীর অন্যান্য দিনের মত স্বাভাবিকভাবে এয়ারপোর্ট ছেড়ে গেল, এবার ড্যানি রোমে গিয়ে তার পাওনা টাকাটা চাইতে পারে ওদের কাছে।

স্রেফ পাগলামি, তাই না? কিন্তু কোন্ বোকা তর্ক করতে যায়?

অথচ গোপনীয়তার কি বহর! জেসাস, শালারা নির্ঘাত হেরোইন খায়।

ওদের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে ড্যানি। হোটেল শেরাটনে একটা কামরা ভাড়া করেছে সে, নিজের পরিচয় দিয়েছে হোসে বুভাল, রিয়ো ডি জেনারিয়োর বাসিন্দা। বাচনভঙ্গি খানিকটা বিকৃত করতে হয়েছে, তবে ডেস্কের লোকটা কোন মন্তব্য করেনি। হোটেল শেরাটনের কামরা, শালার আরাম কাকে বলে! জীবনে এত সুন্দর কামরায় থাকেনি সে। নিজেকে ধনী আমেরিকানদের একজন বলে মনে হচ্ছে। কামরাটা ভাড়া করেছে সে টেলিফোনে, টাকাটা নগদ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে হোটেলে। বার-এ বসে মদ খাওয়ার জন্যে তার হাতে বেশ কিছু টাকাও দেয়া হয়েছে।

শেরাটনে পৌঁছে, নিজের কামরায় উঠে এল ড্যানি। বিছানায় শুয়ে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল বেড সাইড টেলিফোনের দিকে।

'মি. হোপল্যান্ডের স্যুইটে লাইন দিন,' অপারেটরকে বলল সে। সাথে সাথে অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল। 'মি. হোপল্যান্ড? আমি মি. হোসে বুভাল।'

সরাসরি ড্যানির কামরায় চলে এল হোপল্যান্ড। অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি, নিজেই হাতে করে ড্যানির জন্যে কফি নিয়ে এসেছে। 'সব ঠিকমত ঘটেছে তো?'

'কোথাও কোন খুঁত নেই, আপনার কথামত সব করা হয়েছে। বলছেন বটে জন্মদিনের কৌতুক, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না যেন, কৌতুক করার জন্যে এত টাকা কেউ খরচ করে বলে বাপের কালেও শুনিনি।' ড্যানি হাসছে।

'খরচের কথা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না,' হোপল্যান্ড বলল। 'তাড়াতাড়ি কফিটা শেষ করুন, তারপর টাকা নিয়ে চলে যান।'

আই বি এ-র লন্ডন ফ্লাইটের কোন সীট খালি নেই, অর্ধেক সীট দখল করেছে তৃতীয় বিশ্বের একদল শিশু-কিশোর। জাতিসংঘের চাইল্ডকেয়ার অর্গানাইজেশন-এর উদ্যোগে রোমে জড়ো হয়েছিল খুদে প্রতিভাদের এই দলটা, লন্ডন হয়ে নিউ ইয়র্কে যাবে তারা, ওখানে তাদের মেধার একটা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে শিল্পী, লেখক, গায়ক, বিজ্ঞানী, খেলোয়াড় সব ধরনের প্রতিভাই আছে। বাংলাদেশের কয়েকটা

ছেলেমেয়েও রয়েছে দলে। ইমিগ্রেশন আর কাস্টমস শেডের পাশ ঘেঁষে মার্চ করে এগোল তারা, টারমাকে বেরিয়ে এল, সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ল প্লেনে। প্লেনের দরজা সীল করে দেয়া হলো। টাওয়ারের কাছ থেকে ক্লীয়ার্যান্স চাওয়ার সাথে সাথে পেয়ে গেল পাইলট। টেক-অফ করার জন্যে রানওয়ের শেষ মাথায় চলে এল প্লেনটা। অচিন পাখির পাইলট হিসেবে এটা আলবার্টো ল্যামবার্ট-এর তৃতীয় ফ্লাইট, কিন্তু নার্ভাস বোধ করার প্রকৃতি নয় তার। এয়ারলাইন, প্লেন আর নিজের ওপর আস্থা আছে তার—জানে, ককপিটে ক্রুরা সবাই অভিজ্ঞ। গত রাতে লন্ডনে সোফিয়া সাইমন-এর সাথে রাত কাটিয়েছে সে, এবং মেয়েটার শরীর রাজকীয় গুপ্তধনের সমতুল্য, পুরুষরা যা শুধু স্বপ্নের মধ্যে কল্পনা করে। ল্যামবার্টের হাতে পড়ে টেক-অফের জন্যে নিখুঁতভাবে সাড়া দিল অচিন পাখি, তার এই হাত জোড়া একটা প্লেন বা একটা মেয়েকে স্বর্গরাজ্যে তোলার জন্যে সমানভাবে দক্ষ। খুব কম সময়ের ভেতরই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপরে উঠে এল প্লেন, ইটালির উপকূল তখনও খালি চোখে দেখা যাচ্ছে। পিসা বীকন থেকে সঙ্কেত পেয়ে রেডিও অপারেটর জানিয়ে দিল পাইলটকে, নিস বীকন নাক বরাবর সামনে কোথাও হবে, দু'এক মিনিটের মধ্যে ওখান থেকে পাঠানো সঙ্কেত ধরা পড়বে। লন্ডন যাত্রার জন্যে প্রোগ্রাম সেট করা হয়েছে কমপিউটরে, এগোবার সাথে সাথে নিজে থেকেই প্রতিটি ল্যান্ডমার্ক সনাক্ত করবে, বীকন পেতে ব্যর্থ হলে প্রিন্ট আউটের মাধ্যমে সতর্ক করে দেবে পাইলটকে।

তিনটে ঘটনা ঘটল, কিন্তু মাত্র দুটো সম্পর্কে জানতে পারল পাইলট ল্যামবার্ট। টেক-অফ করার সাথে সাথে চাইল্ডকেয়ার ট্যুর-এর পরিচালক গুঙিয়ে উঠে তার সীটে নেতিয়ে পড়লেন। সোফিয়া সাইমুন ছুটে এসে ঝুঁকে পড়ল তাঁর ওপর। পরিচালকের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে, যন্ত্রণায় ছটফট করছেন তিনি। বুঝতে অসুবিধে হলো না, মেডিকেল ইমার্জেন্সি। প্লেনের পিছনে শান্তভাবে হেঁটে এল সোফিয়া, নিজের স্টেশন থেকে ছোট্ট একটা ঘোষণা দিল, 'আরোহীদের মধ্যে কেউ যদি ডাক্তার থাকেন, দয়া করে কল বাটনে চাপ দেবেন?'

ট্যুর পরিচালকের কাছাকাছি একটা সীটের আলো জ্বলে উঠল। ডাক্তারকে নিয়ে অসুস্থ মানুষটার কাছে ফিরে এল সোফিয়া। ব্যস্ততার সাথে রোগীকে পরীক্ষা করলেন ডাক্তার, অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলেন অসুখটা কি।

সোফিয়ার কানে কানে ফিসফিস করলেন তিনি, 'অ্যাপেনডিক্স। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভদ্রলোককে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।'

রোগীর কাছে ডাক্তারকে রেখে আবার নিজের স্টেশনে ফিরে এল সোফিয়া, ইন্টারকম ফোনের রিসিভার তুলে পাইলটকে সব কথা জানাল।

এটা হলো প্রথম ঘটনা।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা প্রিন্ট আউট দিতে শুরু করল কমপিউটর। লেখাটা পড়ল অপারেটর, বোতাম টিপে টেলিভিশন স্ক্রীনে লেখাটা প্রদর্শনের

ব্যবস্থা করল সে, কো-পাইলট ওটা পড়বে। মেসেজে বলা হয়েছে, 'লন্ডন এয়ারপোর্টে কুয়াশা। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে সাবধান করা হয়েছে। আধঘন্টার মত স্থায়ী হবে বিপজ্জনক পরিস্থিতি। বিকল্প গন্তব্য হতে পারে শ্যানন, প্যারিস, গ্লাসগো অথবা আমস্টারডাম।'

ইন্টারকমের মাধ্যমে যোগাযোগ করে পাইলটকে মেসেজটা দিল কো-পাইলট।

পাইলটের জানামতে, এটা হলো দ্বিতীয় ঘটনা। কো-পাইলট আর সোফিয়ার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে, ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিয়ে কথা বলল রেডিও অপারেটরের সাথে। 'নিসে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিঙের জন্যে ক্লীয়ার‍্যান্স চেয়ে দাও আমাকে।'

নিস এয়ারপোর্টের টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ করছে রেডিও অপারেটর, ওদিকে ল্যান্ডিং ইন্সট্রাকশন স্ক্রীন-এর সুইচ অন করল কো-পাইলট। নিস এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে হবে ওদেরকে। এরপর কমপিউটরের 'ল্যান্ড' সুইচে চাপ দিল সে, সেই সাথে উচ্চতা কমিয়ে এনে মাটিতে নামার যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ করার কাজ শুরু করে দিল কমপিউটর। রেডিও অপারেটর 'ওকে টু ল্যান্ড' বোতামে চাপ দিল, ইঙ্গিতে সেটা পাইলটকে দেখিয়ে দিল কো-পাইলট।

এবার পাইলট নিজে নিস এয়ারপোর্ট টাওয়ারের সাথে কথা বলল। একটা অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে অনুরোধ করল সে, জানাল তাদের হাতে অ্যাপেনডিক্স-এর ইমার্জেন্সি কেস রয়েছে, সিরিয়াস অবস্থা। আরোহীদের সবরকম নিরাপত্তার দায়িত্ব পাইলটের, ল্যামবার্ট সে-ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন। অবশ্য অচিন পাখির সফিস্টিকেটেড ইন্টারকমিউনিকেশন সিস্টেম থাকায় দায়িত্ব পালন করা তার পক্ষে সহজ হয়ে গেল। অচিন পাখির কমপিউটর ব্রেন মানুষের কোন সাহায্য ছাড়াও যে-কোন গন্তব্যে আরোহীদের পৌঁছে দিতে পারে, যদি দরকার হয়; শুধু প্রয়োজনীয় কয়েকটা বোতামে চাপ দিলেই হবে। সিস্টেমটা এতই আধুনিক যে মাটি থেকেও বোতামে চাপ দেয়ার কাজটা সারা যেতে পারে। লন্ডন এয়ারপোর্টে কুয়াশা থাকায় পাইলট উদ্বিগ্ন হয়নি, কারণ জিরোভিজিবিলিটি-তেও ল্যান্ড করতে পারে অচিন পাখি।

নিসে পৌঁছুল প্লেন। পাইলট নিজে কন্ট্রোলের দায়িত্ব নিল। কোন ঝাঁকি না খেয়ে রানওয়ে স্পর্শ করল চাকা। কমপিউটর ল্যান্ডিং যতই ভাল হোক, অভিজ্ঞ একজন পাইলটের হাতের ছোঁয়া অন্য জিনিস—প্লেনের মেজাজ আর গতি অনুভব করার জন্যে রক্ত-মাংসের একজোড়া হাতের কোন জুড়ি নেই, পাখির পালকের মত মৃদু পরশের সাথে রানওয়ে স্পর্শ করল অচিন পাখি। টাওয়ারের নির্দেশ অনুসারে নির্দিষ্ট জায়গায় থামল ওটা।

রোগীকে দেখে ডাক্তার মতামত জানালেন, তারপর রোগীকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো, মাঝখানে সময় বয়ে গেছে মাত্র পাঁচ মিনিট। তীব্র আওয়াজের সাথে সাইরেন বাজিয়ে কাছাকাছি একটা হাসপাতালের দিকে ছুটছে অ্যাম্বুলেন্স। পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে আবার বন্ধ হয়ে গেল অচিন পাখির

দরজা। টাওয়ারের কাছ থেকে টেক-অফ করার অনুমতি চাইল ল্যামবার্ট। রানওয়ের শেষ মাথায় চলে এল প্লেন, ওখান থেকে ছুট দেবে। ইতোমধ্যে আরও সতেরো মিনিট পেরিয়ে গেল।

'নিজেদের প্রশংসা করছি না,' সহাস্যে বলল কো-পাইলট, 'তবে, খুব একটা সময় নিইনি, কি বলেন? লন্ডনে আমরা যথাসময়েই পৌঁছুব।'

উত্তরে মৃদু হাসল পাইলট। রেডিও হেডসেটের এয়ার-পীসটা অ্যাডজাস্ট করল সে, ভাবছে টাওয়ার অনুমতি দিতে এত দেরি করছে কেন? আগের প্লেনটা টেক-অফ করেছে দু'মিনিট আগে। ইতোমধ্যে সময় বয়ে গেছে সতেরো মিনিট পঁচিশ সেকেন্ড।

তারপর, এক এক করে, তিনটে লাল আলো জ্বলে উঠল প্যানেলে।

প্রথম লাল আলো ইঙ্গিত দিচ্ছে, মেইন ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাই সিস্টেম অকেজো হয়ে গেছে, সেই সাথে সচল হয়েছে দ্বিতীয় ইমার্জেন্সি সিস্টেম।

দ্বিতীয় লাল আলোটার অর্থ হলো, ইমার্জেন্সি ইলেকট্রিক সাপ্লাই সিস্টেম অচল হয়ে গেছে, দ্বিতীয় ইমার্জেন্সি সিস্টেম সচল হয়েছে।

কিন্তু তৃতীয় লাল আলো জানিয়ে দিল, সব ক'টা ইলেকট্রিক সিস্টেম—মেইন, রিপ্লেসমেন্ট এবং ইমার্জেন্সি—ব্যর্থ হয়েছে। ছোট ব্যাটারির সাহায্যে প্যানেলের আলোগুলো জ্বলছে শুধু। তারমানে অচিন পাখিতে কোন রকম ইলেকট্রিক পাওয়ার নেই। এঞ্জিনগুলো থেমে গেল।

'গড, ওহ গড!' নিজের বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকল আলবার্তো ল্যামবার্ট। 'ঈশ্বর যেন আমাদেরকে হাতে তুলে বাঁচালেন। ঘটনাটা যদি টেক-অফ করার সময় ঘটত? কিংবা পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপরে থাকার সময়?'

তার কথা শুনতে পেল না কো-পাইলট। রেডিও কাজ করছে না।

পঙ্গু হয়ে গেছে অচিন পাখি।

আট

জ্যামাইকা ত্যাগ করছে রানা, এই সময় নিস থেকে খবর এলো অচিন পাখিকে মাটিতে বসিয়ে রাখা হয়েছে। ফ্লাইট প্ল্যান বদল করতে হলো ওকে, নিস এয়ারপোর্টে নামল মাঝরাতে। এরমধ্যে প্লেনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হ্যাঙ্গারে, শিশু-কিশোরদের দল সহ আরোহীদের অন্য একটা প্লেনে করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে লন্ডনে।

দুর্ভাগ্যজনকই বলতে হবে, এত রকম জরুরী সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও ট্যুর পরিচালক বাঁচেননি। বিস্ফোরিত অ্যাপেনডিক্স নিয়ে হাসপাতালে মারা গেছেন তিনি। প্লেনে জ্ঞান হারাবার পর তা আর ফিরে আসেনি।

রেডিও টেলিফোনের মাধ্যমে নির্দেশ দিল রানা, নিসে ওর উপস্থিতির মুহূর্তে স্টাফ এঞ্জিনিয়ারকে দরকার হবে ওর। 'প্লেনে কোথাও কোন ত্রুটি নেই,' তার এই সার্টিফিকেট পেয়েই রওনা হয়েছিল পাইলট। স্টাফ

এঞ্জিনিয়ারকে একশো একটা প্রশ্ন করার আছে রানার।

নিস এয়ারপোর্ট পৌঁছুল রানা, ইতোমধ্যে ত্রুটিটা খুঁজে বের করা হয়েছে। একটা বাই-মেটাল স্ট্রিপ, ইমার্জেন্সি কাট-আউট আর রেগুলেটর-এর ভূমিকা পালন করে ওটা, উল্টো করে বসানো হয়েছিল। ফলে একটা সার্ভো পাইপ অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে ফেটে গেছে। এঞ্জিনিয়ার হিসাব কষে জানাল, ফাটল গলে সার্ভো ফ্লুইড বেরিয়ে আসতে সময় লাগত বিশ মিনিট, তা ঘটলে ফুয়েল-ফিড রেগুলেটিং সিস্টেমের সার্ভো-অপারেটেড সোলিনয়েড জ্যাম হয়ে যেত, সেই সাথে অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠত ইলেকট্রিক। সাধারণত এই অবস্থায় বাই-মেটালিক স্ট্রিপ আরও খুলে গিয়ে ইমার্জেন্সি কুলিং সিস্টেম সচল করে দেয়, কিন্তু বাই-মেটাল স্ট্রিপ উল্টোভাবে বসানোর দরুন অতিরিক্ত উত্তাপ খোলার পরিবর্তে ওটাকে আরও আঁটো করে দিয়েছিল। ফলাফল, প্রতিটি সিস্টেমে ইলেকট্রিক বার্নআউটের ঘটনা ঘটেছে, জেনারেটরগুলোও রেহাই পায়নি।

ককপিটে উঠে এল রানা। ইয়াসিন বাবুল, নিসে ইস্পাত বাংলা এয়ারক্রাফটের চীফ এঞ্জিনিয়ার, প্যানেল থেকে কভার সরিয়ে ফেলেছে আগেই, ভেতরে বাই-মেটাল স্ট্রিপটা দেখা যাচ্ছে। স্ট্রিপটা সরায়নি সে, রানাকে দেখানোর জন্যে অপেক্ষা করছে। নিঃশব্দে সেটার দিকে তাকাল রানা। রোম থেকে সদ্য আসা সুবীর নন্দী ওর সাথেই উঠে এসেছে প্লেনে। চোখে-মুখে সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে বাই-মেটাল স্ট্রিপটা সে-ও দেখল।

ইমার্জেন্সি ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্লেনে, ইয়াসিন বাবুলকে ছাড়িয়ে লম্বা হলো রানার একটা হাত, একটা সুইচ অন করল। সুইচের ওপর একটা ডায়াল আলোকিত হয়ে উঠল। ওভারলোড মার্ক করা একটা জায়গায় উঠে এল ডায়ালের কাঁটা। তারপরই আলোটা বারবার জ্বলতে নিভতে শুরু করল। রোম থেকে প্রি-ফ্লাইট চেক রিপোর্টের কপিটা সাথে করে নিয়ে এসেছে সুবীর। ছ'নম্বর পাতাটা খুলল সে। রানা যে সুইচটা টিপেছে, চেক করার সময় সে-ও ওই সুইচটা টিপেছিল, রিপোর্ট লেখার জন্যে। তার চেক রিপোর্টে পরিষ্কার টিক চিহ্ন দেয়া রয়েছে। সুইচটা টেস্ট করতে ভুল হয়নি তার।

'এর কোন ব্যাখ্যা আমার জানা নেই,' বলল সুবীর, তার গলা কাঁপছে। 'নিশ্চয়ই আমি চেক করার পর বাই-মেটাল স্ট্রিপ বদলানো হয়েছে।'

রানা আর ইয়াসিন বাবুলের দিকে তাকাল সে। তিনজনই ওরা জানে, সে যা বলছে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়। ওই প্যানেল ভাঙা, বাই-মেটাল বের করা, তারপর উল্টো করে বসানো, কম করেও আড়াই ঘণ্টা সময়ের ব্যাপার।

'চেক শেষ করেছ ক'টায়?' প্রশ্ন করল রানা।

রিপোর্টে সময়টা লেখা রয়েছে, সবাই তা দেখতে পেল। পাইলটের লগের দিকে আঙুল তুলল রানা, কমপিউটার প্রিন্ট আউট দিয়েছে। ১৮৫৯ ঘণ্টায় আকাশে উঠে আসে অচিন পাখি, চেক শেষ হবার দু'ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে। 'প্যানেল খুলে বাই-মেটাল বদলাতে পারবে তুমি, এই সময়ের

ভেতর? দু'ঘন্টার মধ্যে?' সুবীরকে জিজ্ঞেস করল রানা, যদিও উত্তরটা সবার জানা।

মেকানিকদের হাতে প্লেন ছেড়ে দিয়ে নেমে এল ওরা, সার্ভো সিস্টেম আর বাই-মেটাল প্যানেল মেরামত করবে তারা, প্লেনের প্রতিটি কলকব্জা গভীর মনোযোগ আর আন্তরিক যত্নের সাথে চেক করবে, তার আগে সার্ভিসে ফেরত পাঠাবে না। সুবীরকে নিয়ে আই বি এ-র অফিসে চলে এল রানা, সুবীর অনুভব করল তাকে যেন গিলোটিনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইয়াসিন বাবুল তার অফিসটা ছেড়ে দিল ওদেরকে। ডেস্কের পাশের একটা চেয়ারে বসল রানা, অপর চেয়ারটার কিনারায় জড়সড় হয়ে থাকল সুবীর।

'কি ঘটেছিল?' প্রশ্ন করল রানা।

মাথা নাড়ল সুবীর। 'আমি জানি না, মাসুদ ভাই। কি ঘটেছে আমার কোন ধারণা নেই···।'

'ঠিক আছে, একেবারে প্রথম থেকে স্মরণ করো সব। ফ্লাইট চেক শুরু করার আগে কারও সাথে কিছু খেয়েছিলে তুমি?'

'না। ভগবানের দিব্যি। জহির আব্বাসের ওই ঘটনার পর আমি কিছু মুখে দেব, মাসুদ ভাই? আপনার মেমোটা পাবার পর কেউ আমরা বাইরে কিছু খাই না। বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছি, ব্যাগে করে লাঞ্চ নিয়ে এসেছি—নিজের হাতে তৈরি করা। ব্যাগটা সব সময় আমার চোখের সামনে ছিল।'

'ঠিক আছে, সুবীর। আমাকে ভুল বুঝো না। কেউ তোমাকে সন্দেহ করছে না। এবার বলো, ড্যানি ফেটাসের ব্যাপারটা কি?'

'সত্যি বলছি মাসুদ ভাই, তার ব্যাপারেও আমি কিছু জানি না। একটু হয়তো অলস, কিন্তু লোক খারাপ নয়। আগে কখনও এভাবে অনুপস্থিত থাকেনি ও, বিশেষ করে প্রি-ফ্লাইট চেক-এর সময়। রোমের সবখানে টেলিফোন করা হয়েছে, কিন্তু তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

'সারা দিন একবারও কি তার সাথে দেখা হয়নি তোমার?'

'হয়েছে। দু'জন মিলে ইন্ডিয়ান এয়ারওয়েজের ফ্লাইটটা চেক করলাম আমরা। এই ব্যাপারটা জানার পর প্রথমেই আমি ওই ফ্লাইট সম্পর্কে খবর নিই, দিল্লীতে ঠিকভাবেই ল্যান্ড করেছে ওটা।'

'ঠিক আছে। এবার চেক সম্পর্কে। অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করেছিলে, চেক করার সময়? যেমন, স্টারবোর্ড লিঙ্ক কানেকটরে অয়েল প্রেশার বা···।'

'চার নম্বর পাতা, মাসুদ ভাই—হ্যাঁ, ওটায় আমি টিক চিহ্ন দিয়েছি।'

'দিয়েছ জানি, সুবীর, কিন্তু দেয়ার আগে নিশ্চয়ই তুমি সংখ্যাটা পড়েছ—কি ছিল সেটা?'

মাথা চুলকাল সুবীর, ক্লিপবোর্ডের সাথে আটকানো পেন্সিলটা তুলে শেষ মাথাটা চিবাতে শুরু করল। 'সংখ্যাটা ছিল···মানে, ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে নিশ্চয়ই স্বাভাবিকই ছিল রীডিংটা, তা না হলে আমি টিক চিহ্ন দিতাম না···।'

'বাই-মেটাল ঠিক ছিল না অথচ তুমি টিক চিহ্ন দিয়েছ।'

চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল সুবীরের। 'মাসুদ ভাই, পাঁচ বছর ধরে ইস্পাত বাংলা এয়ারক্রাফটে কাজ করছি আমি। আই বি এ-কে আমি নিজের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করি...'

'তোমার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কেউ কোন প্রশ্ন তুলছে না, সুবীর, কিন্তু একটা কথা সবাই এখন জানে যে ট্যুর ডিরেক্টর ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে না পড়লে ওই প্লেনের প্রতিটি আরোহী মারা যেত। ইস্পাত বাংলা যে শুধু একটা অচিন পাখি হারাত তাই নয়, পঞ্চাশটা মাসুম বাচ্চার অকাল মৃত্যুর জন্যে দায়ী হতাম আমরা, সেই সাথে অচিন পাখির যে দুর্নাম হত তাতে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া... ।'

'তাহলে উত্তরটা কি, মাসুদ ভাই? আমি জানি, ওই পাতায় টিক চিহ্ন দিয়েছি, আরও জানি ওয়ার্নিং লাইট জ্বললে টিক চিহ্নটা আমি দিতাম না... ।'

'ওয়ার্নিং লাইট জ্বললে টিক চিহ্ন দিতে না—কিন্তু ওয়ার্নিং লাইট জ্বলতে দেখার মত অবস্থায় তুমি ছিলে কিনা সেটাই হলো প্রশ্ন। ঠিক আছে, সুবীর, এসো আবার প্রথম থেকে শুরু করি। বিছানা ছাড়ার পর সারাদিন যা যা করেছ সব আমাকে বলো তুমি।'

চার ঘণ্টা ধরে ইন্টারোগেশন চলল। কোন কোন কথা বারবার জিজ্ঞেস করল রানা। প্রশ্নের কোন বিরাম নেই, প্রতিটির উত্তর পেতে হবে ওকে। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল সুবীর। এক সময় অপরাধবোধে আক্রান্ত হলো সে, সন্দেহ হতে লাগল বোধহয় সে-ই কোথাও ভুল করেছে বা কাজে কোথাও গাফিলতি হয়েছে। তার দোষে প্রায় একশো আরোহী মারা যেতে বসেছিল, ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল সে।

দু'ঘণ্টার মধ্যেই একটা প্যাটার্ন লক্ষ করল রানা, উপলব্ধি করল প্রফেসর গিলবার্ট যে ড্রাগটার কথা বলেছেন সেটা সুবীরের বেলায়ও প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রি-ফ্লাইট চেক-এর সময় তার স্মৃতিতে একটা গভীর গর্ত তৈরি হয়, সাময়িক স্মৃতিভ্রংশ ঘটে তার। এর খানিক পরই দরদর করে ঘামতে শুরু করে সে। কিন্তু ড্রাগটা প্রয়োগ করা হলো কিভাবে? কার দ্বারাই বা?

জুরিখের ইমার্জেন্সি সুইচবোর্ড অপারেটার নিসে খুঁজে পেল রানাকে, হংকঙের ইয়াকোমা টোমার সাথে ওর যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল সে। 'আমার শেয়ারের জন্যে কোন দর পেয়েছ তুমি, টোমা?' জানতে চাইল রানা, দীর্ঘ কুশল জিজ্ঞাসায় বাধা দিয়ে।

'অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য রয়েছে আমার কাছে, মি. রানা। অমূল্যও বলতে পারেন।'

'এক হাজার ডলার দেব বলেছি, তার বেশি এক পয়সাও নয়। এবার বলো, কোন দর পেয়েছ?'

'ঠিক আছে, মি. রানা। এক হাজার ডলারই সই। নগদ, আপনার সুবিধেমত সময়ে। না, আপনার শেয়ারের জন্যে কোন দর আমি পাইনি, ওগুলো এক সাথে বিক্রি করা সম্ভব নয়। তবে আমার হাতে একটা তথ্য

এসেছে।'

'আমি শুনছি।'

'আমার বন্ধুদের জানানো হয়েছে,' বলল টোমা, 'এই মুহূর্তে আই বি এ-র শেয়ার কেনাটা নেহাতই বোকামি হবে, কারণ অচিরেই রাস্তায় পড়ে থাকা ছেঁড়া কাগজ আর আই বি এ-র শেয়ারের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।'

'কেন, টোমা? শেয়ারের দর পড়ে যাবে কেন?'

'কারণ অচিন পাখি, যার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনাদের সৌভাগ্য, মোটেও ভাল কোন প্লেন নয়। আমার তথ্যের উৎস অন্তত সেই কথাই বলছে। ছেঁড়া ঘুড়ির মত অচিন পাখিরা নাকি এক এক করে খসে পড়তে শুরু করবে আকাশ থেকে। তারই সাথে মন্দ কপালের অধিকারী হবে যারা আপনার কোম্পানীর শেয়ার কিনবে…।' অপরপ্রান্তে সকৌতুকে হাসছে টোমা। নির্মাণ, সোনারূপা আর হীরার ব্যবসায় টাকা খাটায় সে, বিমান তৈরির শিল্পে তার কোন স্বার্থ নেই।

শান্ত, প্রায় শীতল কণ্ঠে বলল রানা, 'তথ্যের উৎসটা আমাকে জানাও।'

'অনেক লোকই অচিন পাখিকে পছন্দ করে না, মি. রানা। সন্দেহ নেই, তারাও বিশ্বাস করে অচিন পাখি বর্তমান দুনিয়ার সেরা প্যাসেঞ্জার প্লেন। কিন্তু মুশকিল হলো, কিছু লোক অন্যান্য বিমান তৈরি কোম্পানীতে টাকা খাটিয়েছে। আই বি এ তাদের ব্যবসা করতে দিচ্ছে না। সেজন্যে তারা অচিন পাখির ক্ষতি করার জন্যে একটা প্ল্যান তৈরি করেছে।'

'কি প্ল্যান? কোথায় বসে প্ল্যানটা করা হয়?'

'লোকগুলোর একজন নেতা আছে, তার উদ্যোগেই মীটিংটা ডাকা হয়। গোপন মীটিং। মীটিঙে গোপন একটা ডকুমেন্টও দেখানো হয়। সেটা দেখার পর সবাই তারা একবাক্যে রায় দেয়, আপনাদের অচিন পাখি ত্রুটিহীন প্লেন নয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, মীটিঙের কথা গোপন রাখা হবে, যতদিন না তারা আই বি এ-র শেয়ার বাজারে বিক্রি করতে পারে। আপনাদের শেয়ারের পড়তি অবস্থার দিকে তাকান, তাহলেই বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা। তারা নিজেদের শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছে…।'

'কোথায়, টোমা? মীটিংটা কোথায় বসেছিল?'

'ক্যারিবিয়ানের একটা দ্বীপে, মি. রানা। জায়গাটার নাম কালাহান বীচ। মীটিংটা যে ডেকেছিল তার নাম…।'

'স্যাম বুলহ্যাম।'

নয়

শাহনাজ মুন্নী রানা এজেন্সির একজন অপারেটর, বর্তমানে ইস্পাত বাংলায় রানার জুরিখ সেক্রেটারি হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব পালন করছে। ইস্পাত বাংলায় জয়েন করার পর বেশ কিছুদিন রানার সাথে চরকির মত ঘুরে

বেড়িয়েছে মেয়েটা, কিন্তু শুধু একটা সুটকেসের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা কোন মেয়ের পক্ষে সহজ নয়, রানা যেমন সহজেই পারে, তাই রানার জন্যে একাধিক সেক্রেটারির ব্যবস্থা করে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে সে। রানা এজেন্সি বা আই বি এ-র জরুরী প্রয়োজনে কেউ যদি রানার সাথে যোগাযোগ করতে চায়, একমাত্র রানার জুরিখ সেক্রেটারি শাহনাজের মাধ্যমেই তা সম্ভব। নির্দিষ্ট একটা কোড আছে, ফোনের ডায়াল ঘোরাবার সময় সেটা ব্যবহার করলেই শাহনাজের সাথে কথা বলা যাবে। লাইনটা শুধু ইমার্জেন্সির সময় ব্যবহারযোগ্য।

সেদিন সকালে, সুবীর নন্দীকে ইন্টারোগেট করে গ্র্যান্ড হোটেলে মাত্র ফিরে এসেছে রানা, এই সময় জুরিখ থেকে ফোন করল শাহনাজ মুন্নী। হোটেলের কামরাটা জুরিখ থেকে সে-ই রানার জন্যে বুক করেছে।

রানার ঘুম জড়ানো কণ্ঠস্বর শুনতে পেল শাহনাজ। নিজের পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না, জিজ্ঞেস করল, 'জুরিখে ফিরেছ কখন?'

'ঠিক বলতে পারছি না। এখানে আমার আরও কাজ থাকতে পারে।'

'কি কাজ? সুবীর নন্দীকে এখানে ডেকে নিচ্ছি আমি। এঞ্জিনিয়ারের রিপোর্টটা আমার ডেস্কে পড়ে রয়েছে। তোমার হ্যাঁ বলার অপেক্ষায় ওড়ার জন্যে তৈরি হয়ে রয়েছে প্লেনটা। ব্রেকফাস্টের সাথে একটা রিপোর্ট পাবে, আশা করি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। তোমার জন্যে ডিম পোচ, মাখন ছাড়া রুটি, কর্ন ফ্লেকস আর কফি বলেছি। সাড়ে ন'টার সময় হোটেলের সামনে গাড়ি পাবে তুমি, তোমার প্লেন টেক-অফ করবে সাড়ে দশটায়...।'

'আমি চাই টেক-অফ করার আগে কোম্পানীর তরফ থেকে ওটা চেক করা হোক...।'

'এই মুহূর্তে সেই কাজটিই করছে ওরা। জুরিখে তোমার জন্যে আমি হোটেল মার্ভেল-এ স্যুইট রিজার্ভ করেছি...।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'এসবের পেছনে কিছু একটা আছে, শাহনাজ। তোমার সুপার-এফিশিয়েন্সি সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমার একটা ধারণা হয়েছে, কাজেই আশ্চর্য হচ্ছি না, তবু মনে হচ্ছে কি যেন এক কারণে আমাকে তোমার জুরিখে খুব জরুরী দরকার। কারণটা বলছ না কেন?'

'ধরেছ ঠিকই,' হেসে উঠল শাহনাজ, জলতরঙ্গের এই মিষ্টি ধ্বনি ভারি পছন্দ করে রানা। 'তুমি আবার নিউ ইয়র্ক বা লন্ডনে পালিয়ে যাবার আগে আমি তোমাকে জুরিখে পেতে চাই, রানা।'

'কেন, শাহনাজ? নাকি টেলিফোনে বলা যায় না?'

'তুমি একটা নিংকমপুপ,' কৃত্রিম বিরক্তির সাথে বলল শাহনাজ। 'আজকের দিনটার কথা কি করে ভুলে যেতে পারলে?'

'বোর্ড মীটিং? কিন্তু আমি তো জানি সেটা কাল।'

'বোর্ড মীটিং নয়, সাহেব...।'

'এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট সই করার দিন?'

'জ্বী-না, মশাই, তা-ও নয়…।'

'ঠিক আছে, শাহনাজ, হার মানলাম আমি। এবার বলো…।'

'আজ আমাদের ডেট আছে, রানা,' মৃদুকণ্ঠে বলল শাহনাজ, 'তবে বুঝতে পারছি তুমি ভুলে গেছ। আজ তোমার জন্মদিন। মেনি হ্যাপি রিটার্নস।'

নক করে ভেতরে ঢুকল ওয়েটার, ব্রেকফাস্ট ট্রে-তে ফুল দেখল রানা।

রানা জুরিখে আসার পর সিদ্ধান্ত হলো, একদিন অপেক্ষা না করে আজই বোর্ড মীটিং ডাকা উচিত। সালেহ চৌধুরীর অফিসে গোল হয়ে বসলেন চারজন উদ্বিগ্ন ডিরেক্টর, তাঁদের চেহারা আরও থমথমে হয়ে উঠল স্টক মার্কেটের সর্বশেষ কোটেশন শামসুল হকের মুখ থেকে শোনার পর।

'আমরা কি এখনও কিনছি?' জানতে চাইলেন সালেহ চৌধুরী। মাথা ঝাঁকালেন শামসুল হক। বিক্রির জন্যে বাজারে শেয়ার ছাড়ামাত্র কিনে ফেলা হচ্ছে, চাওয়া দামেই, দর যাতে আতঙ্ককর স্তরে নেমে না যায়। কিন্তু এভাবে অনির্দিষ্টকাল চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ এরইমধ্যে প্রত্যেকে ওঁরা এত বেশি ব্যাংক লোন নিয়ে ফেলেছেন, সব দেনা এক করলে তৃতীয় বিশ্বের কোন কোন দেশের জাতীয় ঋণকে প্রায় ছুঁয়ে দেবে।

'এবং ইনস্টিটিউশনগুলো এখনও বিক্রি করছে?'

আবার মাথা ঝাঁকালেন শামসুল হক। 'ব্যাপারটা এখন মি. রানা আর দারা শিকদারের ওপর নির্ভর করছে,' সংক্ষেপে বললেন তিনি।

এরপর রানা কথা বলল। কি জানতে পেরেছে, কি বুঝেছে, কি আন্দাজ করেছে, অল্প কথায় রিপোর্ট করল ও। বরাবরের মত কারও নাম উল্লেখ করল না। রানার তৎপরতা সম্পর্কে বিশদ কোন বিবরণ কখনোই জানতে চান না সালেহ চৌধুরী। 'অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত কিছু লোক আমাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা গুজব ছড়াচ্ছে, অচিন পাখি একটা বাজে প্লেন, ডিজাইনে ত্রুটি থাকায় যে-কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটাবে। মন্টেগো বে-তে গোপন একটা মীটিং করেছে তারা, বড় বড় ইন্ডাস্ট্রির সেরা উপদেষ্টাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মীটিঙে প্রমাণ দেখিয়ে বলা হয়, মেইন্টেন্যান্স-এ প্রতারণা করছি আমরা।'

'ও, তাহলে এই ব্যাপার—এতক্ষণে পরিষ্কার হলো!' সালেহ চৌধুরী বললেন। 'স্যার রিচমন্ড-এর সাথে সেদিন দেখা হলো ক্লাবে। ভদ্রলোককে আমি তেমন পছন্দ করি না। সম্পর্ক কুশল বিনিময়ে সীমিত। আমরা সবাই জানি, স্যার রিচমন্ড পজিটিভ ইন্সুরেন্স-এর সাথে আছেন। ভদ্রলোক আমাকে রীতিমত অবজ্ঞা করলেন। ক্লাবে, লোকজনের সামনে। কারণটা এখন আমি বুঝতে পারছি আই বি এ-র শেয়ার কেনার পরামর্শ দেয়ায় তিনি ধরে নিয়েছেন আমরা তাঁর সর্বনাশ করার চেষ্টা করছি।'

'জন ইস্টম্যানকে কেন জ্যামাইকায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি?' জিজ্ঞেস করলেন শামসুল হক, চেহারায় বিস্ময়।

'কারণ তারা জানে, ইস্টম্যানকে মাঝে-মধ্যে ব্যবহার করি আমরা। শুধু

তাদেরকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যারা কোনভাবেই আমাদের সাথে জড়িত নয়। সেজন্যেই মীটিঙের কথাটা গোপন রাখতে পেরেছে ওরা। আর সেজন্যেই একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে গুজব সম্পর্কে কিছুই আমরা জানতে পারিনি।'

'এর মধ্যে যদি আর কিছু না থাকে,' শামসুল হক বললেন, 'আমাদের উচিত চুপচাপ বসে থাকা। গুজব এক সময় থেমে যাবে। এ-ধরনের মিথ্যে প্রচারণা শেষ পর্যন্ত কোন ক্ষতি করতে পারে না।'

'এর মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'আমাদের কিছু স্টাফকে অবশ্যই হাত করেছে ওরা। কাদেরকে, তা এখনও আমি জানি না, তবে জানব। এখন পর্যন্ত একজন মানুষকে হারিয়েছি আমরা, যদিও আইনগতভাবে তার মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে ধরা হচ্ছে। নিখোঁজ হয়েছে দু'জন লোক, একজন লন্ডনে, আরেকজন রোমে। দলটা আমাদের একটা অচিন পাখিকে ক্র্যাশ করাবার প্ল্যান করেছিল…।'

'বলেন কি!' সাদা হয়ে গেল সালেহ চৌধুরীর চেহারা। 'আপনার কি ধারণা, ওদের পক্ষে তা সম্ভব?'

'আমার তা মনে হয় না। ওদের পদ্ধতি সম্পর্কে জানি, পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারব আমি।'

'আপনি অ্যাবসলিউটলি পজিটিভ, মি. রানা? তা না হলে আমাদের সব ক'টা অচিন পাখিকে মাটিতে বসিয়ে রাখতে হবে—এই মুহূর্ত থেকে। একদল উন্মাদ আমাদের প্লেন ক্র্যাশ করাতে চাইছে, এ-অবস্থায় প্লেন চালাবার কোন ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। তাছাড়া, পুলিসকেও এই মুহূর্তে সতর্ক করা দরকার।'

দারা শিকদার বললেন, 'তাহলে সবাই ধরে নেবে গুজবগুলো মিথ্যে নয়, অচিন পাখি আসলেও বাজে একটা প্লেন।'

'তাতে করে আমাদের শেয়ারের দরও একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকবে,' যোগ করলেন শামসুল হক। 'আমাদের ক্রেডিট রেটিঙের সাথে যেহেতু শেয়ার দরের সম্পর্ক রয়েছে, ক্যাশ ফ্লো-তেও ভাটা পড়বে।'

'শেয়ারের কি হলো না হলো তাতে আমার কিছু আসে যায় না,' বললেন সালেহ চৌধুরী, তাঁর চেহারা লালচে হয়ে উঠতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন সবাই। আগে কখনও কেউ তাঁকে এরকম রেগে উঠতে দেখেননি। 'ক্যাশ ফ্লো সম্পর্কে আমি ভাবছি না, আমার একমাত্র উদ্বেগ নিরীহ আরোহীদের নিয়ে, যারা আমাদের বিমানকে নিরাপদ বলে বিশ্বাস করেছে। সত্যি যদি কোন বিপদ থেকে থাকে…।'

'ওদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারব আমি,' পুনরাবৃত্তি করল রানা।

গম্ভীর মুখে রানার দিকে তাকালেন সালেহ চৌধুরী। আধুনিক ব্যবসা পদ্ধতি অনেক সময়ই নীতি বা বিবেকের ধার ধারে না, আই বি এ-র ডিরেক্টররা অতীতে একাধিক বার এমন অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেগুলোর কথা সালেহ চৌধুরী জানেন না এবং তাঁর না জানাই সব দিক থেকে ভাল।

কিন্তু এখন যখন নিরীহ মানুষের প্রাণ হুমকির সম্মুখীন, তিনি উপলব্ধি করছেন, তাঁর নির্লিপ্ত থাকা সাজে না। 'গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে সব কথা আমাকে বিস্তারিত বলুন, মি. রানা,' অনুরোধ জানালেন তিনি।

এক এক করে সব কথাই বলল রানা। জহির আব্বাসের সন্দেহজনক মৃত্যু দিয়ে শুরু করল ও। প্রফেসর গিলবার্টের আবিষ্কার, জ্যামাইকায় ওর নিজের প্রাণের ওপর হামলা, সুবীর নন্দীর সাময়িক স্মৃতিভ্রংশ, লন্ডনগামী অচিন পাখিতে স্যাবোটাজ, নিসে ল্যান্ড করায় অলৌকিকভাবে আরোহীদের প্রাণ রক্ষা, কিছুই বাদ দিল না।

বাই-মেটাল সম্পর্কে শোনার পর, মাথা নাড়লেন সালেহ চৌধুরী। 'বলছেন প্লেনটার অর্ধেক আরোহী ছিল একদল বাচ্চা?' প্রশ্ন করলেন তিনি। মাথা দোলাল রানা।

টেবিলের চারদিকে তাকালেন সালেহ চৌধুরী। 'আমার ধারণা, রাস্তার শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। এরপর কিভাবে প্লেন চালানো সম্ভব আমি বুঝতে পারছি না। আমার একজন ডিরেক্টরকে খুন করার চেষ্টা চলছে, এ-কথা জানার পর কিভাবে আমি এই চেয়ারে বসে থাকতে পারি? নিরীহ মানুষ আমাদের প্লেনে চড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শুধু এই কারণে তাদেরকে প্রাণ হারাতে হতে পারে, এ-কথা জানার পর কি করে আমি অচিন পাখিকে আকাশে তোলার অনুমতি দিই?'

'বিকল্পটা কি, মি. সালেহ?' জিজ্ঞেস করল রানা। হঠাৎ ক্ষীণ হাসল সে। 'আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে, এ নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না, প্লীজ। এ-ধরনের পরিস্থিতির সাথে অভ্যস্ত আমি। আরোহীদের বিপদ সম্পর্কে যা বলছেন, আপনাকে আমি কথা দিতে পারি প্রতিটি প্লেন টেক-অফ করার আগে আমার একান্ত বিশ্বস্ত চীফ এঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে পরীক্ষা করানো হবে। একদল লোক আমাদের উন্নতি সহ্য করতে না পেরে ষড়যন্ত্র করবে, নিজেদের ভাল সার্ভিস দিতে না পারার দোষটা আমাদের ঘাড়ে চাপাবে, এ মেনে নেয়া যায় না।'

সালেহ চৌধুরী বললেন, 'আমাকে সবার আগে বিবেচনা করতে হবে আরোহীদের নিরাপত্তা। কারও প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেয়ার চেয়ে আমি চাইব প্রতিটি অচিন পাখি মাটিতে বসে থাকবে।' অত্যন্ত দক্ষ ব্যবসায়ী তিনি, ব্যবসার স্বার্থে অনেক সময় দয়ামায়াহীনও বটেন, কিন্তু তাঁর ভেতর বাঙালীসুলভ সুন্দর, কোমল মনটা আজও মরে যায়নি, মানুষ হিসেবে বিবেকের তাগাদাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন না।

আরও দু'ঘণ্টা ধরে তর্ক-বিতর্ক চলল, কিন্তু সালেহ চৌধুরীকে টলানো গেল না। যতদিন আরোহীদের প্রাণের ওপর হুমকি থাকবে ততদিন কোন অচিন পাখি আকাশে উঠবে না।

রানা অবশ্য অনেক কষ্টে তাঁর কাছ থেকে একটা সুবিধে আদায় করে নিল। ওকে সাহায্য করলেন দারা শিকদার। ঠিক হলো, দারা শিকদার পাবলিক রিলেশন্স-এর অজুহাত দেখিয়ে একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে শুধু ভিআইপি আর সাংবাদিকদের। অনুষ্ঠানটা হবে দূরে কোথাও, অতিথিদের বহন করবে একটা অচিন পাখি। রানা নিজে প্রি-ফ্লাইট চেক করবে, একজন দক্ষ চীফ এঞ্জিনিয়ারের সহায়তায়। প্লেনটায় কোন স্যাবোটাজ হয়নি, এ-ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হবার পরই কেবল আকাশে উঠবে ওটা। পাবলিক রিলেশন্স গেস্টদের নিয়ে জ্যামাইকার মন্টেগো বে-তে যাবে অচিন পাখি, আলোচনা শেষে জানাল রানা। অতিথিদের নিয়ে আবার লন্ডনে ফিরে আসবে প্লেন। তারপর আর কোন অচিন পাখি আকাশে উঠবে না, যতদিন না স্যাম বুলহ্যামের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্রকারীদের দলটা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়।

সবাই ওঁরা জানেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রত্যেকে তাঁরা নিজেদের সমুদয় ধন-সম্পদ ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিলেন। ইস্পাত বাংলা ধ্বংস হয়ে গেলে সবাই ওঁরা পথে বসবেন।

বোর্ড মীটিং মাত্র শেষ হয়েছে, জ্যামাইকা থেকে কাসিমের টেলিফোন পেল রানা। 'আপনার বন্ধু ফিরে এসেছেন, বস্। সাথে হোয়াইট লেডি।'

'কোথায় ছিল সে?'

'কোস্টগার্ড বলছে, আপনার বন্ধু গভীর সমুদ্রে মাছ ধরছিলেন। কিন্তু সাথে করে তিনি কোন মাছ আনেননি।'

'ফুটবল খেলোয়াড়দের কোন খবর আছে?' জানতে চাইল রানা।

'খেলোয়াড়দের একজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাকিরা সবাই কিংসটন গ্রামের বাইরে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। তাদের অবস্থা নাকি খুবই করুণ।'

'তাদের ওপর নজর রাখার জন্যে একটা লোক ঠিক করতে পারো?'

'তারচেয়ে ভাল কিছু পারি, বস্। তাদের আমি উচিত শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। কাসিম তার হাতের ছোঁয়া দিয়ে ছেড়ে দেয়ার পর তারা কেউ বাপের নামটিও স্মরণ করতে পারবে না।'

'না, কাসিম। লোকগুলোকে টাকা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। ওদের ওপর আমার কোন রাগ নেই।'

'বস্, আপনি আমাকে তাজ্জব করলেন,' হতাশ কণ্ঠে বলল কাসিম। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, এটাই জ্যামাইকানদের নীতি। অপরাধী শাস্তি পাবে না, কাসিমের কাছে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য।

'ওটা অতীতের ঘটনা, কাসিম। আমি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগ্রহী। তুমি একজন হাউজ বয় সম্পর্কে বলেছিলে আমাকে, কোন্ এক মহিলা সম্পর্কে যেন উৎসাহী।'

'শব্দটা উৎসাহী নয়, বস্।'

'হাউজ বয়টাকে তুমি চেনো?'

'আমি আবার চিনি না কাকে, বস্?' এটা কাসিমের গর্ব নয়, জ্যামাইকায় কোথায় কি ঘটছে সবই তার নখদর্পণে।

'সে কি আমাদের হয়ে কাজ করবে?'

'ভাল টাকা পেলে শয়তানদের হয়েও কাজ করবে সে। ওই একটা জিনিসের ওপরই তো লোভ তার—টাকা।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, টাকার বিনিময়ে জ্যামাইকান হাউজ বয়কে ব্যবহার করতে বিবেকে খানিকটা বাধছে। অচিন পাখিগুলোকে মাটিতে বসিয়ে রাখা না হলে তাকে হয়তো ব্যবহার করত না ও। 'জ্যামাইকায় আমি দু'জন বন্ধুকে পাঠাচ্ছি, কাসিম। মি. মিগুয়েল গোনজালেস ও মি. অ্যাগোনিসটিস। পৌঁছেই ওরা তোমার সাথে যোগাযোগ করবে। ওদের সুযোগ-সুবিধের দিকে লক্ষ রেখো। দেখো, ওদেরকে যেন আমার মত ফুটবল বানানো না হয়। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, বস্।'

দুই বিশেষজ্ঞের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে সুবীর নন্দীকে। একজন সাইকোলজিস্ট, ভিয়েনা থেকে এসেছেন তিনি। অপর ব্যক্তি সাইকিয়াট্রিস্ট, মিউনিক থেকে এসেছেন। গতকালের পুরোটা দিনের প্রতিটি মুহূর্ত নতুন করে চিন্তা করতে হলো সুবীরকে, নতুন করে অনুভব করতে হলো, স্মরণ করতে হলো বারবার। তার গোটা জীবনের নিখুঁত একটা মানচিত্র তৈরি করলেন বিশেষজ্ঞরা, তাতে তার স্বভাব ও অভ্যেসের বিশদ বিবরণ থাকল। গতকাল কি কি করেছে সে, সবই জেনে নিলেন বিশেষজ্ঞরা। শুধু তাই নয়, কোথায় ও কিভাবে, কেন ও কখন কি করেছে তা-ও তাঁদের অজানা থাকল না। এক কথায়, সুবীর নন্দীর মন আর মাথা ওলটপালট করে দেয়া হলো।

বোর্ড মীটিং শেষ করেই প্রেস কনফারেন্স ডাকল রানা। শুধু এজেন্সিগুলোকে ডাকা হলো, বাদ পড়ল এভিয়েশন করেসপণ্ডেন্ট, টিভি রিপোর্টার ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা। এজেন্সি প্রতিনিধিদের নিয়ে নিজের অফিস কামরায় বসল রানা। এজেন্সির পাঁচজন লোক, রানা, আর ওর পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট শাহেদ ইকবাল। প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগতভাবে অভ্যর্থনা জানাল শাহেদ, সবাইকে পানীয় পরিবেশন করল, সবশেষে প্রকাণ্ড ডেস্কের কিনারায় বসল। ডেস্কটার পিছনে আগেই আসন গ্রহণ করেছে রানা। 'একটা বিবৃতি দেব আমরা, সেটা আপনাদের পড়ে শোনাবেন মি. মাসুদ রানা...।'

শাহেদকে থামিয়ে দিল মাইকেল হবস, সহাস্যে বলল, 'বিবৃতিটা দিন আমাদের, আমরা পড়তে জানি।'

'উঁহুঁ, এখুনি তা দেয়া যাবে না। হাতে পেলেই তো পালাবেন সবাই।'

'তাহলে আমাদের ডাকা হয়েছে লেকচার গেলাবার জন্যে? ওটা তো আপনি ডাকযোগে পাঠিয়ে দিলেও পারতেন!'

'সেটাই আপনাদের জন্যে সুবিধে হত, পয়সা খরচ করে হুইস্কি খাওয়াতে হত না,' মন্তব্য করল জন ম্যাক্সওয়েল।

'ফোল্ডারগুলো পাবার পর আপনারা আরও লক্ষ করবেন, কোম্পানীর

তৎপরতা সম্পর্কে দুশো পাতার যে রিভিউ দেয়া হয়, এবার সেটা বাদ দিয়েছি আমরা, বাদ পড়েছে উপহারস্বরূপ বলপয়েন্ট পেন, আই বি এ-র প্রতীক চিহ্ন সহ সোনার টাই-ক্লিপ, আর…।'

'বিপদেই পড়লাম দেখছি,' টিমোথি সারওয়াক প্রতিবাদের সুরে বলল। 'প্রতিবার আপনারা দেন বলে অফিস থেকে বেরুবার সময় আমি কোন কলম নিইনি।'

রানার ডেস্ক থেকে একটা কলম তুলে টিমোথির দিকে ছুঁড়ে দিল শাহেদ।

প্রতিনিধিরা সবাই জানে, আই বি এ-র অন্যতম ডিরেক্টর মাসুদ রানা নিজে যখন বিবৃতি পড়ে শোনাবেন, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ না হয়ে পারে না। 'মি. মাসুদ রানা যে বিবৃতি পড়ে শোনাবেন, তার একটা করে কপি আপনাদের দেয়া হবে, তারপর বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আমরা।' রানার ডেস্কের ইন্টারকম কী-তে চাপ দিল শাহেদ, কয়েকটা ফোল্ডার হাতে কামরায় ঢুকল শাহনাজ মুন্নী।

উপস্থিত বিদেশীরাও ধাঁধায় পড়ে গেল, বুঝতে পারল না মেয়েটা ইউরোপিয়ান নাকি এশিয়ান। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা শাহনাজ, জিনস আর কোমরে গোঁজা সাদা শার্ট পরেছে। গায়ের রঙ বেদানার মত। ডেস্কের ওপর ফোল্ডারগুলো রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

একটা ফোল্ডার তুলে নিয়ে খুলল রানা, খুক করে কেশে পড়তে শুরু করল লেখাটা। ওর গলার স্বর ঠাণ্ডা ও আবেগহীন। 'সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনগুলোকে আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়েছে—এয়ারলাইন্স সার্ভিসের কোন অচিন পাখি পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আকাশে উঠবে না। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকরী হবে।'

'মাই গড!' পল উইলসন আঁতকে উঠল। 'আপনাদের কোন প্লেন কি তাহলে বিধ্বস্ত হয়েছে?'

'টেলিপ্রিন্টারে আমরা তো কিছুই পাইনি!' বিস্ময় প্রকাশ করে সঙ্গীদের দিকে তাকাল টিমোথি সারওয়াক।

'আপনারা জানেন, আমাদের রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের এভিয়েশন এঞ্জিনিয়াররা অচিন পাখিকে আরও উন্নত করার জন্যে রাতদিন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। টেইলপ্লেন অ্যাসেম্বলির একটা উন্নত সংস্করণ আবিষ্কার করেছেন তাঁরা, যেটা উড়ন্ত অবস্থায় প্লেনের ভারসাম্য আরও ভালভাবে রক্ষা করবে। অচিন পাখির সুনাম এবং আরোহীদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়, তাই ওই নতুন সংস্করণ প্রতিটি প্লেনে সংযোজনের জরুরী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

'যীশুর কিরে, নিশ্চয়ই একটা অসিন পাকি ক্র্যাশ করেছে!' পল উইলসন প্রায় লাফ দিয়ে উঠল। 'টেইলপ্লেন সম্পর্কে গল্প বানিয়ে…।'

বাধা দেয়া সত্ত্বেও পড়ে যাচ্ছে রানা, 'সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনগুলোকে সব রকম সহায়তা দিচ্ছে আই বি এ, যাতে কোন শিডিউলড্ ফ্লাইট দেরি না করে বা বাতিল না হয়, সেই সাথে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে পরিকল্পনা বদলের কারণে

আরোহীদের বিড়ম্বনা যাতে ন্যূনতম পর্যায়ে থাকে।'

এজেন্সির প্রতিনিধিরা পরস্পরের দিকে তাকাল, হতভম্ব হয়ে গেছে। 'এ-ধরনের বিবৃতি পাঠালে কর্তৃপক্ষ আমার চাকরি খাবে!' পল উইলিয়াম বলল।

নিজের নোটবুকে চোখ বুলাল টিমোথি। 'এ-সব গাঁজাখুরি গল্প আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন, মি. রানা? যীশুর দোহাই লাগে, আসল ঘটনাটা কি? অসিন পাকি দুনিয়ার সেরা বিমান, সেগুলোকে মাটিতে বসিয়ে রাখছেন আপনারা; আর ব্যাখ্যাটা সারতে চাইছেন অর্থহীন পনেরোটা লাইনে? আপনাদের কোন প্লেন কি বিধ্বস্ত হয়েছে? ইয়েস অর নো?'

'অচিন পাখি বিধ্বস্ত হওয়ার সাথে এই বিবৃতির কোন সম্পর্ক নেই,' বলল শাহেদ।

'তাহলে বলুন, অনির্ধারিত একটা ফ্লাইট যে নিসে ল্যান্ড করল, সেটার রহস্য কি? আপনাদের এই অফিস থেকেই বলা হয়েছে আমাদের, একজন আরোহীর নাকি অ্যাপেনডিক্স ফেটে গিয়েছিল। আই বি এ যে শুধু মুনাফার দিকটাই দেখে না, মানবিক দিকগুলোও দেখে, আমি আমার রিপোর্টে সে-কথাটা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, কাজটা বোধহয় ঠিক করিনি। আপনারা আমাদেরকে এভাবে বঞ্চিত করবেন জানলে...।'

বিব্রত বোধ করল শাহেদ, চেহারায় আবেদন নিয়ে রানার দিকে তাকাল।

একটা হাত তুলে সাংবাদিকদের শান্ত হবার অনুরোধ জানাল রানা। 'বন্ধুরা,' বলল ও, 'একটা ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে পারি আমি। আই বি এ থেকে মিথ্যে কোন গল্প কখনোই আপনাদের বলা হয়নি, ভবিষ্যতেও কখনও বলা হবে না। নিসে ঠিক যা ঘটেছে তাই আপনাদের জানিয়েছি আমরা।'

'কিন্তু টেইলপ্লেন অ্যাসেম্বলির গল্পটা গল্পই, মি. রানা, কোনমতে বিশ্বাস্য নয়,' মাইকেল হবস বলল। 'আমার অফিস এটাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করবে না। তাছাড়া এই বিবৃতি ছাপা হবার পর, যদি কোন ফলো-আপ না থাকে, গুজবে ছেয়ে যাবে বাজার...।'

'গত কয়েক ঘণ্টা ধরে শেয়ার বাজারে কি ঘটছে, ভেবেছেন আমরা জানি না, মি. রানা?' পল উইলিয়াম জিজ্ঞেস করল। 'আপনাদের এই বিবৃতি দুনিয়ার সব ক'টা দৈনিকে হেডিং হবে। আই বি এ সম্পর্কে লোকে কি ভাববে, চিন্তা করেছেন?'

ডেস্কের পিছনে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমি আর শাহেদ করিডরে একটু হাঁটতে যাচ্ছি,' বলল ও। 'আমাদের অনুপস্থিতিতে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবুন আপনারা, গ্লাসে চুমুক দিন, সিগারেট টানুন। একটা ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারি আপনাদের, আবার যখন ফিরে আসব আমরা, যে-প্রশ্নই আমাদেরকে করুন, প্রতিবার উত্তরটা হবে—নো কমেন্ট।' শাহেদকে নিয়ে করিডরে বেরিয়ে গেল ও।

এজেন্সির প্রতিনিধিরা বসে থাকল, পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

সবাই ওরা অভিজ্ঞ জার্নালিস্ট। অচিন পাখিকে মাটিতে বসিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এটার নিউজ ভ্যালু সম্পর্কে তারা সচেতন। অথচ আসল গল্পটা পাচ্ছে না তারা। ব্যাপারটা কি? মাসুদ রানা কোন্ খেলা খেলছে তাদের সাথে?

'আমি ফোন করতে যাচ্ছি,' টিমোথি বলল। 'বাজি ধরে বলতে পারি, আই বি এ-র একটা অসিন পাকি কোন ভিআইপি প্যাসেঞ্জার নিয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। এলিজাবেথ টেলরের একটা অসিন পাকি আছে, তাই না? মাইকেল জ্যাকসন আর ম্যাডোনারও তো আছে, কি বলো?'

'বসো, টিমোথি, মাথা ঘামাও,' বলল হবস। 'মি. মাসুদ রানা এভাবে আমাদের ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করবেন না। কোন প্লেন ক্র্যাশ করলে তিনি বলতেন। ভেবে দেখো, আগে কখনও উনি তোমার চোখে পট্টি বাঁধার চেষ্টা করেছেন?'

'তুমি দেখছি ওঁর হয়ে দালালি শুরু করেছ!' ঝাঁঝের সাথে বলল টিমোথি। কিন্তু ফোনের দিকে হাত বাড়াল না।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কোথাও ওরা পৌঁছুতে পারল না, কাজেই রানার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকল সবাই। রানা ফিরতেই এক সাথে হৈ-চৈ করে উঠল ওরা।

'একজন কথা বলুন।'

'আমরা আপনার বিবৃতি বিশ্বাস করব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' জানাল টিমোথি।

কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'এরপর কি ঘটবে আমরা জানি,' বলল মাইকেল হবস। 'দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কোন দৈনিক তাদের প্রতিবেদক পাঠাবে আপনাদের অফিসে, একজন মেকানিকের সাথে ফিসফাস করে আসল ঘটনাটা জেনে ফেলবে সে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'যে-কোন স্টোরি শুধু আমার কাছ থেকে জানা যাবে। সেটাও শুধু আপনাদেরকেই বলব আমি।'

'তারমানে স্টোরি একটা আছে?'

'তা বলছি না। আমি বলছি, আই বি এ-র আর কেউ প্রেসকে কিছু বলবে না।'

'তথ্য কেনা যায়...'

'আই বি এ থেকে নয়,' বলল রানা। 'অন্তত এ-ব্যাপারে তো নয়ই।'

'তারমানেই গল্প একটা আছে।'

'নো কমেন্ট।'

'আপনি আপনার স্টেটমেন্টে বলেছেন, এয়ারলাইনগুলোর সাথে সহযোগিতা করছে আই বি এ। তারমানে কি এই যে যতদিন মাটিতে বসে থাকবে অসিন পাকি ততদিন বিকল্প ফ্লাইট চালাবার জন্যে ওদেরকে আপনারা আর্থিক সাহায্য দেবেন? তারমানে কি আই বি এ এজন্যে কোটি কোটি ডলার খেসারত দিতে যাচ্ছে—হ্যাঁ বা না?'

'ট্রিক কোশ্চেন,' বলল রানা। 'নো কমেন্ট।'

'অসিন পাকিকে মাটিতে বসিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত হওয়ায় এয়ারলাইনগুলোর শেয়ারহোল্ডাররা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদের ক্ষতি কি পুষিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে আই বি এ?'

'নো কমেন্ট।'

সশব্দে নোটবুকটা বন্ধ করল টিমোথি সারওয়াক। 'সাংবাদিক হিসেবে আমার দায়িত্ব, আসল ঘটনা জানা। আমার বিবেক বলে, শেয়ারহোল্ডারদের জানার অধিকার আছে তাদের কোম্পানী কেন লোকসান দেয়ার পথ বেছে নিল। কাজেই এখানে বসে থেকে কোন লাভ নেই, আমি আসল ঘটনা জানার চেষ্টা করব…,' দরজার দিকে এগোল সে।

প্রায় ছুটে গিয়ে টিমোথির একটা হাত চেপে ধরল পল উইলিয়াম। 'শান্ত হও, টিমোথি। এরমধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। দেখা যাক না চেষ্টা করে, আমাদের হয়তো জানার সুযোগ হবে… ।'

ঝাপটা দিয়ে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল টিমোথি। 'আমরা বন্ধু হলাম কবে থেকে, পল? ভুলে গেছ, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী আমরা? তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তুমি থাকো, কিন্তু আমি জানি এই অফিস থেকে আসল ঘটনা জানা যাবে না। স্টোরি একটা থাকতে বাধ্য, সেটা আমি ঠিকই উদ্ধার করব… ।' আবার দরজার দিকে এগোল সে।

'স্টোরি একটা সত্যি থাকার কথা,' পিছন থেকে বলল রানা। 'তবে সেটা এখনও তৈরি হয়নি। তৈরি হবে একমাত্র যে অচিন পাখিটাকে টেক-অফ করাবার জন্যে রেডি করা হয়েছে সেটা আকাশে ওঠার পর।'

চরকির মত ঘুরল টিমোথি সারওয়াক। 'এই না আপনি বললেন সব ক'টা অসিন পাকিকে মাটিতে বসিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে?'

'স্টেটমেন্টটা পড়ে দেখুন,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'আমি বলেছি এয়ারলাইন্স সার্ভিসের সব ক'টা অচিন পাখি। ওগুলো ছাড়াও আই বি এ-র নিজস্ব ব্যবহারের জন্যে আরও অনেক অচিন পাখি আছে। কোন স্টোরি যদি তৈরি হয়ই, আমার বিশ্বাস, আমাদের একটা অচিন পাখি কাল জ্যামাইকা রওনা হবার সময় থেকে তৈরি হবে সেটা।'

'আমি তাহলে নিউ ইয়র্ক অফিসে ফোন করে বলে দিই, ওরা জ্যামাইকায় একজনকে পাঠিয়ে দিক… ।'

'আরও ভাল প্রস্তাব আছে আমার। আমার দেয়া বিবৃতিটা আপনারা যদি ছাপেন, ওই প্লেনে ভ্রমণ করার জন্যে আপনাকে আমি আমন্ত্রণ জানাব। কোন খরচ নেই, মন্টেগো বে থেকে বেড়িয়ে আসতে পারবেন। আপনি একা নন, আপনারা সবাই যেতে পারবেন। অচিন পাখি আপনাদের ফিরিয়ে আনার পর আমার কো-ডিরেক্টর মি. দারা শিকদার বা আমি আপনাদের যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দেব, কথা দিচ্ছি।'

দোরগোড়া থেকে ফিরে এল টিমোথি। 'সত্যি কথা দিচ্ছেন?'

'অবশ্যই।'

'আমরা ছাড়া আর কে থাকবে প্লেনে?'

'শুধু আপনারা পাঁচজন…'

আবার একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। 'আমার আপত্তি নেই,' মাইকেল হবস বলল।

'বিনা খরচায় গায়ে রোদ লাগিয়ে আসা যাবে, মন্দ কি!' রাজি হলো উইলিয়াম।

'ঠিক আছে, রাজি,' বলল টিমোথি। বাকি দু'জনও লুফে নিল প্রস্তাবটা।

নিজের অ্যাপার্টমেন্টে রানার জন্যে অপেক্ষা করছিল শাহনাজ মুন্নী। লেকের ধারে বাড়িটা, পাঁচতলায় একা থাকে সে, ঘরের ভেতর থেকে বহুদূর পর্যন্ত পাহাড়, বনভূমি আর মাঝখানে চওড়া লেক দেখা যায়। পুরানো বাড়ি, এলিভেটর নেই, সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পরও রানা হাঁপাল না। করিডর ধরে হেঁটে এল যেন একটা চিতা বাঘ। ব্রোঞ্জের নকার ধরে টান দিল রানা, যেন দরজার পাশেই অপেক্ষা করছিল শাহনাজ, সাথে সাথে খুলে গেল কবাট। খপ্ করে ওর হাতটা ধরে ফেলল সে, কে এসেছে ভাল করে দেখার সময়ও নিল না, যেন পেয়ে হারাবার ভয়ে অস্থির হয়ে আছে।

ট্রাউজার স্যুট পরে রয়েছে শাহনাজ। গাঢ় নেভী-ব্লু ট্রাউজার, নীল আর সাদা ডোরাকাটা সোয়েটার, তার ওপর সাদা কোট, বোতামগুলো বিরাট আকৃতির চকচকে তামা।

কোন কথা হলো না, শুধু আড়ষ্ট হাসি লেগে থাকল শাহনাজের ঠোঁটে, রানার হাত ধরে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। খানিকটা অবশ হয়ে গেছে, সারা শরীরে রোমাঞ্চের উপভোগ্য শিহরণ। চোখে নেশা নেশা একটা ভাব, যেন কিছু পাবার আশায় অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে সে। ওখানেই, দোরগোড়ায়, দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, তারপর শাহনাজকে চুমো খেল রানা। নির্লজ্জ ব্যাকুলতার সাথে ওর আরও কাছে সরে এল শাহনাজ, শরীরে শরীর ঠেকাল। চুমো খাওয়ার পর বলল সে, 'বলা উচিত অনেক দিন পর দেখা হলো, কিন্তু বলব না। যখনই তুমি আমার কাছে আসো, আমাকে ধরো, অন্য সব সময়ের কথা ভুলে যাই আমি, কাজেই মনে হয় না যে অনেকদিন পর এলে…।'

'কেমন আছ তুমি, শাহনাজ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

প্রশ্নটা ব্যক্তিগত, উত্তরটাও গোপনীয়—শুধু নির্দিষ্ট কোন প্রশ্নকর্তাকে দেয়া যায়। 'শুধু ভাবি, এত সুখ আমার সইবে কি না!' রানার আরও কাছে সরে এল সে, দু'হাত দিয়ে আলিঙ্গন করল ওকে। রানা অনুভব করল, অল্প অল্প কাঁপছে মেয়েটা। তার পারফিউমের গন্ধ পেল ও, গালে ঘষা খেল কোমল চুল। এ আশ্চর্য এক নারী কাছে এলেই অনুভব করে রানা—বলিষ্ঠ, মসৃণ, নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায় আক্রমণাত্মক, ভয়ানক প্ররোচিত করে—বুভুক্ষুর মত নিতে পারে যেমন, দিতেও পারে তেমনি। শাহনাজের হাঁটাচলায় দৃঢ় একটা ভাব আছে, সাংঘাতিক আকর্ষণ করে রানাকে, যেন এইমাত্র স্কি

স্লোপ থেকে নেমে এল মেয়েটা। কখনোই মেকআপ ব্যবহার করে না অথচ তার মুখের রঙ শুধু বেদানার সাথে তুলনা করা চলে। ঠোঁট দুটো প্রশস্ত, মুখের ভেতরটা লাল, চোখ দুটো সব সময় মায়া আর স্বপ্ন বিলি করছে। রানার আলিঙ্গন থেকে পিছু হটল সে, বলল, 'জানি, খুব ব্যস্ততার মধ্যে সময় করে এসেছ তুমি। ডেটটা যদি বাতিল করতে চাও, নিজেকে আমি মানিয়ে নিতে পারব।'

শাহনাজের হাতটা ছাড়ল না রানা। 'ওদিকের ঝামেলা সামলানোর ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট তাহলে আছে কি করতে?'

কথা বলছে ওরা, ধীরে ধীরে ফ্ল্যাটের ভেতর রানাকে টেনে নিল শাহনাজ। লেকের কিনারা ধরে সার সার লাইটপোস্ট, পানির স্থির চাদরে ঝিকমিক করছে আলো। জানালার সামনে একটা টেবিল ফেলেছে শাহনাজ, ডিনারের জন্যে সাজানো, এক ডজন মোম জ্বলছে টেবিলের মাঝখানে। টেবিলের পাশে একটা ট্রলিতে ওয়াইনের বোতল আর গ্লাস, আরেকটা ট্রেতে কেক, দুধের মত সাদা, তাতে একটা মাত্র মোমবাতি। মোমের কোমল আলো কামরার পালিশ করা কাঠের প্যানেল থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে চারদিকে। ফার্নিচারগুলো হালকা ও মার্জিত, জুরিখ শহর চষে খুঁজে বের করা হয়েছে একটা একটা করে, রুচির সাথে মিল রাখার জন্যে।

'কঁগ বুতেরা-য় একটা টেবিল রিজার্ভ করেছি আমি,' বলল রানা। 'কুক-এর সাথে কথা হয়েছে আমার। আজ ওরা কাসলার রিপচেন পরিবেশন করবে।'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আমরা বাড়িতেই খাব।'

'আমি চাইনি তোমার ঝামেলা হোক।'

'ওরা নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে ভালবাসে, তুমি জানো।'

'বাঙালী মেয়েদের কথা বলছ।'

বিষণ্ন হলো শাহনাজ। 'তোমার প্রিয় খাবারগুলোই রান্না করেছি। লেকে বোটের আলো দেখবে আর খাবে। আমি তোমার খাওয়া দেখব।'

'তুমি খাবে না?'

মাথা নাড়ল শাহনাজ, বলল, 'তবে আজ যদি আমি একটু বেশি মদ খাই তুমি মানা কোরো না।'

'সে কি! কেন, মাতাল হতে চাও নাকি?'

আড়ষ্ট একটু হেসে মাথা নাড়ল শাহনাজ। 'ন্‌না, ধ্যেত! তুমি···তুমি আমার জন্যে একটা উৎসব। আনন্দটা প্রকাশ করার জন্যে আর কি করতে পারি, বলো? তুমি এলেই আমি অধীর হয়ে উঠি, সেই অস্থিরতা থেকে বাঁচার জন্যেও তো একটা কিছু দরকার।'

ইঙ্গিতে কথা বলছে শাহনাজ, তার প্রতিটি কথা কাঁটার মত বিঁধছে রানার বুকে, অর্থগুলো সবই ওর জানা।

লেকের ওপর দিয়ে আসা-যাওয়া করছে আলোকিত ফেরি বোটগুলো,

বুকে প্রতিফলিত আলো নিয়ে ঝিলমিল করছে পানি, স্থির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝখানে ওইটুকুই যা চাঞ্চল্য। মাটি থেকে অনেক ওপরে রয়েছে ওরা, রাস্তা ধরে ছুটে যাওয়া যানবাহনের শব্দ কানে আসছে না, লেকের কিনারায় সার সার লাইটপোস্টের আলো আড়াল করে রেখেছে গাছের পাতা। উয়েতালিবার্গ-এ প্রথম তুষারপাত হয়েছে, পাহাড়ের গায়ে ঝুলে থাকা বাড়ি-ঘরে মিটমিট করছে খুদে আলো। জানালার সামনে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, টেবিলে খাবার পরিবেশন করছে শাহনাজ, গুন গুন করে একটা স্প্যানিশ গান গাইছে।

সুরটা রানার চেনা, শাহনাজের গলায় স্পষ্ট উচ্চারণ, কথাগুলো ও ধরতে পারল। কি এক বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল বুকের ভেতরটা। বনের একটা ফুলকে গ্রাম্য মেয়ে বলে কল্পনা করা হয়েছে। মেয়েটি তার প্রেমিককে উদ্দেশ্য করে বলছে, 'তোমাকে বঞ্চিত হতে দেখি, সেটাই আমার ভয়ানক কষ্ট। আমার জন্ম ব্যর্থ হলো, কারণ তুমি জানলে না এই সুন্দর ফুল তোমারই জন্যে ফুটে আছে।' তারপর বলছে, 'একদিন হয়তো এই বনপথ দিয়ে যাবে তুমি, সেদিন দেখবে ফুলটা খসে পড়েছে পায়ে চলা পথের ওপর, সেই শুকনো ফুল পায়ে দলে চলে যাবে তুমি—সেই অমোঘ নিয়তির জন্যে অপেক্ষা করাই আমার জীবন।'

গুন গুন থামতে ঘুরে দাঁড়াল রানা, শাহনাজের মুখের দিকে তাকাল। পরিবেশটা হালকা করার জন্যে বলল, 'তুমি যেন আলেকজান্দ্রিয়ার গোলাপ—দিনের বেলা সাদা, রাতের বেলা রঙিন।'

নিঃশব্দে হাসল শাহনাজ, তারপর দু'জনেই চুপ হয়ে থাকল গানের শেষ লাইনটা দু'জনেরই মনে পড়ে গেছে। 'তারপরও, দেখো কেমন মেয়ে আমি, শুধু তোমাকেই ভালবাসি।'

রানাকে প্রায় চমকে দিয়ে নক হলো দরজায়। ত্রস্ত পায়ে দরজা খুলতে গেল শাহনাজ। আহলাদে আটখানা চেহারা, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অচেনা এক লোক, তার পিছনে দুই কিশোর বহন করছে বড় একটা মেটাল বক্স। পথ দেখিয়ে লোকটাকে ভেতরে আনল শাহনাজ। কিশোর দুটোকে গাইড করল লোকটা। ছেলেগুলো এমন সতর্কতার সাথে বয়ে নিয়ে এল বাক্সটা, ওটায় যেন দুর্লভ পাখির ডিম আছে। তাড়াতাড়ি একটা টুল নিয়ে এসে টেবিলের পাশে রাখল শাহনাজ, বাক্সটা সেটার ওপর রাখা হলো। 'আর কিছু দরকার আপনার, ম্যাডাম?' এমন সুরে জিজ্ঞেস করল লোকটা, যেন ষড়যন্ত্র করছে। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল শাহনাজ। ছেলে দুটোকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা।

একটা চেয়ার দেখাল শাহনাজ, তাতে বসল রানা। ওর বাঁ দিকে চকমক করছে লেক, কিন্তু ওর উল্টোদিকে শাহনাজ বসার পর পানির দিকে আর মন থাকল না রানার।

'কি আছে বাক্সটায়?' জিজ্ঞেস করল রানা, উত্তরটা জানে।

'কাসলার রিপচেন···কঁগ বুতেরা থেকে আনিয়েছি।' হঠাৎ রানার একটা

কব্জি চেপে ধরল শাহনাজ। 'তোমার জন্যে একটা উপহার কিনে ফেলে রেখে এসেছি অফিসে! এফিশিয়েন্সি কাকে বলে বোঝো এবার!' হেসে উঠল সে। তার হাতে মৃদু চাপ দিল রানা, লক্ষ করল শাহনাজের চোখে এত বেশি উজ্জ্বলতা আর আনন্দ যে প্রায় পানি বেরিয়ে আসছে।

'তোমার সান্নিধ্যই সবচেয়ে বড় উপহার···।'

আবার শব্দ করে হাসল শাহনাজ, কাঁচের মত ভঙ্গুর। 'উপহারটা দিয়ে বলতাম, তোমাকে আমি ভালবাসি। জানি, অনেক দিন আগেই ঠিক হয়েছে, এ বিষয়ে কখনও আমরা কথা বলব না, দু'জনের সম্পর্কটা নিয়ে কখনোই সিরিয়াস হব না···কিন্তু তবু উৎসবের দিন ভালবাসি বলার মধ্যে দোষের কিছু নেই, কি বলো?'

রানার মনে হলো, কেঁদে ফেলবে শাহনাজ। হঠাৎ আড়ষ্ট, আনাড়ি ভঙ্গিতে চেয়ার ছাড়ল মেয়েটা, দেখাদেখি রানাও দাঁড়াতে যাচ্ছে, দুটো মাথা প্রায় ঠুকে গেল। পরস্পরকে অস্থির ভাবে চুমো খাচ্ছে ওরা, নিঃশব্দে কাঁদছে শাহনাজ, তার চোখের উষ্ণ লোনা পানিতে ভিজে যাচ্ছে রানার ঠোঁট। কোন মেয়ে প্রেম নিবেদন করলে যা হয়, রানার হৃৎপিণ্ডটা কেউ যেন লোহার আঙটা দিয়ে চেপে ধরেছে। কতজনকেই ভালবেসেছে রানা, আজ ওরা জীবন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, কিন্তু এই দূরে সরে যাওয়ায় ভালবাসা কই মরে তো যায়নি।

'শাহনাজ!' নরম সুরে ডাকল রানা।

চাপা দেয়ার চেষ্টা করলেও, শাহনাজ টের পেয়ে গেল রানার গলায় মৃদু তিরস্কার রয়েছে। রানার গালে গাল ঘষল সে। 'ঠিক আছে,' বলল। 'ভালবাসা না হয় না হোক, অন্য কিছু হোক। তোমাকে চাই আমি। আজ। এখানে। এখুনি। প্লীজ, রানা!'

'আমিও তোমাকে চাই, শাহনাজ,' অকপটে বলল রানা। 'কিন্তু তোমাকে এত বেশি মূল্য দিই আমি যে আঘাত করতে পারি না।'

রানার কাছ থেকে সরে গেল শাহনাজ। দূরে নয়, সামান্য একটু, যাতে রানাকে ভাল করে দেখতে পায়। 'আজ আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করব, প্রথম পরিচয়ের দিনেই কেন তুমি বলেছিলে, ভালবাসার কথা আলোচনা করা যাবে না?'

'প্রথমদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমাকে নিয়ে তুমি সাংঘাতিক স্বপ্ন দেখবে।'

'কেন, আমাকে ভালবাসতে তোমার বাধা কোথায়?' সরাসরি জানতে চাইল শাহনাজ।

ডিনারের কথা আপাতত ভুলে গেল ওরা, বসল লম্বা একটা সোফায়, পাশাপাশি। 'তোমাকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলি,' বলল রানা। 'আগে কখনও এ-কথা কাউকে বলার চেষ্টা করিনি। জানি না ঠিকমত বলতে পারব কিনা। পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ আছে এমন দু'জনের মধ্যে সেক্স অত্যন্ত ভাল জিনিস, কিন্তু তার সাথে প্রেমের কোন সম্পর্ক নেই। প্রেম দু'জনের

মধ্যে অত্যন্ত চমৎকার একটা ব্যাপার, কিন্তু তার সাথে সেক্সের কোন সম্পর্ক নেই। এটা আমার নিজের ধারণা, কারও সাথে না-ও মিলতে পারে। আমার জীবনে প্রেম একটা অভিশাপ। যতবার যাকে ভালবেসেছি, অসম্ভব কষ্ট পেতে হয়েছে আমাকে, তাকেও। সেজন্যে ভয় পাই। আমার বাউণ্ডুলে জীবনে ঘর বাঁধা হবে না কোনদিন। তাই বলে পিপাসা কি জাগে না?...কোমল একটি বউ...ফুটফুটে একটি শিশু...সুখী একটি সংসার...উঁহুঁ, হয়নি—হবে না কোনদিন। এ আমার অদৃষ্টের লিখন, তুমি তো জানো। এ-সব কথা তোমাকে বলার মধ্যে বুদ্ধিমত্তার হয়তো কোন ছাপ নেই, কিন্তু আমি অনুভব করছি কথাগুলো তোমাকে বলা দরকার...।'

'তুমি কৌশলী লোক নও, অন্তত এ-ব্যাপারে। তুমি সত্যি সৎ, রানা। কিন্তু কি বলবে, যদি বলি, তোমার ব্যাপারে একই অনুভূতি আমারও? যেদিন থেকে পরিচয় হয়েছে, তোমাকে আমি পাব না জেনেই ভালবেসেছি...।'

'তোমার মত ভাল মেয়ে আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি আমি,' বলল রানা। কথাটা ষোলো আনা সত্যি। শাহনাজের মত আদর্শ সেক্রেটারি হয় না। কখনোসখনো ওরা অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে, সে-সব দিনের স্মৃতি ব্যথা দেয় রানাকে। নিজেকে ওর হাতে তুলে দিতে চেয়েছে শাহনাজ, অনেক কষ্টে প্রকৃতির ধর্ম অস্বীকার করে নিজেকে সংযত রেখেছে রানা। শুধু একটা কারণে, সেক্স আর লাভ একই ব্যাপার বলে ভুল করতে পারে মেয়েটা। শাহনাজকে আঘাত করতে চায়নি ও।

'তোমার সব সেক্রেটারিই কি তোমার প্রেমে পড়ে?'

'আমি সাবধানে থাকি, তবু অনেক সময় বিব্রত হতে হয়।'

'শুনেছি, অনেকে চাকরি ছেড়ে চলে যায়।'

'যায়।'

ভাঁজ করা হাঁটু সোফার ওপর তুলে রানার গায়ে হেলান দিল শাহনাজ। 'আমি যাব না।'

'কিন্তু আমার যে পরিবর্তন হবে না।'

'সেজন্যে ওপরওয়ালাকে ধন্যবাদ। তুমি অন্য রকম হলে তোমাকে ভালবাসতে পারতাম কিনা কে জানে। যার সাথে যা খুশি করো তুমি, মানুষটা তুমি বদলাও বা না বদলাও, আমি কিছু বলব না—শুধু একটা ব্যাপারে আমার আপত্তি থাকবে।'

'কি সেটা?'

'জুরিখে কোন মেয়েকে আনবে না, বা জুরিখের কোন মেয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না। আমি তাদের চোখ আঙুল দিয়ে উপড়ে আনব।'

সেদিন রাত এগারোটায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজিস্ট ও সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক একমত হলেন, আজকের মত যথেষ্ট সময় নেয়া হয়েছে সুবীর নন্দীর, এবার তাকে হোটেলে ফিরতে দেয়া যেতে পারে।

সুবীর নন্দী যেদিন প্লেনটা চেক করে সেদিনকার প্রতি মুহূর্তের বিবরণ

লিখে নিয়েছেন তাঁরা। তার সম্পর্কে যা জানা গেছে, ঢাউস একটা বই লেখা যেতে পারে। সেই সাথে তাকে ড্রাগস খাওয়ানোর পদ্ধতিটা সম্পর্কেও অবগত হতে পেরেছেন তাঁরা। হোটেলে ফিরে এল সুবীর, মাথাটা ঘুরছে তার। কে বিশ্বাস করবে ধূমপান ঘৃণা করে সে, সিগারেট কেনার একমাত্র কারণ ছিল কাউন্টারে দাঁড়ানো মেয়েটা অপরূপ সুন্দরী? কে বিশ্বাস করবে, মেয়েটাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয়নি তার আত্মবিশ্বাসে কুলোয়নি বলে? কারণ ইটালিয়ান ভাষায় তার দখল থাকলেও, উচ্চারণে ত্রুটি আছে? কাজেই সাইকোলজিস্ট ভদ্রলোক সুবীরকে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, তার ইংরেজি উচ্চারণ যেহেতু ভাল, কাজেই ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় বদলির জন্যে দরখাস্ত করা উচিত তার। অবশ্য সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক জোরের সাথে বলেছেন, সুবীরের উচিত হবে ইংল্যান্ডে যাবার আগে সিগারেটের দোকানে আরেকবার উপস্থিত হয়ে মেয়েটাকে বন্ধুত্বের প্রস্তাব দেয়া, ভুল উচ্চারণে হলেও। 'মেয়েটা রাজি হোক বা না হোক, আপনি তাকে প্রস্তাব দিতে পারলে নিজের প্রতি সন্তুষ্ট বোধ করবেন। তারপর হয়তো আপনার সিগারেট কেনা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে।'

সুবীর চলে যাবার পর দুই ভদ্রলোক সামনাসামনি দুটো চেয়ারে বসলেন। দু'জনেই একমত হলেন, সুবীর নন্দীর কলম বা পেন্সিল চিবানোর অভ্যেসটা অনেক দিনের পুরানো, এত পুরানো যে তার ঘনিষ্ঠ জনের চোখে পড়বার মত।

দশ

মিগুয়েল গোনজালেসকে তার বন্ধুরা 'ওস্তাদ' বলে ডাকে। জুরিখের কাছাকাছি এক পাহাড়ের মাথায় তাকে একটা গ্যারেজ করে দিয়েছে রানা। গাড়ি মেরামতের কাজ ছাড়াও ইলেকট্রনিক্স-এ একটা প্রতিভা সে, তার আবিষ্কারগুলো পেটেন্ট করা সম্ভব হলে এতদিনে বিরাট ধনী হয়ে যেত। বছর কয়েক আগে সাইপ্রাসে এক কাজে গিয়ে তার সম্পর্কে জানতে পারে রানা, মাতাল অবস্থায় এক পতিতালয় থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে জুরিখে। রানার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেই থেকে কাজকর্ম ভালই করে গোনজালেস, কিন্তু বদ অভ্যাসগুলো আজও পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেনি। তবে রানাকে খুবই সমীহ করে সে।

রানারই পরামর্শে একটা জাইরো-মাউন্টেড প্যারাবোলিক মাইক্রোফোন আবিষ্কার করেছে গোনজালেস। রানার নির্দেশ পেয়ে মাইক্রোফোনটা নিয়ে জ্যামাইকার পথে রওনা হয়ে গেল সে।

মন্টেগো বে-র ভেগা কটেজে একটা কামরা বুক করা হয়েছে তার জন্যে। এয়ারপোর্টে তাকে অভ্যর্থনা জানাল কাসিম, কাস্টমস চেক শুরু হওয়ার আগেই কাসিমের কানে কানে জানিয়ে দিল সে, মাইক্রোফোনটা

রেডিওর ভেতর লুকানো আছে। কাস্টমস অফিসার কাসিমের পূর্ব পরিচিত, কাসিমকে পুলিসের ইনফরমার হিসাবে জানেন তিনি, কাজেই গোনজালেসের লাগেজ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হলো না।

লিংকন কন্টিনেন্টালে চড়ল গোনজালেস, সুটকেস দুটো বুটে রাখা হয়েছে, তবে ট্রানজিসটর রেডিওটা নিজের পাশের সীটে রাখল। গাড়িটা এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হতেই বুক পকেট থেকে একটা পেন্সিল বের করল সে, গাড়ির চারদিকে ঘোরাল সেটা। মাইক্রো-মিটারে কিছুই ধরা পড়ল না। আয়নায় চোখ রেখে তার আচরণ লক্ষ করছে কাসিম। 'জানতে পারি, স্যার, কি খুঁজছেন আপনি?'

'দেখছি গাড়িটা নিরাপদ কিনা।'

'ঠিক কি ধরনের বিপদ আশঙ্কা করছেন আপনি, স্যার?' কাসিমের সবিনয় প্রশ্ন।

'ছারপোকা।'

'কি ধরনের ছারপোকা? কান পাতে, নাকি কামড় দেয়?'

'কান পাতে।'

হেসে উঠল কাসিম। 'কাসিমের গাড়িতে আড়িপাতা যন্ত্র নেই, স্যার।'

'ভাল। তোমার বন্ধু হাউজ-বয়টার খবর কি?'

'সে আমার বন্ধু নয়, স্যার। খারাপ লোকদের সাথে আমি বন্ধুত্ব করি না।'

'তবে তুমি তাকে দিয়ে কাজ করাও।'

'টাকা, স্যার। টাকা তাকে দিয়ে কাজ করায়।'

'লোকটা সাঁতার জানে?'

'মাছের মত।'

'বোট চালাতে পারে?'

'না, তবে আমি তাকে শিখিয়ে নিতে পারব।'

'আমাকে শেখাতে পারো?'

'কাসিম সবাইকে শেখাতে পারে। কাল সকালে, স্যার?'

'আজ।'

'আপনি যা বলেন।'

ভেগা কটেজে পৌঁছুল ওরা। সুইমিং ট্রাঙ্ক-এর ওপর লম্বা হাতা সুতি শার্ট পরল গোনজালেস, সাথে আঁটো শর্টস। কাসিমের পরামর্শে চামড়া কামড়ে থাকা রাবার স্লিপ-অন পরল, টেনিস শ্যুর নিচে। ইতোমধ্যে মন্টেগো বে শহরে গিয়ে সরু একটা বোট ধার করেছে কাসিম, সার্ফ-বোর্ড-এর মত দেখতে। মাস্তুল আর পাল ছিল, সেগুলো খুলে বোটটা তোলা হয়েছে গাড়ির ছাদে। গোনজালেসকে নিয়ে এয়ারপোর্টের রাস্তা ধরল কাসিম, যেন একজন ট্যুরিস্ট ভাড়া করা গাড়ি আর সেইল বোট নিয়ে সময় কাটাতে বেরিয়েছে। ফুলমুন হোটেল থেকে আধ মাইল এগিয়ে এসে ওরা দেখল, রাস্তার ধারে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে হাউজ বয়। সামনের দরজাটা খুলে দিল কাসিম, গাড়িতে উঠে দাঁত বের করে হাসল ছোকরা, ফর্সা বিদেশীর দিকে ফিরে।

গোনজালেসকে যা বলার বলে দিয়েছে রানা, জানে টাকার বিনিময়ে কাজ করছে হাউজ বয়। 'কি নাম তোমার,' জানতে চাইল সে।

'মাইকেল ডগলাস, স্যার।'

'তোমাকে আমি মাইক বলে ডাকব।'

'ওটা আমার নাম নয়, স্যার।'

'তুমি চাও তোমাকে আমি ডগ বলে ডাকি?'

'আপনি আমাকে মাইক বলেই ডাকবেন, স্যার।'

কালাহান বীচ ছাড়িয়ে এল কাসিম, তারপর রোজ হলকে পাশ কাটাল, সবশেষে পানির প্রায় কিনারায় পাম গাছের নিচে থামাল গাড়িটা। গাড়ির ছাদ থেকে বোটটা নামানো হলো, মাস্তুল খাড়া করে পাল লাগানো হলো দ্রুত হাতে। পানিতে নেমে মাইক আর গোনজালেস, দু'জনকেই বোট চালানো শেখাল কাসিম। কাজটা কঠিন কিছু নয়, আধ ঘণ্টার মধ্যেই টিলার সামলানোর কৌশলটা রপ্ত করে নিল ও। সবশেষে মাইককে শেখাল কিভাবে একটা বোট উল্টে দিতে হয়।

দুপুরের দিকে বোট নিয়ে একা রওনা হয়ে গেল মাইক। সাগরের বুক ধরে কখনও এঁকেবেঁকে, কখনও ধনুকের মত বাঁক নিয়ে ছুটল তার বোট, যেন কত দক্ষ নাবিক সে।

কালাহান বীচ-এর সামনে চলে এল মাইক, দেখে মনে হলো বোটের ওপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, সরাসরি একটা বয়ার দিকে ছুটছে। বয়ার সাথে সংঘর্ষ ঘটলে পানির নিচে শার্ক নেট ছিঁড়ে যেতে পারে।

সামান্য কয়েক ইঞ্চির জন্যে সংঘর্ষ হলো না। বোট ঘুরে গেল, এবার সোজা ছুটে এল সৈকতের দিকে।

লাঞ্চের আগে হুইস্কি নিয়ে টেরেসে বসেছে স্যাম বুলহ্যাম, এই সময় বোটটা সৈকতের কাছাকাছি পানিতে দেখা গেল। প্রথম দিকে তেমন মনোযোগ দিল না সে, ভেরোনিকার উদ্দেশে শুধু একটা মন্তব্য করল। তার পাশেই বসে আছে মেয়েটা। 'ব্যাটা নাবিক না ছাই।'

বয়ার সাথে সংঘর্ষ হলো না দেখে দ্বিতীয়বার বলল সে, 'লোকটা ছাগল নাকি! আরেকটু হলেই মরতে বসেছিল!'

আর ঠিক সেই মুহূর্তে, যেন বাতাসের ধাক্কায়, কাত হয়ে পড়ল বোট। নাবিক মাস্তুলের কাছ থেকে সরে না গিয়ে, সেটার দিকেই কাত হলো। তারই সাথে আরও কাত হতে শুরু করল মাস্তুল। 'রামগাধা, করে কি!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল স্যাম বুলহ্যাম। 'উল্টো দিকে কাত হ ব্যাটা!'

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না, উল্টে গেল বোট। পানিতে মাথা দিয়ে ডাইভ দিল ছোকরা। পালটা ভেসে থাকল পানিতে, বোটটা উল্টো হয়ে ভেসে রয়েছে। ভেরোনিকা আর বুলহ্যাম তাকিয়ে থাকল। বুলহ্যাম এতক্ষণে কৌতুক বোধ করছে, ভেরোনিকা নির্লিপ্ত। প্রায় এক মিনিট পর লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বুলহ্যাম। 'সর্বনাশ, ভেরোনিকা! লোকটা তো উঠল না!'

তারপর দেখা গেল নাবিককে, পানির ওপর ভাসছে তার নিথর দেহ,

মুখটা পানির নিচে।

ইতোমধ্যে গুইসেপির নাম ধরে হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিয়েছে বুলহ্যাম। বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে এল গুইসেপি, তাকে সাথে নিয়ে সৈকতের দিকে ছুটল বুলহ্যাম, পানির কিনারায় তাদের ছোট্ট বোটটা পড়ে রয়েছে।

লাফ দিয়ে বোটে চড়ল ওরা, প্রথম বারেই আউটবোর্ড মটর স্টার্ট নিল, উল্টে পড়া সেইল বোট লক্ষ্য করে ছুটল। সেইল বোটের কাছে এসে দেখল ওরা, নাবিকের জ্ঞান প্রায় নেই বললেই চলে, সাঁতার দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সে।

বোটে তোলা হলো তাকে, সৈকতে ফিরে এল ওরা। মাইককে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে বোট থেকে নামল গুইসেপি। 'গেস্টরুমে শোয়াও ওকে,' নির্দেশ দিল বুলহ্যাম। ছোট্ট কুঁড়েঘরের ভেতর ঠাঁই পেল মাইক, বিছানায় শুয়ে গোঙাতে লাগল সে। ঘরের ভেতর ঢুকল বুলহ্যাম, গোঙানির শব্দ শুনতে পেল। 'খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে দাও,' বলল সে। চোখ দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে মাইকের। 'বোট থেকে লাফ দেয়ার সময় নিশ্চয়ই মাথায় আঘাত পেয়েছ তুমি,' তাকে বলল বুলহ্যাম। 'চিন্তা কোরো না, তোমার বোটটা সৈকতে এনে দেয়া হবে।'

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে ক্ষীণ হাসল মাইক, তারপর চোখ বুজল। তার গলা পর্যন্ত চাদরে ঢেকে দিল গুইসেপি। 'স্যার, আপনার কি মনে হয়, ডাক্তার ডাকা দরকার?' জিজ্ঞেস করল সে। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল বুলহ্যাম। বাইরে বেরিয়ে এসে কুঁড়েঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল ওরা। সেইল বোটটা উদ্ধার করে আনার জন্যে গুইসেপিকে নির্দেশ দিয়ে টেরেসে ফিরে এল স্যাম বুলহ্যাম।

আগের চেয়ে ম্লান হয়ে গেছে ভেরোনিকার চেহারা, যদিও নিজের চেয়ার ছেড়ে নড়েনি সে। 'খানিক পরই সুস্থ হয়ে উঠবে,' বুলহ্যাম বলল। 'নিশ্চয়ই মাথায় আঘাত পেয়েছে।'

'ওকে তুমি এখানে থাকতে দেবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল ভেরোনিকা।

'আনাড়ি লোক, দুর্ঘটনায় পড়েছে, দু'এক ঘণ্টা ঘুমোয় ঘুমাক না। ভাবছি এ-ধরনের লোককে সেইলবোট দেয়া হয় কেন!'

বালতি থেকে দু'টুকরো বরফ তুলে বুলহ্যামের গ্লাসে ফেলল ভেরোনিকা।

'বিকেলের ফ্লাইটে একদল ভদ্রলোক আসছেন,' বলল বুলহ্যাম। 'কাজেই আজ সন্ধেটা খুব ব্যস্ত থাকব আমি।'

'ব্যস্ত থাকবে কি নিয়ে—ব্যবসা, নাকি ফুর্তি?'

'তোমার জানতে চাওয়ার কারণ কি?'

'না, এমনি কৌতূহল।'

'অকারণ কৌতূহল ভাল নয়, বুঝলে। তোমার পাওনা তুমি ঠিকই পেতে থাকবে, কাজেই অন্য কোন বিষয়ে মাথা ঘামিয়ো না, কেমন?'

বুলহ্যামের দিকে সরাসরি তাকাল ভেরোনিকা। চেয়ার জুড়ে থলথলে

মাংসের একটা স্তূপ, নধর শূকরের মত। বিজয় আর কৃতিত্বের হাসি হাসছে। শুধু যদি আসল ঘটনাটা জানত এই লোক! তার ধারণা, মরদ হিসেবে তার জুড়ি নেই! এই ধারণাটা পেতে ভেরোনিকাই তাকে সাহায্য করেছে। কারণ ওর টাকা দরকার। যতবারই বিছানায় মিলিত হয়েছে ওরা, পূর্ণ তৃপ্তির অভিনয় করে গেছে ও। ভাব দেখিয়েছে, এমন সক্ষম আর বলিষ্ঠ পুরুষ তার জীবনে আর আসেনি। অভিনয়টা করার দরকার ছিল, খুব কম পুরুষই তার যৌন অক্ষমতার অভিযোগ সহ্য করতে পারে।

'এত কিসের কাজ তোমার, স্যাম?' জানতে চাইল সে, কৌতূহলটা নির্ভেজাল। 'মানুষ ছুটিতে এসে বিশ্রাম নেয়, ঘুরে বেড়ায়, হেসে-খেলে সময় কাটায়। কিন্তু তুমি তো দেখছি সারাক্ষণই ব্যস্ত। এমন একটা দিন নেই যেদিন লোকজন তোমার সাথে দেখা করতে আসছে না। নিউ ইয়র্ক, লন্ডন আর সুইজারল্যান্ডের সাথে ফোনে কথা বলো দিনের মধ্যে চার-পাঁচ ঘণ্টা। ব্যাপারটা কি বলো তো? তুমি কি আসলে ছুটি কাটাতে আসোনি?'

'তুমি আমার ওপর নজর রাখছ নাকি, অ্যাঁ? এত খবরে তোমার দরকার কি?'

'দরকার নয়, কৌতূহল।'

'বিড়ালটা মারা গিয়েছিল কৌতূহলের কারণে, মনে নেই?'

'কিন্তু কারণটা কি, স্যাম? তুমি ছুটিতে এসে এমন করছ কেন?'

হাত বাড়িয়ে বোতলটা ট্রলি থেকে তুলল বুলহ্যাম, নিজের গ্লাসে আরও খানিকটা হুইস্কি ঢালল। কথা না বলে তার গ্লাসে আরও দু'টুকরো বরফ ফেলল ভেরোনিকা। 'শোনো, তাহলে সত্যি কথাটাই বলি তোমাকে।' ঢক ঢক করে আধ গ্লাস হুইস্কি গিলে শার্টের আস্তিন দিয়ে মুখ মুছল বুলহ্যাম। 'বয়স হবার পর থেকে জীবনের সারবস্তু হিসেবে মাত্র একটা জিনিসকে চিনেছি আমি। সেটা হলো, টাকা। কোন ব্যবসায় লাভ হলে, আমার যে আনন্দ হয়, তার সাথে একমাত্র শুধু মিলনের চরমানন্দের তুলনা চলে।'

'কেন, আমি তোমাকে সুখী করতে পারছি না?'

'সে-কথা বলছি না। তুমি আমার জীবনে খুব ভাল মেয়েদের মধ্যে অন্যতম। তোমার পিছনে আমার খরচের প্রতিটি টাকা আমি উসুল করছি।' গলা ছেড়ে হেসে উঠল বুলহ্যাম। 'তোমাকে ভোগ করা দারুণ অভিজ্ঞতা, কিন্তু টাকা রোজগার করা আরও দারুণ অভিজ্ঞতা।'

'তুমি অদ্ভুত এক মানুষ, স্যাম।'

গ্লাসটা শেষ করল বুলহ্যাম। 'এবার আমাকে উঠতে হবে। দু'জন ভদ্রলোক আসছেন,' বলল সে।

'কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'কি ব্যাপার? এখনও তোমার চাহিদা মেটেনি মনে হচ্ছে?'

'তুমি চলে গেলে আমার একঘেয়ে লাগে, একা থাকতে ভাল লাগে না।'

'শোনো, খুব বেশি হলে দু'ঘণ্টা লাগবে আমার। ফিরে এসে লাঞ্চ সারব, আর তারপর স্যাম বুলহ্যাম তোমাকে নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠবে—কথা

দিলাম। দেখবে, তোমার কত যত্ন নেয় এই বান্দা।'

'আমি অপেক্ষা করতে পারি না,' আদুরে গলায় বলল ভেরোনিকা।

সেইলবোটটা উদ্ধার করে সৈকতে আনার পর উর্দি অর্থাৎ খাকি ট্রাউজার আর ডেনিম শার্ট পরেছে গুইসেপি, ভাড়া করা ক্যাডিলাকটা বের করেছে গ্যারেজ থেকে, গাড়ির এয়ারকন্ডিশনিং ইউনিট অন করে রেখেছে। সাদা শার্ট আর গাঢ় নীল ট্রাউজার পরে বেরিয়ে এল বুলহ্যাম, টেরেস হয়ে নামার আগে ভেরোনিকার কাঁধ ধরে চাপ দিল। তার দিকে নিঃশব্দে, কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। ক্যাডিলাক চলে যাবার পর কাঁধটা একহাতে কিছুক্ষণ ডলল সে, বিড়বিড় করে বলল, 'বুনো মোষের মত শক্তি, শুধু আসল সময়ে কাদা।' বিকেলের প্লেন এখনও পৌঁছুনোর সময় হয়নি, তাহলে কার সাথে দেখা করতে গেল সে? প্লেনটা আসবে তিনটের সময় রহস্যটা বুঝতে না পেরে স্যাম বুলহ্যামের চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দিল সে। আরও কয়েক মিনিট টেরেসে কাটিয়ে বেডরূমে চলে এল, তারপর শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল। মাখন রঙা নরম শরীরটায় সাবান ঘষল ভেরোনিকা, লেবুর গন্ধটা উত্তেজিত করে তুলল তাকে। বিবস্ত্র অবস্থায় ফিরে এল বেডরূমে, গায়ে জড়াল সিল্কের আলখেল্লা, ভেতরে আন্ডারঅয়্যার পরল না। মাথায় চওড়া কার্নিসের একটা হ্যাট পরে বাড়িময় ঘুরে বেড়াল সে। তারপর টেরেসে বেরিয়ে এল, সিঁড়ি বেয়ে নামল নিচে, বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলে এল কুঁড়েঘরটার সামনে। ছোকরা নাবিককে এখানেই ঠাঁই দিয়েছে গুইসেপি।

গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকল ভেরোনিকা। কান দুটো সজাগ। ভেতর থেকে কোন শব্দ আসছে না। কিচেন রূমের পিছনের একটা গাছে কাঠঠোকরা শব্দ করছে, গোটা বাড়িতে আর কোন আওয়াজ নেই। কিচেনটা বাড়ির প্রধান অংশের বাইরে, ফরমিকো সেখানে লাঞ্চ তৈরিতে ব্যস্ত, এদিকে তার আসার কোন কারণ নেই। বুলহ্যামকে নিয়ে শহরের দিকে গেছে গুইসেপি। ফরমিকোর বোন আসবে লাঞ্চ পরিবেশনের সময়, এখনও তার অনেক দেরি আছে। কুঁড়েঘরের মাথার ওপর পামগাছের পাতাগুলো খসখসে আওয়াজ তুলে ওকে যেন প্ররোচিত করল, সমগ্র অস্তিত্ব শিরশির করে উঠল ভেরোনিকার। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে।

বিছানায় শুয়ে আছে মাইক, চিৎ হয়ে, এর আগেও ঠিক এই ভঙ্গিতে যেমন তাকে দেখেছে ভেরোনিকা। চোখ বন্ধ করে রেখেছে, তবে ওটা একটা পুরানো কৌশল তার। ভেরোনিকার ইচ্ছে হলো ঘুরে দাঁড়ায়, ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। পরিচিত ঘৃণাবোধটা অনুভব করল সে, কিন্তু ইচ্ছা শক্তির চেয়েও প্রবল একটা শক্তি তাকে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে এল।

ঝট করে চোখ খুলেই নিঃশব্দে হাসল মাইক।

'ঠিক ধরেছি আমি,' বলল ভেরোনিকা। 'তুমিই তাহলে!'

'হ্যাঁ, আমি।'

'তোমাকে আমি চিনতে পেরেছিলাম...।'

'পারবে জানি বলেই তো আমার আসা।'

'তারমানে দুর্ঘটনা ছিল না ওটা?'

'ছিল না।'

'এখানে কি চাও তুমি?' বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল ভেরোনিকা। ঈশ্বর, কেন এসেছে ও? বুলহ্যামের কাছ থেকে দু'হাতে টাকা খসিয়ে নিচ্ছে সে, এভাবে আরও ক'টা দিন চালিয়ে যেতে পারলে বেশ কিছুদিন তার কোন অভাব থাকবে না। প্রয়োজনীয় টাকা হাতে এলেই শুয়োরটাকে লাথি মেরে ইউরোপে ফিরে যাবে সে। লন্ডনই তার আসল ঠিকানা, শিকার খুঁজে পেতে কোন ঝামেলা হয় না। 'বোট নিয়ে কি করছিলে?'

নিঃশব্দে হাসল মাইক, মুখ খুলে।

তার মুখের ভেতরটা দেখতে পেয়ে ভেরোনিকার শরীর শিরশির করে উঠল।

'কেন আবার, তোমাকে দেখার জন্যে। তোমাকে পাবার জন্যে।'

'না। সম্পর্কটা শেষ হয়ে গেছে।' বলল বটে, কিন্তু চাদর মোড়া বলিষ্ঠ, পেশী বহুল শরীরটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ভেরোনিকা, চোখ ফেরাতে পারছে না। সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল সে, ঢোক গিলল। 'তুমিও জানো, তোমার সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। তোমাকে তো আমি কম টাকা দিইনি।'

ভেরোনিকার ঠোঁটের দিকে তাকাল মাইক। লক্ষ করল, জিভের ডগাটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে ভেরোনিকা। 'টাকা নয়, টাকার ওপর আর আমার লোভ নেই।'

'তাহলে আর কি চাও তুমি? আমাকেও তো অনেকবার পেয়েছ। এখনও সাধ মেটেনি?'

'হ্যাঁ, অনেকবার পেয়েছি, সত্যি। কিন্তু ব্যাপারটা সবে শুরু হয়েছে। আমরা তোমাকে আরও চাই।'

'আমরা?'

'আমি আর সে,' বলে নিজের বুক আর তলপেটের নিচেটা আঙুল দিয়ে দেখাল মাইক। আশ্চর্য, ইঙ্গিতটা ভেরোনিকার অশ্লীল লাগল না। কি যেন মনে পড়ে যাওয়ায় কেঁপে উঠল তার শরীর।

'তুমি যে গোরা লোকটার সাথে বাস করছ,' জিজ্ঞেস করল মাইক, চোখ দুটো চকচক করছে, 'সে কি তোমাকে আনন্দ দিতে পারে? আমি যতটা পারি?'

'তাকে কোন টাকা দিতে হয় না আমার।'

'টাকা এখন আমাকেও তোমার দিতে হবে না।'

হাসল ভেরোনিকা, আড়ষ্ট ও ভঙ্গুর হাসি। তার চোখ দুটো বুভুক্ষুর মত তাকিয়ে আছে, ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছে মুখ, বিছানার দিকে নিজের অজান্তেই ঝুঁকে পড়ল শরীরটা। 'তাহলে বলব তুমি বদলে গেছ। টাকা ছাড়া আর কিছু চিনতে না তুমি। টাকা টাকা করে পাগল বানিয়ে দিয়েছিলে আমাকে।'

চাদর থেকে একটা হাত বের করল মাইক। নরম করে হাসল।

'তোমাকে তো বলল্যামই, হোয়াইট লেডি, তোমাকে পাবার জন্যে পাগল হয়ে আছি আমরা—আমি আর সে।'

মিলনের শেষ দিকে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলল ভেরোনিকা, জোরে জোরে গোঙাতে শুরু করল, গলায় পরেছে সুইজারল্যান্ড থেকে আনা গোনজালেসের তৈরি সোনার একটা লকেট।

লকেটের আইডিয়াটা রানার মাথা থেকে বেরোয়। ভেরোনিকা মাইককে টাকা দিত, এখন আগ্রহটা যেহেতু মাইকের বেশি, সে কেন ভেরোনিকাকে একটা কিছু উপহার দেবে না?

এগারো

রাতের কালো একটু ঘন হতেই পানি থেকে মাথা তুলল গোনজালেস। ব্রিদিং মাস্ক আর ফ্লিপার পরে আছে সে, উপকূল রেখা ধরে শান্তভাবে সাঁতার কেটে এগোচ্ছে। নির্জন সৈকতের কিনারায় এসে মাস্ক আর ফিন খুলে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখল সে, সুইমিং পুলের পাশ ঘেঁষে বাড়িটার দিকে এগোল। অতিথিদের নিয়ে বাড়ির সামনের দিকে ডিনারে বসেছে স্যাম বুলহ্যাম, এদিকে কারও খেয়াল নেই। ধাপ টপকে টেরেসে উঠে পড়ল গোনজালেস, এখান থেকেই মাইকেল ডগলাসের বোটটাকে উল্টে যেতে দেখেছিল বুলহ্যাম। বরফের বালতিটা এখনও সেই জায়গাতেই রয়েছে।

সুইমিং ট্রাঙ্কের ওয়াটারপ্রুফ পকেট থেকে ম্যাগনেটিক মাইক্রোফোনটা বের করল গোনজালেস। পলিথিন মোড়ক খুলে বালতির তলায় আটকে দিল। জিনিসটার সামনে চুটকি বাজাল সে, তিন ফুট দূর থেকে আরেকবার। দু'বারই সাগরের বুকে ভাসমান বোট থেকে মিটমিট করে উঠল একটা আলো। শার্ক নেট ধরে রাখা বয়ার খানিক সামনে রয়েছে বোটটা। টেরেসের দরজার কাছে এসে আরেকবার চুটকি বাজাল সে। আবার মিটমিট করল আলো। ধাপ বেয়ে নিঃশব্দে নেমে এল সে, সৈকত পেরিয়ে চলে এল সাগরে।

মিনিট দশেক সাঁতার দেয়ার পর অন্ধকারে বোটটা দেখতে পেল গোনজালেস। বোটে উঠতে সাহায্য করল তাকে কাসিম। সীটের ওপর নেতিয়ে পড়ল গোনজালেস, তার হাতে গরম এক কাপ কফি ধরিয়ে দিল কাসিম। কফিটা শেষ করে বোটের আরেক দিকে চলে এল গোনজালেস, কালো বাক্সটার ওপর হাত রাখল। বাক্সটার পাশে একটা টেপ রেকর্ডার রয়েছে, অন করা। মাইক্রোফোনের কাছাকাছি দুই কি তিনজন কথা বলছে। 'মেয়েটা লকেট পরে আছে,' বলল সে, মাথা ঝাঁকাল কাসিম। 'ওদের সব কথা আমি রেকর্ড করে নিচ্ছি।'

বোটের পিছনে এসে পানিতে ছিপ ফেলল গোনজালেস, তারপর বলল, 'এবার তুমি এঞ্জিন স্টার্ট দিতে পারো।'

ফিশিং রড পানিতে ফেলে সাগরের বুকে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল বোট। আশপাশে আরও কয়েকটা মাছ ধরার বোট রয়েছে, কোন কোনটায় সৌখিন ট্যুরিস্টরা স্থানীয় গাইডদের সাহায্যে মাছ ধরছে। কালাহান বীচের সামনে চলে এল ওদের বোট, বয়ার একেবারে কাছাকাছি। দূরের কয়েকটা বোটে আলো জ্বলছে, তবে তিনশো গজের মধ্যে আর কোন বোট নেই। অন্যান্য বোট বা সৈকত থেকে এদিকে কেউ তাকালেও দেখতে পাবে না কি করছে ওরা।

পানি থেকে আঠারো ইঞ্চি উঁচু হয়ে আছে বয়াটা, ওটার সাথে কোন আলোর ব্যবস্থা নেই। আঙুলের টোকা দিল গোনজালেস, ফাঁপা একটা আওয়াজ হলো। 'ভাগ্যই বলতে হবে যে জিনিসটা ফাইবার গ্লাস নয়,' বলল সে, তবে এ-ধরনের টেকনিক্যাল ব্যাপার কিছুই বোঝে না কাসিম। 'ম্যাগনেট শুধু লোহার সাথে আটকায়।' ক্যানভাস ব্যাগ খুলে প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনটা বের করে তেপায়া স্ট্যান্ডের সাথে আটকাল, প্রতিটি পায়া ম্যাগনেটাইজড, স্ট্যান্ডটা বয়ার সংস্পর্শে আসা মাত্র ক্লিক করে একটা শব্দ করে আটকে গেল। বোটের মেঝেতে শুয়ে পড়ল গোনজালেস, মাইক্রোফোনে ফিট করা অ্যাপারচার আর সাইটে চোখ রেখে তাকাল, তারপর খাঁজ কাটা দুটো হুইলের স্ক্রু ঢিলে করে মাইক্রোফোনটাকে বন্দুকের মত ঘোরাল, একদিক থেকে আরেক দিকে, লক্ষ্যস্থির করল কালাহান বীচের দিকে, সৈকতের মাঝামাঝি জায়গায়। অ্যাডজাস্ট হয়েছে বুঝতে পেরে হুইলের স্ক্রুগুলো আবার এঁটে দিল সে। কাজ শেষ, বয়াটা ছেড়ে দিল এবার। এখন যেদিকে মুখ করেই দুলুক ওটা, মাইক্রোফোনটা নির্দিষ্ট একটা দিকে তাক করা অবস্থায় থাকবে।

মাইক্রোফোনটার মান উন্নত করা হয়েছে পাখির গান শোনার জন্যে। এই যন্ত্র দিয়ে বসন্তের শুরুতে প্রথম কোকিলের ডাক শোনা যাবে, যদি ঠিকভাবে তাক করা থাকে। মাইক্রোফোনটার সাথে ব্যাটারিচালিত নিজস্ব ট্র্যান্সমিটার রয়েছে, বোটে রয়েছে রিসিভার, ওটা তিনটে মাইক্রোফোনেরই ইনপুট গ্রহণ করতে পারে—একটা রয়েছে ভেরোনিকার বুকের মাঝখানে, দ্বিতীয়টা বালতির তলায়, প্যারাবোলিকটা বয়ার গায়ে।

ক্লাচ ছেড়ে দিল কাসিম, বয়া থেকে পাঁচশো গজ পিছিয়ে এল বোট। এঞ্জিন বন্ধ করে দিল সে। নিস্তব্ধতা নেমে এল শান্ত সাগরের বুকে, স্যাম বুলহ্যাম আর তার অতিথিদের কথাবার্তা শোনার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল ওরা।

ডিনারের সময় গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা হলো না। তবে বোঝা গেল, অতিথিদের মধ্যে তিনজন পুরুষ, তিনজন মহিলা। ছুটিতে এসে লোকজন যেমন হালকা মেজাজে থাকে, এদেরকেও সেরকম লাগল। নিজেদের মজার মজার গল্প শোনাচ্ছে। যত না কথা হলো, তারচেয়ে বেশি হলো হাসাহাসি।

ডিনারের পর জাল দিয়ে ঘেরা বারান্দা থেকে বেরিয়ে গেল পুরুষরা। বালতিতে লাগানো মাইক্রোফোনটার বোতাম টিপল গোনজালেস।

কোন অশ্লীল গল্প বলা হলো না। প্রত্যেককে স্কচ হুইস্কি পরিবেশন করল বুলহ্যাম। মাঝখানে টেবিল, গোল হয়ে বসেছে তারা; বরফ ভরা বালতি ও মাইক্রোফোনের কাছাকাছি।

পুরুষরা যখন জায়গা বদল করছিল, সেই সুযোগে রেকর্ডারের ক্যাসেটটা বদলে দিয়েছে গোনজালেস।

কথাবার্তার সুর থেকে বোঝা গেল পুরুষ অতিথিদের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধিত্ব করছে। আরও টাকা চাইল সে। কিন্তু আরও টাকা দিতে রাজি নয় বুলহ্যাম। সে বলল, 'আমি জানব কিভাবে, পদ্ধতিটা কাজ করবে? প্রথমবারেই তো তোমরা লেজেগোবরে করে ছেড়েছ!'

প্রতিনিধি শান্তভাবে ব্যাখ্যা করল, 'হঠাৎ যদি কারও অ্যাপেনডিক্স ফেটে যায়, সেটা কি আমাদের দোষ? যে-কোন যুক্তিতে প্লেনটার ওই সময় ত্রিশ হাজার ফুট ওপরে থাকার কথা ছিল। ভাগ্যটা এতই খারাপ যে নিস থেকে টেক-অফ করার সময়ও বেঁচে গেল ওরা, শুধু টাওয়ার অনুমতি দিতে দেরি করায়।'

পাওয়ার হারিয়ে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল অচিন পাখি, কিন্তু সেটা ওদের কৃতিত্ব, না সাধারণ কোন যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ঘটেছিল, বুলহ্যাম বুঝবে কিভাবে? চুক্তি অনুসারে কাজ হয়নি, এরপর ওদেরকে বিশ্বাস করা যায় কি? এরই মধ্যে মাথাপিছু পাঁচ হাজার স্টার্লিং করে নিয়ে গেছে ওরা। একটা অচিন পাখি আকাশ থেকে খসে পড়লে মাথাপিছু আরও বিশ হাজার করে পাবে। কিন্তু পড়ল তো না। বাকি টাকা দেয়ার কথা তদন্তের পর, যখন প্রমাণ হবে যে প্লেনটায় কোন রকম স্যাবোটাজ করা হয়নি, দুর্ঘটনা ঘটেছে ডিজাইনজনিত ত্রুটির কারণে।

'শোনো, ভায়েরা,' বলল বুলহ্যাম। 'আমি যদি শুধু একটা প্লেন নষ্ট করতে চাইতাম, কোন আরোহীর ব্যাগে একটা বোমা ভরে দিলেই হত। পানির মত সহজ, তাই না? কিন্তু আমি তা চাইছি না। আমি চাইছি একটা অসিন পাকি আকাশ থেকে খসে পড়বে, বিধ্বস্ত হবে, কিন্তু সবাই জানবে ডিজাইনে ত্রুটির জন্যে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছ তোমরা। কিন্তু এখন পর্যন্ত ঘটনাটা ঘটাতে পারোনি। কাজেই আরও টাকা চাওয়ার কোন মানে হয় না।'

আরও খানিকক্ষণ তর্ক করল ওরা, অবশেষে হার মানল বুলহ্যাম। 'ঠিক আছে, আরও এক হাজার করে দিচ্ছি তোমাদের। বলছ উইলিয়ামের আরও দু'হাজার লাগবে, খরচাপাতির জন্যে? বেশ। কিন্তু মনে রেখো...।'

নামটা নোট করল গোনজালেস, উইলিয়াম। বাকি নামগুলোও লিখে ফেলল সে। পিটার আর ডিক। খানিক পর বুলহ্যাম বলল, 'আমার হাঁটাহাঁটি দরকার, একটু বোধহয় বেশি খেয়ে ফেলেছি।'

উইলিয়াম বলল, সে-ও তার সাথে যাবে।

বাথরুমটা কোন্‌দিকে ডিককে জানিয়ে দিয়ে উইলিয়ামকে নিয়ে টেরেস থেকে নেমে পড়ল বুলহ্যাম। বালতির মাইক্রোফোন ওদের নাগাল পেল না।

প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনের সুইচ অন করল গোনজালেস। বুলহ্যাম আর উইলিয়ামের গলা স্পষ্ট শুনতে পেল সে। 'ডিক্ একটা সমস্যা হয়ে উঠছে,' বলল বুলহ্যাম। 'ওকে তুমি সামলাতে পারবে তো?'

'ওকে সামলানো কোন সমস্যা নয়।'

'তাহলে সামলাও!' একটু রাগের সাথে বলল বুলহ্যাম।

'অনেক আগেই একটা ব্যবস্থা করতাম, কিন্তু ওকে আমাদের দরকার হতে পারে। রোমের ঘটনাটা ভেবে দেখুন, সে-ই তো কাজটা সারল, প্লেনটা হ্যাঙ্গারে থাকা অবস্থায়।'

'অন্য লোকটা, পিটার, ওটার কোন গুরুত্ব নেই। ওকেও কি রাখছ তুমি?'

'হ্যাঁ, ওকেও আমার দরকার।'

'কি বলতে চাও, দরকার?' জিজ্ঞেস করল বুলহ্যাম, হঠাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

'পিটার আমার বীমা। জানা কথা, কাজটা আমরা করতে পারলে আপনার কাছ থেকে প্রচুর টাকা পাব। সেই সাথে জানতে পারব, কিভাবে কি করেন আপনি। আমাদের এই জানাটা আপনার জন্যে বিপজ্জনক হতে পারে, বিপদ দূর করার জন্যে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু একটা করতেও পারেন আপনি। করাই স্বাভাবিক, কারণ তাতে আপনার টাকাও বাঁচবে।'

'দেখো, ভুলে যেয়ো না, অতি চালাকের গলায় দড়ি। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে আমার ক্ষতি করতে পারবে তোমরা, এ আমি জানি। সে জন্যেই তোমাদের আমি এত বেশি টাকা দিচ্ছি। কাজটা যাতে তোমরা নিখুঁতভাবে করো। তবে, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ওদের দু'জনকে বাদ দাও। আর, আমার সাথে বেঈমানী করার কোন চিন্তা মাথায় রেখো না। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'এবার বলো, কাজটা কিভাবে করবে বলে ভেবেছ?'

'সেটা আমার ব্যাপার।'

'ফর গডস সেক, দেখে মনে হতে হবে ন্যাচারাল।'

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন।'

'বলতে পারবে, রাখিনি? এই মুহূর্তে আকাশে একটাই মাত্র অসিন পাকি রয়েছে, কাজেই ওটাকে খসাতে হবে।'

'তা ঠিক। কাজটা আমরা এখানে, জ্যামাইকায় করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্লেনটা এখানে নিয়ে আসুক ওরা। তাতে ওদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে। তারপর যা করার করব আমরা, ওদের চোখের সামনে। ওটাকে আর লন্ডনে ফিরে যেতে হবে না।'

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। দু'জনেই কি যেন ভাবছে।

'শালারা হেভি মদ গিলেছে, স্যার,' বলল কাসিম।

'স্‌স্‌!' ঠোঁটে আঙুল রাখল গোনজালেস। 'আবার কথা বলছে ওরা!'

'তোমার খারাপ লাগে না,' জিজ্ঞেস করল বুলহ্যাম। 'লোকজন ভর্তি একটা প্লেন আকাশ থেকে ফেলে দেয়ার প্ল্যান করছ?'

'খারাপ লাগবে? কেন? আমার টাকা দরকার। পকেট খালি থাকলেই বরং খারাপ লাগে আমার।'

'আমার একটু সন্দেহ হয়, উইলিয়াম। তুমি কি একা শুধু আমার কাছ থেকে টাকা খাচ্ছ? আমি তোমাকে অনেক টাকা দিচ্ছি বটে, কিন্তু আমার টাকাটাই কি সব?'

মুচকি হাসল উইলিয়াম। 'আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি কোন কৌতূহল প্রকাশ করিনি, আমি আশা করব আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনিও কোন কৌতূহল প্রকাশ করবেন না।'

'তুমি জানো, টাকার প্রতি অসম্ভব লোভ আছে এরকম তিনজন লোককে ইস্পাত বাংলা থেকে খুঁজে বের করতে কত কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে? আই বি এ তার প্রতিটি কর্মচারীর জন্যে একটা করে সাইকোলজিক্যাল রিপোর্ট তৈরি করে। সেই রিপোর্টের কপি সংগ্রহ করতে হয়েছে আমাকে। ভাবাবেগজনিত ভারসাম্যহীনতা আছে এমন লোকদের খুঁজছিলাম আমি। কমপিউটর প্রথমেই তোমাদের তিনজনের নাম জানিয়ে দিল। আই বি এ বিদেশী একটা প্রতিষ্ঠান, তরতর করে উঠে যাচ্ছে, এটাই কি তোমাদের ঘৃণার কারণ?'

'ভাবাবেগজনিত ভারসাম্যহীনতা, তাই না? অর্থাৎ কমপিউটর আপনাকে সাবধান করে দিয়েছে, আমাদের সাথে বেশি চালাকি করতে যাওয়াটা বোকামি হবে। আমরা পাগলা টাইপের লোক, যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারি।'

হেসে উঠল বুলহ্যাম। 'পরস্পরের বন্ধু আমরা, পরস্পরের উপকার করছি, ব্যস।' একটু থেমে প্রস্তাব দিল সে, 'উইলিয়াম, তোমার গরম লাগছে না? চলো, কিছুক্ষণ সাঁতরানো যাক।'

'ধন্যবাদ, না। এদিকের পানিতে বড় বেশি হাঙর বাস করে। অবশ্য ডাঙাতেও দু'একটা আছে।'

আবার হেসে উঠল স্যাম বুলহ্যাম, চর্বিবহুল হাত দিয়ে চাপড় মারল উইলিয়ামের কাঁধে। টেরেসের দিকে ফিরছে ওরা। খানিক পর তার গলা শোনা গেল, 'আলোচনা শেষ হয়েছে, ভায়েরা। এসো, সন্ধেটা ফুর্তির মধ্যে কাটানো যাক। মেয়েদের পিছনে কারও কোন খরচা নেই, আমার তরফ থেকে ওরা তোমাদের জন্যে উপহার। বিশ্বাস করো এককেটা খাসা জিনিস।'

'সবগুলোকে টেস্ট করেছেন বলে মনে হচ্ছে?' জানতে চাইল ডিক।

'খুব একটা ভুল বলোনি, ডিক। বলতে পারো, ওদের সম্পর্কে যা কিছু জানার সবই আমি জানি।'

বাড়ির ভেতর ঢুকল ওরা, বালতির মাইক্রোফোনটা অন করল গোনজালেস। এটার মাধ্যমেও কথাবার্তার আওয়াজ ভালভাবে শোনা গেল তবে

প্যারাবোলিকের মত অতটা স্পষ্ট নয়। পুরুষরা মেয়েদের সাথে মিলিত হলো ওখানে।

'চলো, গোল্ডবার-এ যাই,' প্রস্তাব দিল ভেরোনিকা।

কিন্তু রাজি হলো না স্যাম বুলহ্যাম। 'বেজন্মা কালা আদমীরা চারপাশে ঘুরঘুর করবে, ইচ্ছামত যা খুশি তাই করার সুযোগ নেই ওখানে। উঁহুঁ, যদি মজা করতে চাও তো এখানেই। নাও, শুরু করো, মেয়েরা আগে—ঝটপট কাপড় খুলে ফেলো!'

মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে দিল গোনজালেস, ওর ধারণা তা না হলে মি. মাসুদ রানা অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

ভুল করল গোনজালেস। এই সময়ে ডিক একটা পরামর্শ দিল উইলিয়ামকে, শুনতে পাওয়া উচিত ছিল তার। এই মুহূর্তে সেক্স সেক্স খেলায় মন নেই ডিকের।

মাইকেল ডগলাসের ভাগ্যে কি ঘটেছে কেউ বলতে পারল না। সন্ধ্যার বেশ খানিক পর একটা বোট ভাড়া করেছিল সে। সারাটা সন্ধ্যা গোল্ডবারে কাটিয়েছে সে, রামের একটা বোতল বসে বসে একাই সাবাড় করেছে। বিল মেটাল নগদ টাকা দিয়ে। পরনে রয়েছে সুন্দর একটা স্যুট। 'ডাইনীটাকে আজ আমি দেখিয়ে দেব!' বলে, টলতে টলতে গোল্ডবার থেকে বেরিয়ে এল সে।

পানির কিনারায় এসে বোটটা ভাড়া করল মাইক। সন্ধের আগে থেকেই বেয়াড়া ধরনের একটা বাতাস বইছে, মতিগতি বোঝা ভার—কখনও দমকা, কখনও ঘূর্ণি।

শার্ক নেটের বাইরে বোটটাকে ওল্টানো অবস্থায় পাওয়া গেল।

কিন্তু মাইককে পাওয়া গেল না।

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি,' খবরটা শুনে মন্তব্য করল কাসিম, 'একটা হাঙরের পেটব্যথা করছে।'

বারো

লন্ডন থেকে আই বি এ-র এক্সিকিউটিভ অচিন পাখি টেক-অফ করল পরদিন বিকেলে, সরাসরি মন্টেগো বে-তে ল্যান্ড করবে, আরোহী হিসেবে রয়েছেন ষাটজন আমন্ত্রিত অতিথি। ঐতিহ্য আছে এমন সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বাছাই করা হয়েছে তাঁদের, আছেন প্রথম শ্রেণীর কমার্শিয়াল ব্যাংকের ডিরেক্টররা, ওয়াল স্ট্রীট ও স্টক এক্সচেঞ্জের হোমরাচোমরা কর্তারা, লন্ডন লয়েড-এর পরিচালক, তিনজন জার্মান ব্যারন, বোস্টনের সবচেয়ে প্রাচীন আমেরিকান পরিবারের মাথা, তিনজন ফরাসী কাউন্ট, একজন ইংরেজ ডিউক, চারজন লর্ড আর তিনজন ব্যারনেস। আরও আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন একজন

ব্রডওয়ে প্রডিউসার, একজন আমেরিকান অর্কেস্ট্রাল কন্ডাকটর, একজন সাবেক হলিউড সম্রাট, স্পেনে বসবাস করেন। বিশাল তেল খনির মালিক একজন সৌদি শেখও রয়েছেন। ডেনমার্ক থেকে এসেছেন সবচেয়ে সুখ্যাত হীরক ব্যবসায়ী। জাপানের প্রতিনিধিত্ব করছেন একজন প্রকাশক।

সোনার প্লেটে করে নাস্তা পরিবেশন করা হলো। প্লেটগুলো সালেহ চৌধুরীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দেয়া হয়েছে। একজন ইংরেজ ডিউকের সম্পত্তি, নিলামে কিনেছিলেন তিনি। সাধারণ নাস্তা, তবে সুস্বাদু। আইসক্রীম, কাজু বাদাম, ক্রীমরোল, আর কয়েক রকমের পনির। ব্র্যান্ডিসহ সব রকমের ওয়াইনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

অচিন পাখি টেক-অফ করার সময় লন্ডন এয়ারপোর্ট প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো। তবে, ফ্লাইটের গন্তব্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গোপন রাখা হলো। টেক-অফের আগে চীফ এঞ্জিনিয়ার শাহাবুদ্দিন আহমেদকে সাথে নিয়ে রানা নিজে চেক করল প্লেনটা, কাজটা করার সময় প্রফেসর গিলবার্ট ওদের ওপর নজর রাখলেন, মাঝে মধ্যেই কাজে বাধা দিয়ে ওদের হার্ট, পালস ও স্কীন টেমপারেচার পরীক্ষা করলেন। এর আগেও একবার গোটা প্লেনটাকে, লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত চেক করা হয়েছে। আই বি এ-র সশস্ত্র একটা দল টেক-অফ করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ওটাকে ঘিরে রাখল।

পাইলট আর কো-পাইলটের সাথে ককপিটে উঠলেন প্রফেসর গিলবার্ট, পাইলটের মত প্লেনের কো-পাইলটও পুরোপুরি কোয়ালিফায়েড। প্লেন চলার সময় রানার হাতে আরও একজন কোয়ালিফায়েড পাইলট থাকবে, প্লেনের সামনের একটা আসনে। সাবধানের মার নেই, বিপদের সময় তাকে দরকার হতে পারে। টেক-অফের আগে সব ক'জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হলো। পরীক্ষা করার সময় স্লো অ্যাকটিং পয়জনের কথা মনে রাখা হলো, তবে সে-ধরনের কিছুর অস্তিত্ব কারও মধ্যে পাওয়া গেল না।

তা সত্ত্বেও রানওয়ে ধরে অচিন পাখি ছুটতে শুরু করেছে দেখে ঘেমে উঠল রানা। 'এ আমার খুঁতখুঁতে স্বভাব,' নিজেকে বলল ও, মনটাকে শান্ত হতে বাধ্য করল। আকাশের অনেক ওপরে উঠে এল প্লেন, ধীরে ধীরে শিথিল হলো রানার পেশী। সীট-বেল্ট খুলে চারদিকে চোখ বুলিয়ে আরোহীদের দিকে তাকাল ও। এতগুলো স্বনামখ্যাত মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে না তো? সবচেয়ে ভাল হত যদি অচিন পাখি নিয়ে একা জ্যামাইকায় যেত ও। এতগুলো মানুষকে বিপদের মুখে ফেলা কোন যুক্তির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু মুশকিল হলো, একা প্লেন নিয়ে গেলে কোম্পানীর সম্মান ফিরে পাওয়াটা সহজ হত না। ষাটটা 'আমি প্লেনটায় ছিলাম' গল্প আই বি এ-র সুনাম শতগুণ বাড়িয়ে দেবে, সন্দেহ নেই। ষাটজন আরোহী, ষাটটা সার্টিফিকেট। তবে, রানা ভাবছে, দায়িত্বটা বিশাল, সময়টা কাটবে নরকযন্ত্রণার ভেতর। ধীর পায়ে পাইলটের কেবিনে ঢুকল ও, একজোড়া হেডফোন তুলল মাথায়, অন করল ইন্টারকমের সুইচ। ওর কব্জি ধরে পালস রেট চেক করলেন প্রফেসর গিলবার্ট। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পাইলট, ভি চিহ্ন দেখিয়ে উৎসাহিত করল

রানাকে। কন্ট্রোল ডায়াল আর সুইচগুলোর ওপর চোখ বুলাল রানা। জানে সব কিছুই ঠিকমত চলছে, তবু নিজেকে আশ্বস্ত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল। হাত বাড়িয়ে একটা বোতামে চাপ দিল সে, বাই-মেটালের দ্বারা সৃষ্ট প্রেশার জানার জন্যে। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পঞ্চাশ পাউন্ড। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক। কো-পাইলটকে ছাড়িয়ে গেল ওর একটা হাত, তাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে স্টারবোর্ড আউটার এঞ্জিনটা বন্ধ করে দিল। কো-পাইলট আর পাইলট, দু'জনেই ঝট্ করে তাকাল ওর দিকে, হতভম্ব হয়ে গেছে।

কন্ট্রোল প্যানেলে ওয়ার্নিং লাইট জ্বলে উঠল। রানার দিকে তাকাচ্ছে পাইলট, একই সময়ে তার একটা হাত পৌঁছে গেছে 'ইমার্জেন্সি ট্রিম' লেখা বোতামটায়। কাজ শুরু করল কমপিউটর, প্লেনটা নিচের দিকে সামান্য একটু কাত হয়ে পড়া ছাড়া, আর কোন পরিবর্তন ঘটার আগেই প্লেনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করল ওটা, নিরাপদ কোর্সে ধরে রাখল।

ইতোমধ্যে আরও একটা কাজ শুরু করে দিয়েছে কমপিউটর। এঞ্জিন বন্ধ হওয়ার পিছনে কোন যান্ত্রিক গোলযোগ দায়ী কিনা খুঁজে দেখছে। এক হাজার একটা জিনিস নষ্ট হয়ে থাকতে পারে, সবগুলো চেক করা হবে। প্রতিটি সেকশন চেক করছে কমপিউটর, ত্রুটি না থাকায় প্যানেলে জ্বলে উঠছে সবুজ আলো। সবশেষে দেখা গেল, মাত্র একটা লাল আলোর ওপর কোন সবুজ আলো জ্বলছে না। সুইচটার গায়ে লেখা রয়েছে অন/অফ। ওই আলোটার দিকে আঙুল তুলে রানার দিকে তাকাল পাইলট। গোটা ব্যাপারটা ঘটতে সময় নিল সাড়ে পাঁচ সেকেন্ড। আর এই সময়ের মধ্যে প্লেনটা দেড় মাইলেরও বেশি এগিয়ে এসেছে।

'অনেক বেশি সময় নিল,' ভারি, অভিযোগের সুরে বলল রানা।

'ভেবে দেখুন। লাইনের একেবারে শেষ ছিল সুইচটা। পুরোটা রুটিন শেষ করতে হয়েছে কমপিউটরকে।' কমপিউটরের হয়ে ওকালতি করল পাইলট।

'প্রোগ্রাম বদলানো উচিত,' বলল রানা। 'টেস্টিং-এর জন্যে লাইনের প্রথমে থাকা দরকার সুইচটার, শেষে নয়।'

বোতামে চাপ দিয়ে অন পজিশনে আনল রানা। আড়াই সেকেন্ডের মধ্যে চালু হলো এঞ্জিন। অন্তত, ভাবল রানা, একটা এঞ্জিনকে বাদ দিয়েও ফ্লাইট চালাতে পারব আমরা। ওর কাঁধে টোকা দিলেন প্রফেসর, বোতাম টিপে নিজেদের হেডসেট ইন্টারকানেক্ট করে নিল ওরা, যাতে একান্তে আলাপ করতে পারে। 'আপনি আমার সাথে ফিরে চলুন, পিছনে বসে আরাম করি,' প্রস্তাব দিলেন প্রফেসর। 'প্লেনের কোথাও কোন গোলমাল নেই।'

রানা ওর কথা রেখেছে, জুরিখ প্রেস কনফারেন্সে যারা উপস্থিত ছিল তারা বাদে প্লেনে আর কোন রিপোর্টারকে ওঠার সুযোগ দেয়া হয়নি। তারাও হাত মিলিয়েছে ওর সাথে। অচিন পাখিকে মাটিতে বসিয়ে রাখার নির্দেশ দুনিয়া জুড়ে দৈনিকগুলোয় সামনের পাতায় হেডিং পেয়েছে, কোন কোন পত্রিকা বড় বড় অক্ষরে ছেপেছে, 'আই বি এ-র হলো কি?' কিন্তু রিপোর্টাররা কোন

'অফিশিয়াল' বক্তব্য সরবরাহে ব্যর্থ হয়েছে। অজুহাত হিসেবে বলা হয়েছে, কথা বলার জন্যে ইস্পাত বাংলা এয়ারক্রাফটের কোন মুখপাত্রকে পাওয়া যায়নি। গুজব ছড়ানো যাদের কাজ, আজ তাদের উৎসব বললেও কম বলা হয়।

সারাটা পথ বহু কষ্টে মনটাকে শান্ত রাখল রানা, কিন্তু স্টুয়ার্ড এসে যখন জানাল যে তারা ল্যান্ডিং-এর জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে, বুকের ভেতর অকারণেই হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করল ওর। মনের ভেতর থেকে কে যেন গাইছে, বিপদ একটা ঘটবেই।

যে-কোন প্লেনের ঝুঁকির মুহূর্ত থাকে দুটো—টেক-অফ আর ল্যান্ডিং। আকাশে তারা নিরাপদেই উঠেছে। কিন্তু নামতে পারবে তো? নিজেকে বাধ্য করল রানা সীটে বসে থাকতে। দক্ষ হাতে রয়েছে প্লেন। ল্যান্ডিং হুইলের নিচে নামাটা যতটা না শুনতে পেল, তারচেয়ে বেশি অনুভব করল ও, উপলব্ধি করল ধীরে ধীরে মাটির দিকে নামছে ওরা। 'শান্ত হও,' নিজেকে বলল ও। 'কমপিউটর কোন ভুল করতে পারে না।' সম্ভবত পাইলট নিজেই ল্যান্ড করাচ্ছে অচিন পাখিকে। 'শান্ত হয়ে বসে থাকা ছাড়া তোমার কিছু করার নেই, রানা।' একই কথা বার বার বলল ও। ওর দিকে তাকিয়ে আছেন প্রফেসর, লক্ষ রাখছেন ওর ওপর। চোখাচোখি হতে জোর করে হাসল ও, অনুভব করল ঘামে ভেজা মুখটায় যেন ফাটল ধরবে। তারপর, জানালায় চোখ পড়তে দেখতে পেল, টার্মিন্যাল বিল্ডিংটাকে পাশ কাটাচ্ছে প্লেন। পরমুহূর্তে টারমাক স্পর্শ করল চাকা। চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা সশব্দে ছাড়ল রানা।

প্লেন আর প্লেনের ভেতরের সমস্ত কিছু দশ লক্ষ পাউন্ডের প্রিমিয়ামে বীমা করা হয়েছে। বীমা কোম্পানীর এজেন্ট উত্তেজনায় অসুস্থ হয়ে পড়লেও, হাতে ইন্টারন্যাশনাল স্যাটেলাইট টেলিফোনের রিসিভার নিয়ে এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে, সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে হেড অফিসের সাথে। অচিন পাখি টাচ-ডাউন করতেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ইট'স ডাউন! ইট'স ডাউন, সেফ অ্যান্ড সাউন্ড!' বীমা কোম্পানীর চেয়ারম্যান অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন তার গলা। 'ওহ্ গড, আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ!' লয়েড-এর কয়েকজন সদস্য আনন্দে পরস্পরের সাথে কোলাকুলি করলেন।

দ্বীপটায় যেখানে যত রোলস রয়েস, বেন্টলি, ক্যাডিলাক, লিংকন আর মার্সিডিজ ছিল, সব ক'টাকে কাজে লাগানো হয়েছে; এয়ারপোর্ট পোর্টারদের দেয়া হয়েছে নতুন ইউনিফর্ম। চেহারায় অস্বস্তি, চীফ কাস্টমস অফিসার ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অতিথিদের দিকে তাকালেন, ব্যাগ খুলে দেখাবার জন্যে অনুরোধ করলেন ইংরেজ ডিউককে। অত্যন্ত বিস্ময়কর পপ-আর্ট পা'জামা সাথে নিয়ে ভ্রমণ করছেন তিনি, তবে জিনিসটা সবাই দেখে ফেলায় একটুও বিব্রত বোধ করলেন না। এরপর চীফ কাস্টমস অফিসার হাত ইশারায় সবাইকে এগিয়ে যাবার অনুরোধ করলেন, সহাস্যে প্রত্যেককে বলছেন, 'ওয়েলকাম টু জ্যামাইকা, মি. লর্ড,' পদমর্যাদা নির্বিশেষে।

এমনকি রানাকেও একই অভ্যর্থনা দেয়া হলো, যদিও চীফ কাস্টমস

অফিসার বহুবার দেখেছে ওকে।

আই বি এ-র বিভিন্ন শাখা অফিস থেকে জ্যামাইকায় নিয়ে আসা হয়েছে ত্রিশজন সুন্দরী তরুণীকে, তাদের সাথে একমাত্র বাঙালী হিসেবে রয়েছেন সুলতা রায় চৌধুরী, চীফ অর্গানাইজার-এর ভূমিকায়। মেয়েগুলোকে প্রথমে মায়ামিতে জড়ো করা হয়, ওখানে সবার জন্যে একই ধরনের ড্রেস বরাদ্দ করেন সুলতা রায়—হালকা নীল স্মক ও মিনিস্কার্ট, সন্ধ্যায় পরার জন্যে সাদা লম্বা গাউন, গাঢ় নীল শর্টস ও সাদা স্লিভলেস শার্ট দিনের জন্যে, সাথে একটা করে টু-পীস সুইম স্যুট। ভেগা কটেজে অপেক্ষা করছে ওরা, পুরো কটেজটাই ভাড়া করা হয়েছে এবার।

আই বি এ-র বোর্ড অভ ডিরেক্টর্স-এর তরফ থেকে একা শুধু রানা আর দারা শিকদার উপস্থিত রয়েছে জ্যামাইকায়। শামসুল হক আর সালেহ চৌধুরী মার্কেটের মতিগতি বোঝার জন্যে লন্ডনে রয়ে গেছেন, আই বি এ-র শেয়ারদর ১৮০.৬৫-এর নিচে নামলে ব্রোকারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন, আজ সকালে মার্কেট খোলার পর ওই দরই পাওয়া গেছে। এত কম দরেও ক্রেতা পাওয়া যায়নি। আই বি এ-র লোকজনই দু'হাতে শেয়ার কিনছে, বাজারদর স্থির রাখার জন্যে। কিন্তু এভাবে যে সঙ্কট থেকে বাঁচা যাবে না, সবাই তা জানে।

আটলান্টিক পেরোবার সময় একবার শুধু খেতে দেয়া হয়েছে আরোহীদের, তবে চাওয়ামাত্র পরিবেশন করা হয়েছে হুইস্কি, ব্র্যান্ডি বা শ্যাম্পেন। আরোহীদের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে, এমন কিছু করা হয়নি। কোন বক্তৃতা বা বিবৃতি দেয়া হয়নি। দৈনিক পত্রিকা সরবরাহ করা হয়েছে, এমন কোন ফোল্ডার দেয়া হয়নি যাতে আই বি এ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। অচিন পাখি সম্পর্কেও প্রশংসাসূচক কিছু বলা হয়নি।

মন্টেগো বে-তে পৌঁছুবার পর সন্ধ্যার প্রথম দিকে কনফারেন্স ডাকল রানা। ইতোমধ্যে আরোহীরা সবাই যথেষ্ট বিশ্রাম নিয়েছেন, কেউ কেউ সাঁতার দিয়েছেন সাগরে, বা বোটে চড়ে ঘুরে এসেছেন। প্রত্যেকের জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা আছে, মন্টেগো বে শহরটা দেখে এসেছেন অনেকে। অত্যন্ত হালকা ও হাসিখুশি পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো সভা। ভেগা কটেজের ডাইনিং রুমের এক পাশে বসলেন সবাই, মাথার ওপর খোলা আকাশ, অদূরে স্থানীয় কালো শিল্পীরা ব্যান্ড বাজাল, ব্যান্ডের তালে তালে নাচল স্থানীয় তরুণীরা। ব্যান্ডস্ট্যান্ডে একটা টেবিল ফেলা হয়েছে, টেবিলের পিছনে শাহেদ ইকবালকে নিয়ে বসল রানা। আই বি এ-র মেয়েরা অতিথিদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাসিমুখে তৃষ্ণার্তদের পানীয় পরিবেশন করছে তারা। টেবিলের ওপর, রানার সামনে, ছোট একটা মাইক্রোফোন রয়েছে। শুরু করল ও, 'ইওর হাইনেসেস, ইওর গ্রেসেস, মি. লর্ডস, লেডিজ, অ্যান্ড জেন্টলমেন....।'

পিন-পতন স্তব্ধতা নেমে এল।

'প্রথমে আমি আমার কোম্পানীর তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাদের সাথে অচিন পাখির আরোহী হবার জন্যে

আপনাদের মূল্যবান সময় দিতে পেরেছেন বলে। আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর পিছনে নিষ্কলুষ একটা উদ্দেশ্য রয়েছে আমাদের। সেটা হলো, আমরা চাইছি, অচিন পাখি ফ্লাইট সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হোক আপনাদের। বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রায় রোজই বিভিন্ন প্লেনে চড়ার অভিজ্ঞতা আপনাদের রয়েছে, সেই সব ফ্লাইটের সাথে অচিন পাখি ফ্লাইটের তুলনামূলক পার্থক্য কতটুকু সে-সম্পর্কেও আপনাদের একটা ধারণা হবে বলে আশা করছি আমরা।

'কোন ধরাবাঁধা প্রোগ্রাম রাখা হয়নি। আপনাদের ইচ্ছে মত যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারেন আপনারা। পরশু দিন সকাল ন'টায় অচিন পাখি লন্ডনের উদ্দেশে টেক-অফ করবে। আপনাদের হাতে সময় রয়েছে আজ ও আগামীকাল পুরোটা দিন। আপনাদের জন্যে বেশী কিছু এসকর্ট-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গলফিং, ফিশিং, ক্রুজিং, সুইমিং, সার্ফ-বোর্ডিং—যার যা খুশি বেছে নিতে পারেন। সৈকতে বা টেরেসে অলস সময় কাটাতে চাইলেও কারও কিছু বলার নেই। খাওয়াদাওয়া করুন, বিশ্রাম নিন। সম্ভাব্য সমস্ত ডিশ পাওয়া যাবে। এনজয় ইওরসেলফ, রিল্যাক্স; শুধু একটা কথা, হ্যাট ছাড়া বেশিক্ষণ রোদে থাকবেন না...।' মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে দিল রানা।

মাইকেল হবস জিজ্ঞেস করল, 'মি. রানা, প্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে জানতে চাইছি, আমাদের জন্যে আপনি আলাদা কোন সময় দেবেন কি? আমাদের অনেক প্রশ্ন আছে।'

তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল রানা। এত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না, জানত ও। মাইক্রোফোনের সুইচ অন করে বলল, 'আপনারা যখনই চাইবেন সময় পেতে পারেন, জেন্টলমেন।' তারপর অন্যান্য অতিথিদের দিকে ফিরে বলল, 'এখন যেটা শুরু হবে, খানিকটা টেকনিক্যাল বলা যেতে পারে—আগ্রহ না থাকলে উঠে চলে যেতে পারেন।'

দশ-বারোজন অতিথি আসন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। বাকিরা নিজেদের গ্লাস আবার ভরে নিলেন, হেলান দিলেন চেয়ারে। এজেন্সি প্রতিনিধিরা সামনের সারির আসন দখল করেছে, হাতে কলম আর প্যাড, ইস্পাত বাংলার একটা মেয়ে এইমাত্র দিয়ে গেছে।

'একটা কথা স্বীকার করতে হবে,' টিমোথি সারওয়াক সহাস্যে মন্তব্য করল, 'তোমাদের আয়োজনে কোন ত্রুটি নেই।'

ক্ষীণ হাসল শাহেদ, কথা বলল না।

'এবার, কে আগে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হাত তুলল মাইকেল হবস। 'অসিন পাকির বহরকে মাটিতে বসিয়ে রাখা হয়েছে কেন?'

হাসিমুখে বলল রানা, 'জুরিখে দেয়া বিবৃতির বাইরে আমার কিছু বলার নেই। আপনি যদি চান, বিবৃতিটা আরেকবার পড়তে পারি আমি।'

'তার দরকার নেই।'

দ্বিতীয় প্রশ্ন এল টিমোথির তরফ থেকে, 'বলা হচ্ছে, অসিন পাকি প্লেন

হিসেবে ভাল নয়। এ-ব্যাপারে আপনার কোন মন্তব্য আছে?'

'এইমাত্র একটা অচিন পাখিতে চড়েছেন আপনি। বিচারের ভার আপনার ওপরই ছেড়ে দিলাম আমি।'

জন ম্যাক্সওয়েল জানতে চাইল, 'শোনা যাচ্ছে, অসিন পাকির···।'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'এ অসহ্য!' ওর ভাষা আর মুখের ভাব দেখে হতবাক হয়ে গেল সবাই। 'একটা জাতিকে অপমান করার সমতুল্য অপরাধ করছেন আপনারা!' নিস্তব্ধ হয়ে গেল চারদিকে, পরমুহূর্তে মৃদু গুঞ্জন উঠল। 'আপনারা সমাজের শিক্ষিত ও ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি, আপনাদের মুখে এই ভুল উচ্চারণ শুধু মানায় না নয়, আমি বলব রীতিমত অশ্লীল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি যে আমি আমার দেশ ও ভাষাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি? সেই ভালবাসার তাগিদ থেকে বলছি, আপনারা যদি "অচিন পাখি" শুদ্ধ উচ্চারণ করতে না পারেন, আপনাদের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেব না আমি।'

দু'সেকেন্ড কেউ নড়ল না। তারপরই তুমুল করতালিতে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। ডিউক ভদ্রলোক তো তাঁর আসন ছেড়ে দাঁড়িয়েই পড়লেন। করতালি থামার পর রিপোর্টারদের প্রতিনিধি হিসেবে ম্যাক্সওয়েল ক্ষমা প্রার্থনা করল, বলল, 'এই অক্ষমতার জন্যে সত্যি আমরা লজ্জিত। মি. রানা, আপনি প্রতিবাদ করায় নিজেদের ভুল সংশোধন করে নেয়ার একটা সুযোগ পেয়েছি আমরা, সেজন্যে সবাই আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এবার তাহলে প্রশ্নটা করি আমি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ধন্যবাদ, হ্যাঁ।'

'শোনা যাচ্ছে, অচিন পাখির ডিজাইনে নাকি বড় ধরনের একটা ত্রুটি আছে। ইটালিয়ান একটা পত্রিকার উদ্ধৃতি দিতে পারি আমি, ওতে বলা হয়েছে অচিন পাখি আসলে একটা মৃত্যুফাঁদ···।'

'আপনি অচিন পাখিতে চড়েছেন, মি. ম্যাক্সওয়েল, কিন্তু এখনও দিব্যি বেঁচে আছেন।'

আবার প্রশ্ন করল টিমোথি সারওয়াক, 'আপনাদের শেয়ার দর নেমে গেছে। কেন জানাবেন কি?'

এতক্ষণে অতিথিরা সবাই আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এই প্রশ্নের উত্তরের ওপর নির্ভর করছে তাদের ব্যবসার লাভ-লোকসান। চারদিকে চোখ বুলাল রানা। এই একটা প্রশ্নের উত্তর সঠিক হতে হবে, এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। 'হ্যাঁ, কারণটা আপনাকে জানাতে পারি আমি, মি. সারওয়াক,' ধীরে ধীরে শুরু করল রানা, সতর্কতার সাথে। 'উত্তর দেব, কিন্তু দেব আমার শর্তে। শর্তটা হলো, এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর আমাকে আর কোন প্রশ্ন করা চলবে না, যতক্ষণ না আমরা লন্ডনে ফিরে যাই।'

'কিন্তু আপনি কি পুরো একটা স্টেটমেন্ট দেবেন?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল হবস।

'হ্যাঁ, কমপ্লিট স্টেটমেন্ট দেব, যতটুকু জানি আমি···তাহলে সেই কথাই

রইল?'
রিপোর্টাররা পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর নিঃশব্দে একযোগে মাথা ঝাঁকাল তারা। টিমোথি সারওয়াক বলল, 'স্টেটমেন্টটা যেন সব দিক কভার করে, মি. রানা। আমরা সবাই নিউ ইয়র্কের লাইন খুলে রেখেছি।'
বড় একটা শ্বাস টেনে শুরু করল রানা। 'কেউ একজন, তার পরিচয় জানতে চাইবেন না, অচিন পাখির ডিজাইনে ত্রুটি আছে বলে মিথ্যে গুজব ছড়াচ্ছে। আরও বলছে, আই বি এ মেইন্টেন্যান্স-এ চিট করছে। কিছু কিছু ব্যবসায়ী মহল গুজবটা বিশ্বাস করছে, আই বি এ-র শেয়ার দর পড়ে যাওয়ার সেটাই কারণ। গুজবটার মধ্যে সত্যের ছিটেমাত্রও নেই, আই বি এ-র অচিন পাখি নিঃসন্দেহে বর্তমান দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ প্যাসেঞ্জার প্লেন। মেইনটেন্যান্স-এর ব্যাপারেও আই বি এ কোন রকম কারচুপি করছে না।
'গোটা ব্যাপারটা ঈর্ষা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আই বি এ ভাল ব্যবসা করছে, অনেকেরই তা সহ্য হচ্ছে না। সহ্য না হওয়ার কারণ, অচিন পাখির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তাদের কোম্পানীগুলো লোকসান দিচ্ছে। যাই হোক, আমরা আশা করি, লন্ডনে ফিরে যাবার পর আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন যে অচিন পাখি নিঃসন্দেহ ত্রুটিহীন একটা বিমান। আমরা আরও আশা করি, আমাদের কোম্পানীর বাজারদর ও শেয়ারদর খুব তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক পর্যায়ে উঠে আসবে। জেন্টলমেন, এর বেশি এই মুহূর্তে আর কিছু বলার নেই আমার।'
'স্টেটমেন্টটা আপনি, মি. রানা, কোম্পানীর মুখপাত্র হিসেবে, নাকি ডিরেক্টরদের একজন হিসেবে দিলেন?'
'ইচ্ছে হলে আপনি আমার নাম ব্যবহার করতে পারেন,' বলে মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে দিল রানা।

অভিযোগটা কাগজে ছাপা হবার পর দুনিয়া জুড়ে এডিটররা মন্তব্য করলেন, 'পাগলের প্রলাপ!' শেয়ারের দাম আরও দশ পয়েন্ট কমল।

ইয়ট ক্লাবের পাশের জেটিতে ডিউটি দিচ্ছে কাসিমের চাচাতো ভাই, জেটির শেষ মাথায় নোঙর করা হয়েছে বনবন। লিংকন কন্টিনেন্টাল নিয়ে এল কাসিম, ভাই-এর পাশে গাড়ি থামাল। 'আমার একটা কাজ করে দেবে?' জিজ্ঞেস করল সে, দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে।
'কি যে বলো না! তোমার কাজ কবে না করেছি!'
'আমার গাড়িটা নিয়ে ওকো রিয়োস-এ চলে যাও, একটা মেসেজ নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারো ফিরে আসবে।'
'আরে, ধ্যাত,' কাসিমের চাচাতো ভাই বলল, 'ভুলেই গিয়েছিলাম, এখানে আজ আমার সারাটা দিনই ডিউটি।'
'এটাকে ডিউটি বলে? কেউ এসে বোটটা চুরি করে নিয়ে যাবে? যত্তোসব। শোনো, এখান থেকে নড়ব না আমি, তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত

পাহারা দেব ওটা।'

'তুমি নিজে কেন ওকো রিয়োসে যাচ্ছ না, শুনি?'

'কাজটা করবে, না করবে না? যাও, গাড়িটা নিয়ে ঘুরে এসো। বিশটা পাউন্ডও পাবে।'

'ধ্যাত, টাকা দিতে চাইলে না বলি কি করে! কিন্তু বোটটার ওপর নজর রেখো।'

গাড়ি নিয়ে চলে গেল কাসিমের ভাই। পাঁচ মিনিট পর অ্যাগানিসটেসকে নিয়ে জেটিতে উদয় হলো মাসুদ রানা, কাসিমকে পাশ কাটিয়ে স্যাম বুলহ্যামের বনবনে চড়ল।

ক্রুজারটা বিলাসবহুল, মেইন সেলুনে ছ'টা বাঙ্ক, ফরওয়ার্ড কেবিনে দুটো। বোটে সমস্ত আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাই রয়েছে—রেডিও, শোর-টু-শোর টেলিফোন, রাডার ইত্যাদি। আফটার হ্যাচে নামা যায় ছোট্ট একটা সিঁড়ি বেয়ে, মেইন কেবিন থেকে। ওখানেই এঞ্জিন রূম, মোট চারটে এঞ্জিন দেখল ওরা।

'মাই গড!' বিস্মিত হলো অ্যাগানিসটেস। 'এ যেন একটা নেভী ডেস্ট্রয়ার!'

আই বি এ-র টেকনিক্যাল সেলস ডিপার্টমেন্টে কাজ করে অ্যাগানিসটেস। তার সাথে গোনজালেসের হৃদ্যতা আছে, কারণ গোনজালেসের আবিষ্কারগুলো সাধারণত সে-ই ব্যবহার করে। যেমন এই মুহূর্তেও তার পকেটে অনেকগুলো ডিভাইস রয়েছে, সবই সুইজারল্যান্ডে গোনজালেসের গ্যারেজে তৈরি। কোমরের বেল্ট থেকে একটা হুইটওয়ার্থ স্প্যানার বের করল সে, প্রতিটি ফুয়েল ইনজেকটর ফিডের স্ক্রু খুলল। এরপর নাট খুলে বের করে আনল ইনজেকটরগুলো। প্রতিটি নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করা। 'এঞ্জিনের যত্ন নেয় লোকটা,' বলল সে। পকেট থেকে বেরুল কয়েকটা চ্যাপ্টা বিস্কিট, এগুলো গোনজালেসের কাছ থেকে পেয়েছে সে। বিস্কিটগুলোর মাঝখানটায় ফুটো রয়েছে। দেখে বোঝার কোন উপায় নেই যে ওগুলো বিস্ফোরক। বেল্ট থেকে একটা কাঁচি বের করল অ্যাগানিসটেস। ফুয়েল ইনজেকটরের শেষ মাথার মাপ নিল সে, তারপর গোল করে একটা বিস্কিট কাটল। কাটা অংশটা জায়গামত বসাচ্ছে, ওদিকে বিস্কিট আর কাঁচি নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে রানা। প্রতিটি ইনজেকটরের শেষ মাথায় একটা করে বিস্কিটের অংশ রাখা হলো, তারপর ইনজেকটরগুলো সিলিন্ডার হেডে বসিয়ে দেয়া হলো আবার, নতুন করে সংযোগ দেয়া হলো ফুয়েল ফিড লাইনে। প্রতিটি এঞ্জিনে কারিগরি ফলাতে দশ মিনিট করে সময় নিল ওরা। কাসিমের ভাই ওকো রিয়োসে পৌঁছুবার আগেই বনবন থেকে নেমে এল ওরা। ওকো রিয়োস থেকে 'কাম টু জ্যামাইকা' লেখা একটা পোস্টার নিয়ে আসবে সে, টেলিফোনে অর্ডার দিয়েছে কাসিম। পরের বার যখন স্টার্ট নেবে বনবনের এঞ্জিন, নজলগুলোর শেষ মাথা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় না পৌঁছুনো পর্যন্ত ঠিকভাবেই চলবে বোট। তারমানে বিশ মিনিট, ততক্ষণে বন্দর এলাকা ছেড়ে

বেশ অনেক দূর সরে যাবে বনবন। যথেষ্ট উত্তাপ পেলে বিস্ফোরিত হবে বিস্কিটগুলো, বোটের তলা উড়ে যাবে, পানির নিচে তলিয়ে যাবে এঞ্জিনগুলো।

ডিক ব্রুসকে সাগরে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে উইলিয়াম কার্টার। 'তোমাকে দেখছি মেরেই ফেলেছে ও, কার্টার!' উইলিয়ামের নির্বাচিত মেয়েটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল ডিক ব্রুস। বোটে চড়ার আগে দু'জনের মধ্যে আর কোন কথা হলো না।

প্যারাবোলিক মাইক্রোফোন আটকানো বয়াটাকে পাশ কাটিয়ে এল ওদের বোট, কেউ ওরা তাকাল না। আধ মাইলটাক এগিয়ে বোটের এঞ্জিন বন্ধ করল উইলিয়াম। অবাক হলো না ডিক ব্রুস, জানে বেড়ানোটা উইলিয়ামের উদ্দেশ্য নয়।

'তোমার ডিভাইস যদি কাজ না করে, আই বি এ-র সিকিউরিটি অফিসাররা আমাদের খুঁজে বের করবে,' বলল উইলিয়াম।

'কাজ করবে না মানে?' চড়া গলায় বলল ডিক ব্রুস। 'একশোবার কাজ করবে। ছিন্নভিন্ন সীগালের মত আকাশ থেকে খসে পড়বে অসিন পাকি। গভীর সমুদ্রের একেবারে মাঝখানে।'

'মাসুদ রানাকে তুমি আন্ডার এস্টিমেট কোরো না।'

'তার বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে বলেই তো প্লেনটা এমন এক সময় ফেলছি যখন আরোহী হিসেবে সে-ও ওটায় থাকছে!'

'পিটার গুডউইল যদি এই দ্বীপে ওদের হাতে ধরা পড়ে, ওরা মনে করবে সে-ই গোটা ব্যাপারটার জন্যে দায়ী, তাই না? আর কারও খোঁজ করবে না। আমরা আমাদের চাকরিও হারাব না। প্লেনটা যদি ফেলতে না পারি, স্যাম বুলহ্যাম আমাদের টাকা দেবে না, চাকরিটা তখন দরকার হবে, তাই না? তুমি যদি রাজি হও, পিটারকে আমরা বীমা হিসেবে কাজে লাগাতে পারি। ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করা দরকার, কি বলো?'

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বোট ঘুরিয়ে নিল উইলিয়াম কার্টার।

তেরো

গোনজালেসের জন্যে বিরাট স্বস্তিকর ব্যাপার হলো, গ্লাস-বটমড্ একটা বোট যোগাড় করেছে কাসিম, রোদ ঠেকাবার জন্যে চাঁদোয়া দিয়ে ছাওয়া। পানির কিনারায়, কালাহান বীচ থেকে আধ মাইল দূরে ভেসে রয়েছে ওটা। সবগুলো মাইক্রোফোন ঠিকমত কাজ করছে, তবে গোনজালেস জানে রাত নামলে প্যারাবোলিকের ব্যাটারি বদলাবার জন্যে একবার যেতে হবে তাকে। শুনছে সে, রেকর্ড করছে। ভেগা কটেজের একজন ওয়েটার দেখা করল স্যাম বুলহ্যামের সাথে, নতুন অতিথিদের উপস্থিতি ও কনফারেন্স সম্পর্কে রিপোর্ট

করল। অতিথিদের পরিচয় সম্পর্কে যতটা না উৎসাহ দেখাল বুলহ্যাম, তারচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখাল অচিন পাখির জ্যামাইকা ত্যাগ করার তারিখ আর সময় সম্পর্কে। লকেটটা পরে আছে ভেরোনিকা, এখনও খোলেনি। ডিক ব্রুস সবার সাথেই মেজাজ দেখিয়ে কথা বলছে। সাগরে মাছ ধরছে পিটার, বোটটা একবার বয়ার খুব কাছাকাছি চলে আসায় উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল গোনজালেসের। ভাগ্যই বলতে হবে, বয়াটার দিকে তাকাল না পিটার গুডউইল। বেশিরভাগ সময়ই একটা মেয়ের সাথে বিছানায় কাটাল উইলিয়াম কার্টার। বাকি দুটো মেয়ে গাড়িতে চড়ে বিদায় নিল, বুলহ্যাম তাদের বিদায় দেয়ার সময় টাকার কড়কড়ে আওয়াজ শুনতে পেল গোনজালেস। 'দরকার হলেই ফোন করবেন,' মেয়েদের একজন বলল। 'আপনি ডাকলে সব কাজ ফেলে চলে আসব।'

'আর এখানে এসেই গা থেকে সব কাপড় ফেলে দেবে, কেমন?'

কাসিম এখনও বিয়ে করেনি, তবে সুন্দরী এক তরুণীর ছোট ভাইকে শ্যালক বলে পরিচয় দেয়। ছেলেটা তার খুব ভক্ত। বোনের চিঠিপত্র চুপিচুপি এনে দেয় কাসিমকে। গোনজালেস আর রানার মধ্যে মেসেঞ্জার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে কাসিমের সেই শ্যালক। অতিথিরা রানার খুব একটা দেখা পাচ্ছে না, ভেগা কটেজের লম্বা এক করিডরের শেষ মাথায় নিজের কামরাতেই বেশিরভাগ সময় কাটাচ্ছে রানা। ঝুল-বারান্দায় বসে আছে ও, কাসিমের শ্যালক আনসার এসে একটা ক্যাসেট দিল ওকে। 'কাজটা কেমন লাগছে তোমার?'

উত্তরে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল আনসার, বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল। তাকে একটা ভেসপা ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছে, ঠিকমত কাজ করলে ওটা তাকে দান করা হবে।

স্পীডবোটে চড়ে তিনজন জ্যামাইকান এল কালাহান বীচে। বিছানা থেকে ডেকে নেয়া হলো উইলিয়াম কার্টারকে, তার সঙ্গিনীকে ভেরোনিকার সাথে পাঠিয়ে দেয়া হলো ওকো রিয়োস-এ। হোটেল জ্যামাইকার একটা কামরা ভাড়া করবে তারা, বুলহ্যাম পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওখানেই। আবার টাকার শব্দ শুনল গোনজালেস। প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনের ব্যাটারি সময়ের খানিক আগেই দুর্বল হয়ে পড়ল, সৈকতে দাঁড়িয়ে নবাগত তিনজন জ্যামাইকানের সাথে বুলহ্যামের কথাবার্তা সবটুকু শুনতে পেল না গোনজালেস। তবে জানতে পারল যে ওদেরকে এয়ারপোর্টে যেতে হবে, কাজটা সেখানেই। গোনজালেসের মনে হলো, লোকগুলো কিংসটন এয়ারপোর্ট থেকে এসেছে। ক্যাসেটটা শোনার সময় মৃদু হাসল রানা।

পরবর্তী ক্যাসেটে বাড়ির কথাবার্তা ধরা পড়েছে। বুলহ্যামের সাথে উইলিয়াম, পিটার আর ডিকের আলোচনা।

'তাহলে কাজটা কে করছে?' জানতে চাইল বুলহ্যাম।

'আমি,' বলল ডিক ব্রুস। 'শুধু তাহলেই বুঝব যে কাজটা ঠিকমত করা

হলো।'

'তোমার সঙ্গীদের তুমি তাহলে বিশ্বাস করো না, কেমন?' জিজ্ঞেস করল বুলহ্যাম।

'বিশ্বাস আমি কাউকে করি না,' গম্ভীর সুরে জবাব দিল ডিক ব্রুস।

'তাহলে কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

'দশটায়।'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'হ্যাঁ, হাতে সময় থাকতে পজিশন নিতে চাই। কাজটা করতে দু'ঘণ্টারও বেশি সময় লাগবে।'

রানা আন্দাজ করল, ওরা সম্ভবত এবারও বাই-মেটালকে টার্গেট করেছে। ডিক যে-ই হোক, অচিন পাখি সম্পর্কে সবই তার জানা। বাই-মেটালটা কপার ও ফসফর ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি, প্লেনে আগুন ধরে গেলে ওটাই সবার আগে গলে যাবে। জিনিসটার দুটো প্রান্তই এক রকম দেখতে, তবে অভিজ্ঞ একজন লোক জানে কিভাবে বসাতে হয়।

এরইমধ্যে চীফ এঞ্জিনিয়ারকে একটা নোট দিয়েছে রানা। প্রতিটি অচিন পাখির বাই-মেটাল বদলাতে হবে। বদল করা বাই-মেটালগুলো শুধু একদিক থেকে বসানো যাবে।

পিটার, উইলিয়াম আর ডিক, এদের তিনজনকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই রানার। ওরা জ্যামাইকা ত্যাগ করার সময় পরিচয় জেনে নেয়ার সুযোগ হবে। জ্যামাইকা ত্যাগ করতে হলে এয়ারপোর্ট দিয়েই যেতে হবে ওদেরকে। আর যদি বুলহ্যামের বোটে চড়ে, ওদের জন্যে বিরাট একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

পরদিন সকালে অতিথিদের একটা দল গলফ খেলে সময় কাটালেন। কেউ কেউ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দ্বীপটা ভাল করে দেখার জন্যে। অনেকেই বোটে চড়ে গেলেন ডক্টর'স কোভ-এ, খালি গায়ে রোদ মাখলেন। লাঞ্চের আগে শুরু হলো পোকার খেলা। পাঁচজনের মধ্যে একজন সুলতা রায়, একজন ইংলিশ ব্যারোনেট, বোস্টনের ভদ্রলোক, একজন ফরাসী ব্যারনেস। সুলতা রায়ের একটা চোখ থাকল খেলার দিকে, অপর চোখটা থাকল মেয়েদের ওপর। লাঞ্চের জন্যে যখন ডাক পড়ল, তিরিশ ডলারের মত জিতে রয়েছেন সুলতা রায়। লাঞ্চের পর, হোটেলে যাঁরা রয়েছেন, যে-যার স্যুইটে চলে গেলেন। ভেগা কটেজে নিস্তব্ধতা নেমে এল। এমনকি বারম্যানও কাউন্টারের পিছনে বসে ঝিমাতে শুরু করল।

কানে ফোনের রিসিভার নিয়ে পুরো দিনটাই নিজের স্যুইটে কাটাল রানা। আনসার অল্প কয়েকটা ক্যাসেট নিয়ে এল। কালাহান বীচে একমত হয়েছে ওরা, কাজটা সম্পর্কে কোন আলোচনা হবে না। রাতেই প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনের ব্যাটারি বদলে দিয়েছে গোনজালেস, তবে শোনার মত তেমন কিছু থাকল না। কালাহান বীচ ছেড়ে কেউ কোথাও যায়নি। উইলিয়াম ফোনে কথা বলছে নিউ ইয়র্কের সাথে, শুধু তার কথাই

শুনতে পেয়েছে গোনজালেস। নিজের বেডরুম থেকে আরও কোথাও ফোন করে থাকতে পারে সে, কিন্তু ভেরোনিকা অনুপস্থিত থাকায় কোন মাইক্রোফোনে ধরা পড়েনি।

শেষ বিকেলের দিকে গোনজালেসের একটা চিরকুট নিয়ে এল আনসার, সাথে একটা ক্যাসেটও আছে। গোনজালেস লিখেছে, 'অর্থ বুঝতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে এগুলোর গুরুত্ব আছে।'

দু'জন লোকের সাথে টেলিফোনে কথা বলছে স্যাম বুলহ্যাম, দু'জনেই নিউ ইয়র্কের। ফোনে আলাপ শুরু হওয়ার আগে, কয়েকটা গলার আওয়াজ টেপ হয়েছে ক্যাসেটে, আওয়াজগুলো টেরেসের দিকে এগিয়ে আসে, তারপর দূরে সরে যায়। প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনের সুইচ অন করে উইলিয়াম, পিটার আর ডিকের কথাবার্তা রেকর্ড করেছে গোনজালেস। সৈকতে ছিল ওরা। পিটারের কথা শুনে মনে হলো, অসুস্থ বোধ করছে সে, বসে আছে ডেক চেয়ারে। বাকি দু'জন পানিতে নেমে সাঁতার কেটেছে, অবশেষে সৈকতে ফিরে এসে আলাপ শুরু করেছে। টেরেস আর সৈকতের শব্দ পালা করে রেকর্ড করেছে গোনজালেস। টেরেসে বসেই ফোনে আলাপ করছে বুলহ্যাম। তার গলা স্পষ্টই ধরা পড়ল। রানা উপলব্ধি করল, টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র রাখা উচিত ছিল, তাহলে অপরপ্রান্তের কথাও শুনতে পেত।

বুলহ্যাম কথা বলল, 'হাই, কোস্টা, তোমার অবস্থা কি?'

...

'চমৎকার। রোমকে বলো তার সাথে আমি পরে কথা বলব।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। পোস্ট টাইম। অবশ্যই, অবশ্যই। কাল সকালে, কোন সন্দেহ নেই। জানি না মানে? পালটা আমিই না চরাচ্ছি? কাজেই, যেমন কথা হয়েছিল তৈরি থাকো। আমার তরফ থেকে আছে। ইট'স ইন দ্য ব্যাগ।' রোমের সাথে আলাপটা প্রায় একই রকম হলো, শুধু শেষ বাক্যটা একটু অন্যরকম, ওটার বিশেষ তাৎপর্য থাকতে পারে।

'কোন গ্রীককে আদৌ বিশ্বাস করা যায় কিনা আমি জানি না···।'

টেপটা আবার চালাল রানা, প্রতিটি বাক্য লিখে নিল প্যাডে। অনেকগুলো প্রশ্ন মাথাচাড়া দিল। কোস্টা কে? রোম কে? পোস্ট টাইম মানে কি? আমেরিকান কথনভঙ্গিতে শব্দটার অর্থ, শিগ্‌গির রেস শুরু হবে, বা কোন ঘটনা ঘটবে।

ঘটনাটা কাল সকালে ঘটবে। স্যাম বুলহ্যাম পাল চরাচ্ছে···এর মানে হতে পারে, আয়োজনটা ব্যক্তিগতভাবে দেখাশোনা করছে সে। সিদ্ধান্ত অনুসারে কোস্টা আর রোম তৈরি থাকবে। ঘটনাটা ঘটার সময়? আমার তরফ থেকে আছে। কি আছে? অনুমতি? আর ব্যাগে? টাকা? কোন ডকুমেন্ট?

তারপর হঠাৎ নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল রানার। ইটস ইন দ্য

ব্যাগ-এর আমেরিকান মানে হলো, এটা নিশ্চিত একটা ব্যাপার, সব ঠিক হয়ে আছে। কাল সকালে যে ঘটনাটা ঘটার কথা, নিশ্চিত ভাবে ঘটবে সেটা।

কিন্তু কোস্টা কে, রোম কে? কোন গ্রীককে আদৌ বিশ্বাস করা যায় কিনা আমি জানি না। এভিয়েশন-এ গ্রীক কে কে জড়িত? কোস্টা সম্ভবত কোন গ্রীকের ডাকনাম। বিদ্যুৎ চমকের মত একটা নাম মনে পড়ল রানার। কোস্টাস, কোস্টা নয়। আচ্ছা! কে ও কেন, দুটো প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া গেল।

রোম…রোম…তারপর? শহরটার সাথে কোন সম্পর্ক না থাকারই কথা। নামের প্রথম অংশ রোম, এমন লোকের সংখ্যা খুব কমই পাওয়া যাবে। তবে একজনের কথা মনে পড়ছে রানার, রোমবার্ট…।

বুলহ্যাম কাদের ফোন করেছিল, বুঝে ফেলল রানা। ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা ও প্রেরণাদাতা হলো স্যাম বুলহ্যাম। কোস্টাস মেনন দলের একজন সদস্য। পোর্টল্যান্ড, মেইন-এর একটা এয়ারক্রাফট কোম্পানীর বেশিরভাগ শেয়ারের মালিক এই গ্রীক। মাঝারি পাল্লার বিমান তৈরিতে ভাল করছিল কোম্পানীটা, কিন্তু বাজারে অচিন পাখি আসার পর ওদের সমস্ত অর্ডার বাতিল হয়ে যায়। এবং ষড়যন্ত্রকারীদের আরেকজন হলো রোমবার্ট পেরেজ, আর্জেন্টিনার একজন ধনকুবের। আর্জেন্টিনার লোক, তবে তার বেশিরভাগ ব্যবসা ও সয়-সম্পত্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। শোনা যায়, দক্ষিণ আমেরিকায় যত সরকার বদল বা সামরিক অভ্যুত্থান হয়, তার পিছনে রোমবার্ট পেরেজের হাত না থেকে পারে না। অসৎ রাজনীতিকরা তার কথায় ওঠে-বসে। রোমবার্ট পেরেজ ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত বুঝতে পেরে বিস্মিত হলো রানা। যতদূর জানে ও, পেরেজের কোন টাকা বিমান তৈরি শিল্পে খাটছে না। তার বেশিরভাগ টাকা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় খাটে। নিউ ইয়র্কে ফোন করে শামসুল হকের সাথে কথা বলল ও। রহস্যটা কি জানা গেল তাঁর কাছ থেকে। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন রানাকে, 'সিক্সথ এভিনিউয়ে আমাদের যে বিল্ডিং রয়েছে, ওটার আশপাশে সমস্ত জায়গার মালিক কে বলুন তো?'

'কে?'

'গোল্ডল্যান্ড কোম্পানী। আর গোল্ডল্যান্ড কোম্পানীর মালিক?'

'রোমবার্ট পেরেজ। তারমানে হিসাবটা এভাবে করা হয়েছে—আমাদের কোম্পানী যদি লালবাতি জ্বালে, পানির দামে বিল্ডিংটা কিনে নিতে পারবে সে?'

'নিজের জায়গার সাথে আমাদের জায়গাটা এক করে নেবে, তারপর অ্যাপার্টমেন্ট ভবন বানিয়ে কয়েক হাজার মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করবে। আমরা যদি বিক্রি করি, প্রতিবেশী হিসেবে তাকেই প্রথম প্রস্তাব পাঠাতে হবে, আইন তাই বলে। ব্যবসায় মার খেলে ওটা যে আমরা বিক্রি করব, এ তো জানা কথা।'

রাত ন'টায়, ডিনারের সময়, ব্যান্ডপার্টি বাজাতে শুরু করল। সান্ধ্য গাউন

পরে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আই বি এ-র মেয়েরা। খানিকক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, সবাই তারা একজন করে পার্টনার যোগাড় করে নিয়ে নাচছে। অতিথিরা সবাই হাসিখুশি, পরিবেশে কোথাও কোন উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই। বয়স্করা কেউ অবৈধ প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন না, কারণ আই বি এ-র মেয়েগুলো দেখতে অপরূপ সুন্দরী হলেও সবাই অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও সতর্ক—কাউকে কোন অন্যায় সুযোগ দেবে না। ডিনারের পর অতিথিদের পানীয় পরিবেশন করা হলো। টেরেস ধরে করিডরে চলে এলেন দারা শিকদার, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন রানার স্যুইটে।

কালো ট্রাউজার, কালো মোজা আর কালো স্নিকার পরেছে রানা, গায়ের সোয়েটারটাও কালো। হাতে একটা হ্যাট, তাও কালো। জানালা দিয়ে সাগরের দিকে তাকালেন দারা শিকদার, চকচক করছে পানি। 'অদ্ভুত, তাই না? মাত্র তিরিশ মাইল দূরে আমার বিশাল একটা জমিদারী রয়েছে, কিন্তু এবার যাওয়াই হলো না!'

'ঝামেলাটা মিটে যাক, তারপর যাবেন, আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আমিও আপনার সাথে থাকব,' বলল রানা।

'আপনি তৈরি? এখুনি রওনা হবেন?'

'হ্যাঁ। শেষ টেপটা নিয়ে এইমাত্র এসেছিল আনসার। আধ ঘণ্টার মধ্যে কালাহার্ন বীচ ছাড়বে ওরা। ওরা পৌঁছুবার সময় এয়ারপোর্টে থাকতে চাই আমি।'

'এখনও ভেবে দেখুন, মি. রানা। আমিও যাই আপনার সাথে।'

'এদিকটা দেখাশোনা করবে কে? না, আপনাকে এখানেই থাকতে হবে।'

হঠাৎ রানার একটা বাহু চেপে ধরলেন দারা শিকদার। 'সাবধানে থাকবেন, মি. রানা। আপনাকে আমার ভাল লাগে।' ঝট্ করে ঘুরে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

রানার চেহারায় শান্ত থমথমে ভাব। অ্যাকশন শুরু হতে যাচ্ছে। শীতল একটা ঘৃণা অনুভব করল ও। বুলহ্যাম, উইলিয়াম, পিটার আর ডিক—এদের মত লোকদের চিরকাল ঘৃণা করে এসেছে ও। বুলহ্যাম অপরাধী, কিন্তু বাকি তিনজনকে শুধু অপরাধী বললে যেন কম বলা হয়, তারা বেঈমান।

বেঈমানদের ক্ষমা করতে জানে না রানা।

গাড়ি করে ওকে এয়ারপোর্টের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কাসিম। রানার থমথমে চেহারা দেখে একটা কথাও বলেনি সে। কোস্ট রোড ছেড়ে অন্য রাস্তায় পড়ল গাড়ি, এয়ারপোর্টকে ছাড়িয়ে এল, একটা পাহাড়ে চড়ে বাঁক নিল ডান দিকে, পাহাড় থেকে নেমে এসে ছুটল মাউন্টেন লজ অভিমুখে। মাউন্টেন লজ বিখ্যাত একটা রেস্তোরাঁ ও নাইটক্লাব। লিংকনের ওপর কেউ চোখ রেখে থাকলে সহজেই বুঝতে পারবে কোথায় যাচ্ছে ওটা।

প্রথম পাহাড়ে তখনও ওঠেনি লিংকন, তার আগেই গাড়ি থেকে নেমে গেছে রানা। ছুটন্ত লিংকনের ব্যাক সীট থেকে লাফ দিয়ে পড়েছে ও, সাথে

সাথে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে কাসিম। একটা খাদে পড়ে শরীরটা আরও খানিক গড়িয়ে দিল রানা, কাসিমের কথামত দেখল খাদের তলাটা ঠিকই শুকনো, নরম ঘাসে ঢাকা।

চারদিকে ঝোপ-ঝাড়, ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা। আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে এল ও। রাস্তায় একটা মোটর সাইকেল দেখা গেল, সামনে আসার আগেই ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিল ও। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেল এয়ারপোর্টের একপাশে। সামনে কাঁটাতারের বেড়া, পাশ ঘেঁষে খানিকদূর এগোতেই বেড়ার একটা জায়গা কাটা দেখল ও। ভেতরে ঢুকে লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং আর হ্যাঙ্গারের দিকে এগোল।

খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অচিন পাখি। ভেতরটা গরম হবে, সারাদিন রোদ লেগেছে গায়ে। গুনে দেখল রানা, পাঁচজন গার্ড—সামনে পিছনে একজন করে, বাকি তিনজন টহল দিচ্ছে। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল ও। দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট।

ঘাসের ওপর শুয়ে অপেক্ষায় থাকল রানা। ওর পিঠের চামড়ায় ঢেউ উঠল, একটা বাদামী গিরিগিটি হেঁটে গেল পায়ের ওপর দিয়ে। একটু নড়তেই লেজ তুলে পালাল সেটা। অচিন পাখির সামনে টার্মিন্যালের আলো দেখতে পাচ্ছে ও। ওর ডান দিকে ছোট কয়েকটা প্লেন দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওগুলোর একটা দারা শিকদারের, বছরের বেশিরভাগ সময় এখানেই থাকে। কাসিমের আরেক চাচাতো ভাই দেখাশোনা করে ওটার, রোজই একবার স্টার্ট দেয় এঞ্জিন।

নিজের প্ল্যানটা আরেকবার স্মরণ করল রানা। কোথাও কোন ফাঁক রাখেনি ও। বিশ্বস্ত লোকদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছে। উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। এখন শুধু বোকার মত কেউ ছুরি বা রিভলভার বের না করলেই হলো।

দশটার সময় গার্ডদের পালা বদল। পাঁচজনের জায়গায় ডিউটি দিতে এল দু'জন। একজন প্লেনের পিছনে দাঁড়াল, অপরজন সামনে। তিনশো গজ দূর থেকে দু'জনকেই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। দু'জনেই ওরা ওকোরিয়োস এয়ারপোর্ট থেকে এসেছে। ওদের মনিবরা ব্যাপারটা জানে না, জানলে আই বি এ-র গার্ড হিসেবে কাজ করতে দিতে রাজি হত না। কাসিম ওকে জানিয়েছে, দু'জনেই ওরা ড্রাগ অ্যাডিক্ট।

ডিউটিতে আসার পাঁচ মিনিট পর দু'জনেই সিগারেট ধরাল। রানার কল্পনাও হতে পারে, বাতাসে মারিজুয়ানার গন্ধ পেল যেন ও।

সাড়ে দশটায় এল ডাউজার। গায়ে বড় বড় অক্ষরে এয়ারপোর্ট লেখা, চালিয়ে নিয়ে এল একজন জ্যামাইকান, তার পাশে বসে রয়েছে আরেকজন, তৃতীয় লোকটা বসেছে পিছনের ট্যাংকের ওপর। প্লেনের কাছে এসে থামল ডাউজার। বাধা দেবার জন্যে এগিয়ে এল গার্ডরা, যতটা না সতর্ক তারচেয়ে বেশি কৌতূহলী।

রানা দেখল, ডাউজার অপারেটর একটা কাগজ বের করে বাড়িয়ে ধরল। গার্ডদের একজন, যে পিছনে ছিল, কাগজটা নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। খানিক আগে থেকেই ক্রল করে এগোচ্ছে রানা, প্লেনের কাছ থেকে এখন আর মাত্র একশো গজ দূরে ও, যদিও লম্বা ঘাসের আড়ালে রয়েছে শরীরটা। আরও সত্তর গজের মত এগোল ও। এদিকে ঘাস ছেঁটে ছোট করে রাখা হয়েছে, মাত্র পনেরো ইঞ্চি লম্বা। আর সামনে এগোনোর ঝুঁকি নেয়া চলে না।

প্রকাশ্যে সিগারেট খাচ্ছে গার্ডরা, ডাউজার ড্রাইভারের সাথে গল্প করছে হাসিমুখে। বাতাস উল্টোদিকে বইছে, কথাগুলো শুনতে পেল না রানা।

প্লেনের একপাশে সার্ভিস মইটা লাগানো রয়েছে, গার্ডদের কেউ ডাউজারের অপর দিকটা দেখতে পাচ্ছে না। কো-পাইলটের সীট একদিকে কাত হলো, সেটাও গার্ডদের চোখে পড়ল না। লোকটা, নির্ঘাত 'ডিক', কো-পাইলটের সীট থেকে মইয়ের ধাপে পা দিল, মাটি না ছুঁয়েই। মই বেয়ে তাকে তরতর করে উঠে যেতে দেখল রানা। দরজাটা সামান্য খুলল সে, ঢুকে পড়ল প্লেনের ভেতর।

নিঃশব্দে হাসল রানা। প্লেনটায় ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে গোনজালেস, লন্ডনে থাকতেই ক্লোজড সার্কিট ইনফ্রা-রেড টেলিভিশন ক্যামেরা বসানো হয়েছে। লুকানো ক্যামেরাগুলো অচিন পাখির ভেতরকার প্রতিটি ইঞ্চির ওপর নজর রাখছে। প্লেনের এরিয়াল সিস্টেমকে ক্যামেরার ট্র্যান্সমিটার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সিগন্যালগুলো পৌঁছে যাচ্ছে এয়ারপোর্ট টাওয়ারের বিশেষ একটা কামরায়, যেখানে শুধু আই বি এ-র নির্দিষ্ট কিছু লোকের প্রবেশাধিকার রয়েছে। 'ক্যামেরার দিকে মুখ করে হাসো, ডিক,' বিড়বিড় করল রানা, 'তোমাকে টিভিতে দেখা যাচ্ছে।' ডিকের কাছে প্লেনের ভেতরটা অন্ধকার লাগবে, কারণ ইনফ্রা-রেড আলো দেখতে পাবে না সে। তবে ক্যামেরাগুলোর চোখে প্লেনের ভেতরটা দিনের মতই আলোকিত। টাওয়ারের কামরায় অ্যাগানিসটেস আরাম করে বসে আছে, তার সামনে একটা মনিটর সেট ও একটা ভিডিও টেপ রেকর্ডিং মেশিন। প্লেনের দরজা খোলার সাথে সাথে রেকর্ডিং শুরু করেছে সে। অ্যাগানিসটেসের পাশেই বসে রয়েছে চীফ এঞ্জিনিয়ার শামসুদ্দিন আহমেদ, ডিকের তৎপরতায় কোন এঞ্জিনিয়ারিং তাৎপর্য ধরা পড়লে সাথে সাথে নোট করবে।

প্লেনের কাছাকাছি শুয়ে রয়েছে রানা। এখন পর্যন্ত অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটেনি। সব ঠিকঠাক মতই ঘটছে। ডাউজারের ব্যাপারটা অবশ্য জানত না ও, তবে আন্দাজ করেছিল ট্রোজান হর্স হিসেবে এয়ারপোর্টেরই কোন বাহন নিয়ে আসবে ওরা।

অ্যাগানিসটেস আর শামসুদ্দিন আহমেদ ডিকের কাজকর্ম দেখছে। প্যানেল খোলার কাজটা অত্যন্ত জটিল, বাল্কহেড থেকে সেটা সরাতে তিরিশ মিনিট সময় নিল সে। তার প্রশংসা না করে পারল না চীফ এঞ্জিনিয়ার। 'অন্ধকারে কাজ করছে ও, শুধু হাতের ছোঁয়ায়, আশ্চর্য!'

'আলো জ্বালার ঝুঁকি নিতে পারবে না।'

'অত্যন্ত দক্ষ এঞ্জিনিয়ার ও, লোকটা কে জানি আমি।'

'আপনি ওকে চেনেন?'

'চিনি। ওকে আমিই ট্রেনিং দিয়েছি। ডিক ব্রুস আমার একজন শিষ্য!'

শুধু স্পর্শের সাহায্যে বাই-মেটালটা খুলে আনল ডিক ব্রুস, তারপর উল্টো করে বসিয়ে দিল আবার।

'আলো পেলেও অনেক এঞ্জিনিয়ার কাজটা করতে পারবে না,' চাপাস্বরে গর্জে উঠল চীফ এঞ্জিনিয়ার, ডিক ব্রুসের দক্ষতা দেখে রাগ আরও বেড়ে গেছে তার।

ঘাস ছেড়ে উঠল না রানা। প্লেনের ওয়াটার সিলিন্ডার ভরার ভান করল ডাউজার ড্রাইভার, তারপর সঙ্গীকে নিয়ে কেটে পড়ল। রানা জানে, ডাউজারে পানি বলতে কিছু ছিল না। মেইন বিল্ডিং থেকে আসেনি ওরা, সেখানে ফিরছেও না। ওর ধারণা, কিংসটনের আশপাশেই বস্তিতে থাকে জ্যামাইকান দু'জন, পেশাদার ক্রিমিন্যাল, ভাড়া খাটে। সম্ভবত এরাই ভেগা কটেজে ওর ওপর হামলা করেছিল। সম্ভবত কিংসটন এয়ারপোর্টে একসময় কাজ করেছে, কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে জানে। ডাউজারটাও সম্ভবত কিংসটন থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। এয়ারপোর্ট লেখা একটা ওয়াটার ডাউজার কোন এয়ারফিল্ডে ঢুকলে, কে বাধা দেবে?

আড়াই ঘণ্টা পর ডাউজার নিয়ে ফিরে এল ওরা, গার্ডদের বলল, এখানে কোথাও এক গোছা চাবি ফেলে গেছে তারা। প্লেনের আশপাশে ও নিচে তাদের সাথে গার্ডরাও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করল। এই ফাঁকে প্লেন থেকে বেরিয়ে এল ডিক, মই বেয়ে নামল ডাউজারে, এবারও তাকে দেখতে পেল না গার্ডরা।

আরও এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। ইতোমধ্যে পাঁচটা করে সিগারেট খেয়েছে গার্ড দু'জন। এই মুহূর্তে টারমাকের ওপর বসে আছে তারা, একটা চাকার গায়ে হেলান দিয়ে। দু'জনেরই প্রবল নেশা হয়েছে, দুনিয়াদারি সম্পর্কে এই মুহূর্তে কোন ধারণা নেই। এখন যদি একদল হাতিও হামলা চালায় প্লেনের ওপর, ওরা দেখেও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারবে না। ভোর পাঁচটার আগে ওদের নেশা কাটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

ঘাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, ধীর পায়ে প্লেনের পিছন দিকে এগোল। পিছনদিকটায় এসে দাঁড়াল ও। লোকগুলোর ভাব দেখে মনে হলো না রানাকে তারা দেখতে পেয়েছে। সতর্কতার সাথে প্লেনের লেজের কাছ থেকে সামনে বাড়ল রানা, পৌঁছুল র‍্যাম্পের পাশে গিয়ে। এখনও নড়ছে না ওরা। র‍্যাম্প বেয়ে উঠল রানা, প্লেনের ভেতর ঢুকল। গার্ডরা পিছন ফিরে তাকালও না।

প্যানেলের সাথে এক লাইনে পজিশন নিল রানা, মুখ তুলে তাকাল লুকানো একটা ক্যামেরার দিকে। 'ঠিক আছে, আহমেদ,' বলল ও।

সাইকেল চালিয়ে চলে এল চীফ এঞ্জিনিয়ার। প্লেনের পিছন দিক থেকে মইয়ের দিকে এগোল সে, রানার মতই। গার্ডদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, প্লেনের ভেতর ঢুকল নির্বিঘ্নে। তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আমার ধারণা ঠিক?'

'ঠিক, মাসুদ ভাই। বাই-মেটাল উল্টো করে বসিয়েছে ও।'

'আর কিছু?'

'না। ক্যামেরার কাজ চমৎকার, সারাক্ষণ ওর ওপর নজর রেখেছি আমরা। ভিডিও টেপ দেখলেই বুঝতে পারবেন। ওকে আমি চিনি, মাসুদ ভাই। ডিক ব্রুস, আমারই একজন এঞ্জিনিয়ার···জাহান্নামে যাক ব্যাটা!' নষ্ট করার সময় নেই, কাজে হাত দিল সে।

দু'ঘণ্টা সময় নিল চীফ এঞ্জিনিয়ার, টর্চের আলো ফেলে তাকে সাহায্য করল রানা। বাই-মেটাল স্ট্রিপটা খুলে বের করল সে, সিধে করে আবার জায়গামত বসিয়ে দিল। কাজটা শেষ হতে টার্মিন্যালে চলে এল রানা, গার্ডদের বদলি করার নির্দেশ দিল। ড্রাগ অ্যাডিক্ট দু'জনকে গ্রেফতার করার জন্যে মন্টেগো বে থেকে খবর দিয়ে আনানো হলো পুলিসকে।

চোদ্দ

কালাহান বীচে ডিক ব্রুসকে পৌঁছে দিল জ্যামাইকানরা। ট্রাক নিয়ে কিংসটনে ফিরে যাবে ওরা। আগেই ওদেরকে জানানো হয়েছে, লন্ডনে ড্রাগ পাচার করার জন্যে ওদের সাহায্য দরকার ডিকের। প্লেনে ড্রাগ তোলা হোক আর যাই হোক, ওদের কোন আগ্রহ নেই, কিংসটনে ফিরে বাকি টাকাটা পেলেই ওরা খুশি। স্যাম বুলহ্যাম ওদেরকে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সরবরাহ করে, তাতে বলা হয়, এঞ্জিন মেরামতের পর রোড টেস্টিং-এর জন্যে এয়ারপোর্টের বাইরে ডাউজারটা বের করার অনুমতি দেয়া হলো। এঞ্জিন সত্যি সত্যি মেরামত করা হয়েছে, যে গ্যারেজে মেরামত করা হয় সেখান থেকে বের করে আনে ওরা ডাউজারটা।

ডিক ব্রুসের অপেক্ষায় জেগে বসে রয়েছে স্যাম বুলহ্যাম আর উইলিয়াম কার্টার।

'কি খবর?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল বুলহ্যাম। 'কাজটা হয়েছে?'

ডিকের চেহারাই বলে দিল, সব ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছে। 'কি মনে করেন আপনি আমাকে? লেজেগোবরে করে ছাড়ব? জানতাম, কাজটা একমাত্র আমার দ্বারাই সম্ভব। টেক-অফ করার আধ ঘণ্টা পর···ফুস! সব আলো নিভে যাবে, আকাশের একমাত্র অসিন পাকিটি ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে আসবে গভীর সাগরে। জীবনেও ওটাকে খুঁজে পাবে না ওরা। কোন এয়ারলাইন আর সাহসই করবে না অসিন পাকি চালাবার।'

'খুশি হতাম যদি খুঁজে পাওয়া যায় এমন কোথাও পড়ত। তাহলে প্রমাণ হত, ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার মত কোন দুর্ঘটনা ছিল না। ডিজাইনে ত্রুটিজনিত কারণে প্লেনটা খসে পড়েছে, এটা প্রমাণ করাই আসল কথা। সাধারণ লোক জানবে কিভাবে যে প্লেনটায় বাজ পড়েনি বা অন্য কিছু হয়নি?'

'কি বলছেন নিজেও জানেন না!' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল ডিক ব্রুস।

'ত্রিশ হাজার ফুট ওপরে মেঘ কোথায় পেলেন যে বাজ পড়বে? আমি বলব, আমার পদ্ধতিটাই সব দিক থেকে ভাল। গোটা ব্যাপারটা একটা রহস্য হয়ে থাকবে। তবে এ-কথা ভাবার কোন কারণ নেই যে কাগজে ঘটনাটা হেডিং হবে না। ভেবে দেখুন, কত টাকায় বীমা করা হয়েছে ফ্লাইটটা। আরোহীদের কথা ভাবুন, প্রতিটি আরোহীর জন্যে আই বি এ-কে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ইন্সুরেন্স আন্ডাররাইটাররা এমন ব্যাপক তদন্ত চালাবে যে ইতিহাসে যার তুলনা থাকবে না, আর তদন্ত চলার সময় দুনিয়ায় এমন কোন লোক নেই যে অসিন পাকিতে চড়ার দুঃসাহস দেখাবে। সহজবোধ্য কারণটা হলো, কোন বীমা কোম্পানী অসিন পাকির বীমা করতে রাজি হবে না।'

'তুমি বোধহয় ঠিকই বলছ,' সতর্কতার সাথে একমত হলো বুলহ্যাম।

'কাল সকাল সাড়ে ন'টা থেকে রেডিও শুনুন। ওই সময় এয়ার কন্ট্রোলার প্রেসকে জানাবে, প্লেনটার সাথে রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তখন বুঝতে পারবেন, আমার কথাই ঠিক। তখন কিন্তু দেরি করতে পারব না, আমাদের বাকি টাকা দিয়ে দেবেন, আমরা কেটে পড়ব। টাকা-পয়সা সব আপনার সাথেই আছে তো? আপনি আমাদের ক্যাশ দেবেন বলেছেন।'

'টাকা দ্বীপেই আছে, চিন্তা কোরো না। তোমরা যেমন চেয়েছ, ডলার। কিভাবে দ্বীপ ছাড়বে, ভেবেছ কিছু?'

ডিকের দিকে তাকাল কার্টার। 'আমরা আলাদা হয়ে যাব,' বলল সে। 'ভাবছিলাম, আপনার বোটটা ধার পাওয়া যাবে কিনা। পিটার গাড়ি নিয়ে কিংসটনে চলে গেল, ওখান থেকে প্লেন ধরবে; ডিককে নিয়ে আমি আপনার বোটে চড়লাম, আপনি যদি আপত্তি না করেন। পশ্চিম দিকে যাব আমরা, হাইতির পোর্ট-অউ-প্রিন্স-এ নামিয়ে দেব আমি ডিককে, ওখান থেকে প্লেন ধরবে ও। আমি পুয়ের্তো রিকো পর্যন্ত যাব, সান জুয়ানে রেখে যাব বোটটা।'

'অনেকটা দূরের পথ, বোট নিয়ে তোমরা একা…।'

'ভেবেছি, সাথে একজন আরোহীও নিতে পারি আমরা।'

'ওকো রিয়োস থেকে?'

'হ্যাঁ, ওখান থেকেও নেয়া যেতে পারে।'

'ভেরোনিকা হলে কেমন হয়? ওকে তোমার ভাল লাগে? ইচ্ছে করলে ওকে…ওদের দু'জনকেই সাথে নিতে পারো। হাইতি পর্যন্ত ডিক মৌজ-ফুর্তি করল, তারপর পুয়ের্তো রিকো পর্যন্ত তুমি।'

'ভারি চমৎকার বুদ্ধি!'

'পিটার কোথায়?' হঠাৎ ডিকের চেহারায় সন্দেহের ছায়া পড়ল।

'তাকে শুয়ে পড়তে হয়েছে,' বলল বুলহ্যাম। 'প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। গায়ে বোধহয় সামান্য জ্বরও আছে। পেটটাও ভাল যাচ্ছে না…।'

'বোধহয় খাবারে কিছু ছিল?' নিরীহ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল ডিক ব্রুস।

'হ্যাঁ, আমার তাই ধারণা। সকালে যদি সুস্থ না দেখি, ডাক্তার ডাকতে হবে। আমাদের হাতে মারা গেলে বিপদেই পড়ব…।'

'তা তো বটেই।'

'এখানে তার থাকার উপায় নেই,' বলল বুলহ্যাম। 'প্লেন বিধ্বস্ত হবার খবর পাওয়ামাত্র কালাহান বীচে তালা মেরে দেব আমি, প্রথম প্লেন ধরে নিউ ইয়র্কে চলে যাব। বীমা কোম্পানীর লোকজন তদন্ত করতে আসবে এখানে, সে-সময় উপস্থিত থাকতে চাই না। কাজেই তাকে সরাবার ব্যবস্থা করো তোমরা।'

'বেচারা পিটার,' বলল ডিক। 'আশা করি তার অবস্থা সিরিয়াস নয়।'

নিজেদের বেডরূমে বসে রয়েছে ডিক ব্রুস আর উইলিয়াম কার্টার, সব ক'টা মাইক্রোফোন এবং স্যাম বুলহ্যাম ও পিটারের কাছ থেকে দূরে। ডিক ব্রুস নিজেকে নিয়ে ভারি গর্বিত। 'আমার হাতে এটা তুমি দুটো হাতঘড়ির ঢাকনি দেখতে পাচ্ছ,' ব্যাখ্যা করল উইলিয়াম কার্টারকে। 'ঢাকনি দুটোকে আঠা দিয়ে আটকে এক করেছি আমি। জিনিসটাকে এখন প্লাস্টিকের বুদ্বুদ বলা যেতে পারে, অনেকটা ঝিনুকের আকৃতি—ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'সাধারণ দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি নাও, কাঠিটা মাঝখানে ভেঙে দু'টুকরো করো, তারপর একটা টুকরোর শেষ মাথা ঝিনুকের একদিকের ঠিক মাঝখানে আঠা দিয়ে আটকাও। এভাবে।' কথা বলছে ডিক ব্রুস, কাজটা নিজের হাতে করেও দেখাচ্ছে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে উইলিয়াম কার্টার।

'আমার হাতে এটা কি দেখতে পাচ্ছ? একটা কৌটা। হেলথ সল্ট রাখা হয়। এই কৌটার ভেতর এবার আমি ঝিনুকের অপর দিকটা আঠা দিয়ে জোড়া লাগালাম। আঠা শক্ত হবার জন্যে খানিকটা সময় দিতে হবে। এই ফাঁকে কৌটার দু'পাশে দুটো ফুটো তৈরি করব আমরা, হাতে নেব এই দুটো হেয়ারগ্রিপ। দেখতেই পাচ্ছ, সাধারণ হেয়ারগ্রিপ। একটা হেয়ারগ্রিপের একদিকের মাথা প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ব আমরা, এভাবে, তারপর একটা ফুটো দিয়ে কৌটার ভেতর ঢোকাব—মাথাটা একটু বাঁকা করে নেব, যাতে হেয়ারগ্রিপটা দিয়াশলাইয়ের মাথায় ঠেকে থাকে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, আঠা যথেষ্ট শক্ত হয়েছে। এবার, রুমালে জড়িয়ে নিয়ে এই বালবটা ভাঙব আমি।' ছুরির হাতল দিয়ে বাড়ি মারতেই কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো। ভাঙা কাঁচগুলো সরিয়ে ল্যাম্প ফিলামেন্টটা সতর্কতার সাথে অবলম্বন থেকে খুলে আনল সে। এবার আমরা দ্বিতীয় হেয়ারগ্রিপের মাথাটা ফিলামেন্ট দিয়ে জড়াব, মাঝখানটা মুড়ব প্লাস্টিক দিয়ে, বাঁকা করব, তারপর হেলথ্ সল্টের কৌটার দ্বিতীয় ফুটোয় ঢোকাব··· কিছুক্ষণ আস্তে ধীরে নাড়াচাড়া করলেই দেখতে পাবে দ্বিতীয় হেয়ারগ্রিপের মাথাটা প্রথম হেয়ারগ্রিপের শেষ মাথায় বিশ্রাম নিচ্ছে, একমাত্র কন্ট্যাক্ট হিসেবে থাকছে শুধু ফিলামেন্ট।' দক্ষ একজন ব্রেন সার্জেনের মত নিপুণ তার হাত, কৌটার ভেতর সতর্কতার সাথে আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করল, হেয়ারগ্রিপটাকে এমনভাবেই বাঁকা করল যে ফিলামেন্ট সংযুক্ত হলো,

তবে কোন রকম চাপ থাকল না। এরপর হেয়ারগ্রিপ দুটো টেনে আলাদা করল সে, পকেট থেকে বের করল চৌকো করে কাটা এক টুকরো পলিথিন। পলিথিনের টুকরোটা একটা হেয়ারগ্রিপ আর ফিলামেন্টের মাঝখানে ঢোকাল সে। 'বুঝতে পারছ, কি করছি?' কার্টারকে জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ। দিয়াশলাইয়ের কাঠি একটা হেয়ারগ্রিপ ছুঁয়ে আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। এবার হেয়ারগ্রিপ দুটোর অপরদিকগুলোয় ব্যাটারির সংযোগ দেব আমি। ব্যাটারিগুলো অবশ্যই টর্চের ভেতর আছে, তবে কেসিং-এর গায়ে দুটো ফুটো তৈরি করেছি, যাতে হেয়ারগ্রিপের শেষ প্রান্তগুলো প্রতিটি টার্মিন্যাল ছুঁতে পারে। সাবধানের মার নেই, তাই এই ইলাস্টিক ব্যান্ড দিয়ে টর্চ আর হেলথ সল্ট কৌটা এক করে বাঁধব।'

একজোড়া ইলাস্টিক ব্যান্ড দিয়ে দুটোকে এক করল ডিক ব্রুস। এরপর প্লাস্টিকের একটা ব্যাগ হাতে নিল সে। ভেতরে পাউডার রয়েছে। 'একশো শটগান কার্ট্রিজের পাউডার, স্মোকলেস কার্ট্রিজ খুলে সব পেলেট ফেলে দিয়েছি। এর সাথে ডিটোনেটিং পাউডারও মেশানো হয়েছে…।'

'কার্ট্রিজ খোলার সময় তোমার সাথে আমি ছিলাম না, সেজন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাই,' বলল উইলিয়াম কার্টার। 'কিন্তু বুঝতে পারছি না ওই পাউডার দিয়ে কি করবে তুমি!'

'নিজের চোখেই দেখো,' বলে হেলথ সল্টের কৌটায় ধীরে ধীরে পাউডার ভরল ডিক ব্রুস।

'মাইগড!' আঁতকে উঠল কার্টার। 'নিরাপদ তো?'

দাঁত বের করে হাসল ডিক। 'নিরাপদ বৈকি,' বলল সে, 'যতক্ষণ ফিলামেন্টের সামনে এই খুদে পলিথিনটা থাকছে। এবার আসল ভেলকিটা দেখো। আমার হাতে এটা কি? জিপার কেস। সাধারণ একটা টয়লেট কেস, তাই না? ব্যাগটা খুললাম। হেলথ সল্ট কৌটার ঠোঁট মুছলাম, তারপর কৌটা আর টর্চ জিপার কেসের ভেতর রাখলাম, ওগুলোর সাথে ভেতরে ঢোকালাম শটগান কার্ট্রিজের চ্যাপ্টা বাক্স আর বিউটেইন টিউব, যাতে লাইটারের গ্যাস থাকে। ওগুলোর সাথে এই প্লাস্টিক ব্যাগটাও কেসের ভেতর রাখা হলো।'

প্লাস্টিক ব্যাগে সাদা পাউডার রয়েছে।

'ওটা কি জিনিস?' জিজ্ঞেস করল কার্টার। 'আরও বিস্ফোরক?'

'না, হেলথ সল্ট, কৌটা থেকে বের করে রেখেছিলাম। সবশেষে জিপার কেসের ভেতর বালবের ভাঙা কাঁচগুলো রাখলাম আমরা, কেমন? এরপর জিপ টেনে দিলাম, আমাদের কাজও শেষ হলো।'

কেসটা বারো ইঞ্চি লম্বা, ছয় ইঞ্চি উঁচু, তিন ইঞ্চি চওড়া। এ-ধরনের কেসে ট্রাভেলাররা টয়লেট সামগ্রী বহন করে।

'এবার আমরা রওনা হবার জন্যে তৈরি হয়েছি,' বলল ডিক। 'আইডিয়াটা ধরতে পেরেছ তো?'

হতবাক হয়ে গেছে কার্টার। ধীরে ধীরে গোটা ব্যাপারটা স্মরণ করল সে, যেন অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছে। 'একটা জিপার কেস। ভেতরে বিউটেইন

গ্যাসের একটা টিউব, হেলথ সল্টের একটা কৌটা, শটগান কার্ট্রিজ আর একটা পকেট টর্চ। আর কি রয়েছে? এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস। ওটা বিস্ফোরিত হবে যদি সংযোগের মাঝখানে পলিথিনটুকু না থাকে। পলিথিনটা ওখানে আটকে আছে সংযোগগুলোর চাপের কারণে। বেশ। এর মধ্যে ভেলকিটুকু কোথায়?'

'এ-ধরনের ব্যাগ নিয়ে লোকে প্লেনে চড়ে, তাই না? ব্যাগের ডিজাইনটাই করা হয়েছে সেভাবে। প্লেনে তোলা হয়, প্লেন থেকে নামিয়ে আনা হয়। কারও সুটকেসে বা হোল্ডে রাখা হয়—কোন প্লেনের হোল্ডই প্রেশারাইজড নয়, তুমি জানো। কেবিনগুলো প্রেশারাইজড। তাই আমার জন্ম দেয়া এই বাচ্চাটা এমন এক জায়গায় ঠাঁই পেতে যাচ্ছে যেখানে প্রেশার ওঠা-নামা করে···।'

'বুঝেছি! আমি বুঝে ফেলেছি! ওহ্ ডিক, তুমি একটা জিনিয়াস! গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করছে, তোমার ভাষায়, ওই ঝিনুকটার ওপর—হ্যাঁ, তাই প্লাস্টিকের দেয়াল সহ ওটা একটা সীল করা চেম্বার। গ্রাউন্ড লেভেলে দেয়ালগুলো ঠিকই থাকবে। কিন্তু আকাশে ওঠার পর···তুমি যত ওপরে উঠবে অ্যাটমসফেরিক প্রেশার ততই কমবে। ঝিনুকটা একটা আনপ্রেশারাইজড জায়গায় থাকবে, কাজেই অ্যাটমসফেরিক প্রেশার কমার সাথে সাথে বাইরের দিকে ফুলে উঠবে ওটা। আবার যখন নিচে নামবে প্লেন, ধীরে ধীরে ফোলাটা কমে আসবে। ঝিনুক ফুলে ম্যাচের কাঠিটাকে ঠেলবে, কাঠিটা তখন হেয়ারগ্রিপটাকে উঁচু করবে, ফলে পলিথিনটা পড়ে যাবে। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কাজেই বিদ্যুৎ পাস করছে না। প্লেনটা এখন যতক্ষণ আকাশে থাকবে ততক্ষণ নতুন আকৃতি বদলাবে না ঝিনুকের। কিন্তু প্লেন নামতে শুরু করলে আবার অ্যাটমসফেরিক প্রেশার বাড়তে থাকবে, সেই সাথে আকারে ছোট হতে থাকবে ঝিনুকটা, এবং এক সময় ওই হেয়ারগ্রিপটা ফিরে এসে অপরটার সাথে সংযুক্ত হবে। কিন্তু দুটোর মাঝখানে এবার কোন পলিথিন নেই, মনে আছে? সত্যিকার সংযোগ এবারই প্রথম ঘটল, ফলে ফিলামেন্ট জ্বলে উঠবে, তারপর শটগানের এক্সপ্লোসিভ "বুম!" প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হবে!'

'নাহ্, তোমার বুদ্ধি আছে। ঠিক ধরে ফেলেছ! এটার বৈশিষ্ট্য হলো, প্লেন বিধ্বস্ত হবার কারণটা যদি তদন্ত করা হয়, দোমড়ানো-মোচড়ানো টুকরো টুকরো ধাতব পার্টসগুলো খুঁজে বের করে ওরা, কি দেখতে পাবে? একজন আরোহী বোকার মত তার ব্যাগে হেলথ সল্টের কৌটা, শটগানের কার্ট্রিজ, লাইটার ফুয়েল, টর্চ ও স্ত্রীর চুলের কাঁটা রেখেছিল—সব একসাথে। ওদেরকে ধরে নিতে হবে, লাইটার ফুয়েলের টিউবে লিক ছিল, টর্চের ব্যাটারি সেটায় আগুন ধরিয়ে দেয়।'

'ডিক, তুমি একটা ব্লাডি জিনিয়াস,' গদ গদ হয়ে বলল কার্টার। 'কার ব্যাগে রাখব আমরা ওটা? ডিউকের ব্যাগে নাকি প্রিন্সেসদের কারও ব্যাগে?'

'ডিউকের ব্যাগে,' বলল ডিক ব্রুস। 'বুলহ্যামের পোষা ওয়েটার

ডিউককে গল্প করতে শুনেছে—দ্বীপে আসার সময় কাস্টমস অফিসাররা তার ব্যাগ চেক করেছিল। একই জায়গায় কখনও দু'বার বাজ পড়ে না।'

পনেরো

কালো কাপড়চোপড় বদলে লিনেনের ট্রাউজার আর নরম কাশ্মিরী শার্ট পরেছে রানা, দারা শিকদারের সাথে বসে আছে বার-এর এক কোণে। বারের দরজা দিয়ে ড্যান্স ফ্লোরের প্রায় অর্ধেকটাই দেখা যাচ্ছে, বেশ খানিক আগে ব্যান্ডের তালে তালে অতিথিরা নাচছিলেন ওখানে। ক্লান্ত হয়ে যে-যার স্যুইটে ফিরে গেছেন তাঁরা সবাই। রাত কম হয়নি। 'সব ঠিকমত ঘটেছে তো?' জিজ্ঞেস করলেন দারা শিকদার।

'হ্যাঁ। তার ওপর সারাক্ষণ চোখ ছিল আমাদের। কিছুই টের পায়নি। পরে আমরা ওটা আবার সিধে করে বসিয়েছি।'

'প্লেন তাহলে এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ?'

'চীফ এঞ্জিনিয়ার কাজ শেষ করার পর প্রি-ফ্লাইট চেকটাও সেরে নিই আমরা,' বলল রানা। 'আমাদের লোকেরা পাহারা দিচ্ছে এখন প্লেনটা। টাওয়ার থেকে ওদের ওপর চোখ রাখছে অ্যাগানিসটেস। তবু টেক-অফের আগে আরেকবার চেক করব আমরা। জাস্ট ইন কেস।'

হালকা পায়ের শব্দ শুনে দু'জনেই ওরা ডাইনিং হলের দিকে ঘাড় ফেরাল। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল একজন ওয়েটার, ওদের দিকেই আসছে। 'আপনাদের কিছু দরকার, স্যার?'

'না, ধন্যবাদ। ইচ্ছে হলে আজকের মত ছুটি নিতে পারো তুমি,' বললেন দারা শিকদার।

'কিন্তু, স্যার, রাতের ডিউটি দেয়া হয়েছে আমাকে, কিচেনে। অতিথিরা কেউ যদি চা বা আর কিছু চান...।'

'ঠিক আছে।'

অন্ধকারে আবার মিলিয়ে গেল ওয়েটার।

দশ মিনিট পর আবার তাকে দেখল ওরা। টেরেসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, হাতে একটা ট্রে, ট্রের ওপর হুইস্কির বোতল আর গ্লাস। কেউ বোধহয় টেলিফোনে অর্ডার দিয়েছে। হয়তো ঘুম আসছে না।

'আমার অবস্থা সত্যি খারাপ,' ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে ওদের কামরার দরজায় এসে দাঁড়াল পিটার। দরজার চৌকাঠ ধরে হাঁপাতে লাগল সে, এক হাতে পেটটা খামচে ধরে আছে।

'কি হয়েছে তোমার?' জানতে চাইল উইলিয়াম কার্টার।

'আমার ভেতরে কিছু নেই। সারাদিন বমি করছি। এত অসুস্থ লাগছে, যেন জ্ঞান হারাতে পারলে ভাল হত। তোমরা এখুনি আমাকে ডাক্তারের

কাছে নিয়ে চলো।'

'ঠিক আছে, অস্থির হয়ো না!' লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল কার্টার। দ্রুত কাপড় পরতে শুরু করল সে। 'মন্টেগো বে-তে অনেক ডাক্তার আছে, একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দিলেই সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি। অসুবিধেটা কি? পেটব্যথা তো?'

তার দেখাদেখি বিছানা থেকে নেমে ডিকও কাপড় পরতে শুরু করল।

পড়ে যাচ্ছিল পিটার, তাকে ধরে ফেলল ওরা। ধরাধরি করে বের করে আনল বাইরে, গ্যারেজের দিকে যাচ্ছে। শব্দ পেয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল স্যাম বুলহ্যাম। 'কি ব্যাপার, এত হৈ-চৈ কিসের?' জানতে চাইল সে।

'পিটার। সাংঘাতিক অবস্থা ওর। ওকে আমরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

'তোমরা পাগল হলে নাকি!' গর্জে উঠল বুলহ্যাম। 'ওকে কোন অবস্থাতেই হাসপাতাল বা ক্লিনিকে নেয়া যাবে না। জ্বরের মধ্যে প্রলাপ বকুক, সব বলে দিক, আর ফেঁসে যাই আমরা…!'

'চিন্তা করবেন না, সেদিকটা আমরা দেখব,' বলল ডিক। 'চোখ যা দেখে না, হৃদয় তা নিয়ে কাতর হয় না।' ধরাধরি করে পিটারকে গাড়িতে তুলল ওরা। গাড়ির ব্যাক সীটে নিষ্প্রাণ বস্তার মত পড়ে থাকল পিটার, গোঙাচ্ছে। ওদের পিছু নিয়ে গ্যারেজের সামনে এসে দাঁড়াল বুলহ্যাম।

'দেখো, কেউ যেন আবার খুঁজে না পায় ওকে,' চাপা কণ্ঠে বলল সে। 'এমনভাবে ঝামেলা মেটাবে যেন…।'

'জানি, আপনাকে বলে দিতে হবে না!' রুক্ষ ভঙ্গিতে বলল ডিক। গাড়ি ছেড়ে দিল কার্টার, লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল বুলহ্যাম।

পাহাড়ী পথ ধরে পঁয়ত্রিশ মিনিট গাড়ি চালাল কার্টার, দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। পিছনে অবিরাম গোঙাচ্ছে পিটার, অসম্ভব দুর্বল হয়ে পড়ায় গলা থেকে স্পষ্ট কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। সেদ্ধ করা শুয়োরের যে মাংস বুলহ্যাম তাকে খাইয়েছে, সেটা বাসি ও পচা ছিল, পোকা ধরা, শুধু মাছ ধরার টোপ হিসেবে ব্যববহার যোগ্য। সালমোনেলা মারাত্মক একটা বিষ। পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। সাথে সাথে চিকিৎসা করা না হলে রোগীর অবস্থা খারাপ হতে থাকে, তবে খুব দ্রুত নয়।

পিটারকে ওরা একটা পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে নামাল। ঝর্ণার ঠাণ্ডা পানি খেতে বলা হলো তাকে, খেলে নাকি তার পেট ব্যথা কমে যাবে। অতিকষ্টে ঝর্ণার পানির দিকে মাথা নোয়াল পিটার। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে বমি করছে সে, শরীরে শক্তি বলে কিছুই নেই, পিঠে ডিকের হাতের চাপ বাড়ছে অনুভব করেও কিছু করার থাকল না তার। এরপর তার মাথার পিছনে হাত রেখে নিচের দিকে চাপ দিল কার্টার। মাথাটা পানির নিচে ডুবে গেল।

পিটারের পাসপোর্ট পিটারের পকেটে ঢুকিয়ে দিল ওরা। লাশটা ধরাধরি করে ঝর্ণার পাশে, পাহাড়ী পথের ওপর রাখল। কেউ না কেউ দেখতে পাবে। দীর্ঘ তদন্তের পর প্রমাণ হবে, আই বি এ-র এই একটা লোকই, পিটার গুডউইল, ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিল—ডিক আর কার্টারের নাম কেউ জানবে

না। পিটারের সাথে ওদের দু'জনকে কেউ কখনও দেখেনি।

ফেরার পথে ডিক বলল, 'বুলহ্যামের বোটে চড়েই কেটে পড়ব আমরা। টাকাটা আদায় হওয়ামাত্র।'

'সাথে মেয়ে দুটোকেও নেব কিন্তু!'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।এই টেনশনের পর খানিকটা রিল্যাক্সেশন দরকার।'

মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমাল রানা। শরীরে কোন ক্লান্তি বা অবসাদ নেই। শাওয়ার সেরে কাপড় পরল, দমন করল সাগরে নামার ঝোঁকটা। গাড়ি করে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল ওকে কাসিম। টাওয়ারে উঠল ও। অ্যাগানিসটেস এখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মনিটর স্ক্রীনের দিকে, সম্পূর্ণ সতর্ক। 'কিছুই ঘটেনি, মি. রানা,' বলল সে। 'আমাদের অচিন পাখি সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

তার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'যাও, তুমি এবার ঘুমাতে যাও।'

দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নাড়ল অ্যাগানিসটেস। 'জী-না, মি. রানা! আরও দু'এক ঘণ্টা জেগে থাকলে মারা যাব না। টেক-অফটা দেখব আমি।'

'তুমি কি উদ্বিগ্ন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি কেন উদ্বিগ্ন হতে যাব, মি. রানা? প্লেনে তো আপনি থাকবেন!'

হেসে ফেলল রানা। কাসিম, গোনজালেস আর অ্যাগানিসটেসের মত খুব কম লোককেই বিশ্বাস করে ও।

খানিক পর একটা ক্যাসেট নিয়ে এল আনসার। গোনজালেস চিরকুটে লিখেছে, 'শান্ত ছিল রাতটা। শুধু পিটার অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওরা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।'

টেপটা শোনার পর বুঝতে অসুবিধে হলো না, পিটারকে ওরা খুন করার জন্যে নিয়ে গেছে। পুলিসে খবর দেয়ার কথা ভাবল রানা, তবে চিন্তা বাতিল করে দিল সাথে সাথে। আইনের সাথে জড়িয়ে পড়ার সময় এটা নয়। তাছাড়া, শতকরা একশো ভাগ সম্ভাবনা পিটার ইতোমধ্যে মারা গেছে।

চীফ এঞ্জিনিয়ার শামসুদ্দিন আহমেদ পৌঁছুল, পৌঁছুলেন প্রফেসর গিলবার্ট। ওদের সঙ্গে নিয়ে মাঠ পেরুল রানা, চলে এল অচিন পাখির কাছে। টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে আছে প্লেনটা, দেখে গর্বে ফুলে উঠল রানার বুক। কত বিমানই তো আছে, কিন্তু অচিন পাখির মত এত সুন্দর একটাও নেই। আকৃতিটাই এমন, দেখে মনে হয় ওড়ার অপেক্ষায় ব্যাকুল একটা পাখি। প্লেনে উঠল ওরা, সরাসরি ককপিটে ঢুকল। 'মাসুদ ভাই, আমি চেক করব, নাকি আপনি?' জানতে চাইল শামসুদ্দিন আহমেদ।

'আমি,' বলল রানা।

এরইমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছেন প্রফেসর গিলবার্ট, টর্চের আলো ফেলে ওদের চোখ পরীক্ষা করছেন—নেশার প্রাথমিক লক্ষণ দেখতে পাবার আশায়। ওদের পালস্‌রেট নিলেন তিনি, হার্ট-বিট চেক করলেন, চামড়ার তাপমাত্রা দেখলেন। সব স্বাভাবিক। শুরু হলো প্রি-ফ্লাইট চেক। প্লেনের প্রতিটি কলকজা ঠিকমত কাজ করছে। উদ্বিগ্ন চেহারা, প্রফেসর গিলবার্টের দিকে তাকাল রানা। 'সবই তো দেখছি ঠিক আছে!'

'ঠিক থাকারই তো কথা, মি. আহমেদ যদি কাল রাতে তাঁর দায়িত্ব ঠিকমত পালন করে থাকেন,' বললেন প্রফেসর। 'সারাটা রাত এতগুলো লোককে খাটালাম আমরা, সবাই মিলে পাহারা দিল, অথচ আপনি অভিযোগের সুরে বলছেন সব ঠিক আছে··· যেন ঠিক না থাকাই উচিত ছিল।'

'প্রফেসর, ব্যাপারটাকে আপনি ডিক ব্রুসের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখুন। আই বি এ-র স্টাফ সে। আমাদের পদ্ধতি সম্পর্কে সবই তার জানা আছে। জানা বলেই জহির আব্বাসকে ড্রাগ খাওয়াতে পারে সে, ডাফ ডানকানকে ফাঁদে ফেলে। তারপর ড্যানি ফেটাসকে সরিয়ে দেয়, সুবীর নন্দীকে ড্রাগ খাওয়ায়। আপনি জানেন, সুবীরের কলম পকেটমার হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা জানতে কত সময় লেগেছে আমাদের। ঠিক আছে, বুঝলাম, কাল রাতে তাকে আমরা বাই-মেটালটা উল্টো করে বসাতে দেখেছি—টেলিভিশনে। কিন্তু আমরা কি করেছি সে তা দেখেনি, তাই না?

'অথচ ডিক ব্রুসের জানার কথা, আজ সকালে টেক-অফ করার আগে প্লেনটা আমি চেক করব—করবই, তাই না? আর চেক করলে ধরা পড়ে যাবে যে বাই-মেটালটা উল্টো করে বসানো হয়েছে। এই ধরা না পড়ার জন্যেই জহির আব্বাস আর সুবীর নন্দীকে ড্রাগ খাইয়েছিল সে। তাহলে, আমাকে কেন খাওয়ায়নি?'

'কারণ সে জানত না যে আপনিই চেক করবেন। সবাইকে ড্রাগ খাওয়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

চীফ এঞ্জিনিয়ার বলল, 'জ্যামাইকায় আসার পর থেকে অচিন পাখিকে কড়া পাহারার মধ্যে রাখা হয়েছে, কাজেই ডিক ব্রুস ধরে নিয়েছে আজ সকালে চেক করা হবে না। পাইলট টেক-অফের আগে চেক করে, কিন্তু বাই-মেটাল টেস্ট করা হয় না।'

ব্যাখ্যাটা রানার পছন্দ না হলেও, এরচেয়ে ভাল কোন ব্যাখ্যা আর নেইও। ডিক ব্রুস নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছে বাই-মেটাল টেস্ট হবে না। লন্ডন থেকে নিরাপদে জ্যামাইকায় পৌঁচেছে প্লেনটা, পৌঁছুবার পর কড়া পাহারার মধ্যে রাখা হয়েছে ওটাকে, তারপর আর এ-কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে বাই-মেটালে হাত দিতে পেরেছে কেউ। পাইলট প্রি-ফ্লাইট চেক অবশ্যই করবে, কিন্তু বাই-মেটাল টেস্ট করবে না।

প্লেন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। রানার মনের অবস্থা অদ্ভুতই বলা যায়—নিশ্চিত অথচ নিশ্চিত নয়।

আগেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে যার যার লাগেজ কামরার বাইরে রেখে দিতে হবে। ছোট হাত ব্যাগ ছাড়া সাথে কেউ কিছু বহন করতে পারবেন না।

সাড়ে সাতটার খানিকপর লাগেজগুলো সংগ্রহ করে ট্রাকে তুলল হোটেলের ওয়েটার আর পোর্টাররা। তোলার আগে প্রতিটি ব্যাগ ও সুটকেস পরীক্ষা করা হলো, দেখা হলো ঠিকমত তালা দেয়া আছে কিনা। একজন

ওয়েটার ডিউক আর তাঁর প্রতিবেশী এক প্রিন্সের ব্যাগ তুলে আনছে। করিডর ধরে আসছে সে, ডান দিকে বাঁক ঘুরে রিসেপশন ডেস্কটাকে এড়িয়ে গেল, স্যাৎ করে ঢুকে পড়ল ছোট একটা কামরায়। এখানে ঝাড়ু, ভ্যাকুম ক্লীনার ইত্যাদি রাখা হয়। পকেট থেকে চাবি বের করল সে, কাল রাতে বানিয়েছে ওটা। আগের রাতে হুইস্কি নিয়ে কামরায় ঢোকার সুযোগে সুটকেসের চাবির যে ছাপটা নিয়েছিল, সেটারই কপি এটা। ডিক ব্রুসের দেয়া জিপার কেসটা ডিউকের সুটকেসে ভরল ওয়েটার, সুটকেস আবার বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল। নিঃশব্দে, চুপিসারে কামরা থেকে বেরিয়ে এল করিডরে। কেউ তাকে দেখল না।

বাইরে বেরিয়ে এসে ট্রাক-এর পাশে দাঁড়ানো গার্ডের হাতে সুটকেস দুটো তুলে দিল ওয়েটার। শাহেদ ইকবালের উপস্থিতিতে ওগুলো চেক করল গার্ড, দুটোতেই তালা দেয়া রয়েছে। ডিউকের সুটকেস তাড়াহুড়ো করে বন্ধ করতে গিয়ে, লক্ষ করেনি ওয়েটার, ডিউকের পপ-পা'জামার একটা অংশ বাইরে বেরিয়ে রয়েছে।

'কার ব্যাগ ওটা?' জানতে চাইল শাহেদ, হাত তুলে দেখাল ঝুলে থাকা কাপড়টা। লেবেলটা পড়ল গার্ড। 'ডিউককে তো বলতে হবে। কারও রাতের পোশাক লোকজন দেখবে...এ কেমন কথা!'

দুর্ভাগ্যজনক হলো, শতো ব্যস্ততার মধ্যে কথাটা ভুলেই গেল শাহেদ। ইতোমধ্যে প্লেনে গিয়ে উঠেছেন ডিউক, তাঁর সুটকেসটাও তুলে ফেলা হয়েছে হোল্ডে—গায়ে কাস্টমসের টিক চিহ্ন।

স্যাম বুলহ্যামকে চাই রানার। কাজেই গাড়ি করে ওকে কালাহান বীচে নিয়ে এল কাসিম। গুইসেপিকে একটা ভিজিটিং কার্ড দিল রানা, গুইসেপি সেটার ওপর চোখ না বুলিয়ে সরাসরি মনিবের কাছে নিয়ে গেল। সুইমিং পুলে মাত্র দৈনন্দিন সাঁতার শুরু করেছে বুলহ্যাম। ফিরে এসে সোজা ভেতরে ঢোকার অনুরোধ করল গুইসেপি। 'আমি পথ চিনি,' বলল রানা, বাড়ির স্ক্রীন ঘেরা করিডর ধরে পা বাড়াল। পানিতে যথেষ্ট আলোড়ন তুলছে বুলহ্যাম, প্রচুর শক্তি ব্যয় হলেও তেমন নৈপুণ্য দেখাতে পারছে না। 'রানা, গ্রেট টু সি ইউ! কাপড় খুলে তুমিও নেমে পড়ো না!' আহ্বান জানাল সে।

পুলের কিনারায় অপেক্ষায় থাকল রানা। দশবার এপার-ওপার করে ক্ষান্ত হলো বুলহ্যাম, লাফ দিয়ে উঠল, খপ করে তুলে নিল বাথ রোবটা। সীটের ওপর একটা তোয়ালে ভাঁজ করা রয়েছে, সেটা তুলে নিয়ে বুলহ্যামের দিকে এগোল রানা। এগোবার সময় পকেট থেকে ওয়েবলি পিস্তলটা বের করে তোয়ালের সাথে জড়িয়ে নিল।

তোয়ালের জন্যে হাত বাড়াল বুলহ্যাম। অপর হাতটা কানের ভেতর ঢুকিয়ে ঝাঁকি দিচ্ছে সে, কান থেকে পানি বের করছে, মাথাটা কাত হয়ে আছে একদিকে। কথাগুলো শুনে তার মনে হলো, হয় সে ভুল শুনছে, নয়তো পাগল হয়ে গেছে রানা।

'তোয়ালের নিচে পিস্তল রয়েছে, বুলহ্যাম। যা বলব শুনবে তুমি, তা না হলে গুলি করব।'

'তুমি···কি? কি বললে তুমি?'

'বললাম, এবং কথাটা শেষ আরেকবার বলছি: তোয়ালের নিচে পিস্তল রয়েছে, আমার নির্দেশ মত কাজ না করলে তোমাকে গুলি করা হবে। শুনতে পেয়েছ কিনা বলো।'

'পেয়েছি, হ্যাঁ, কিন্তু কি ব্যাপার···তুমি আমাকে কিডন্যাপ করছ?'

'কোন প্রশ্ন নয়, বুলহ্যাম। বাড়ির পাশ ঘেঁষে এগোও, সোজা আমার গাড়িতে গিয়ে উঠবে। গাড়িতে ওঠার সময় চিৎকার করে একটা কথাই বলবে তুমি—আমার দেরি হবে না, গুইসেপি। যদি অন্য কোন শব্দ বেরোয়, তোমাকে আমি খুন করব।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, রানা? সামান্য ক'টা শেয়ারের জন্যে তুমি আমাকে কিডন্যাপ করবে?'

'তিন পর্যন্ত গুনব, বুলহ্যাম। গাড়ির দিকে হাঁটতে না দেখলে তোমার হাঁটুর ওপর গুলি করব।' দূর থেকে দেখে মনে হবে, দু'জন লোক খোশ-গল্প করছে।

প্যান্ট আর শার্ট পরল বুলহ্যাম। 'তোমার মত বুদ্ধিমান একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এ-ধরনের পাগলামি আমি আশা করিনি,' বলল সে। 'ব্যবসাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই, তাই বলে···কিন্তু আমাকে কিডন্যাপ করে লাভ কি তোমার? ভেবেছ আইনের হাত থেকে বাঁচতে পারবে?' ইতোমধ্যে হাঁটতে শুরু করেছে সে, সামনে দেখা গেল লিংকন কন্টিনেন্টালটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ির দোরগোড়ায় উদয় হলো গুইসেপি।

রানার দিকে তাকাল বুলহ্যাম। 'আমার বেশি দেরি হবে না, গুইসেপি। এই ভদ্রলোকের সাথে একটা কাজ সেরে আসি।'

'ঠিক আছে, গাড়িতে ওঠো,' বলল রানা। 'সামনের সীটে।'

কাসিমের পাশে উঠে বসল বুলহ্যাম। সদ্য গোসল করলেও, দরদর করে ঘামছে সে। মেদবহুল শরীর, উত্তেজনায় হাঁসফাঁস করছে। বাড়ির সামনে থেকে ফিরতি পথ ধরল লিংকন কন্টিনেন্টাল। গাড়িপথ ধরে এগোচ্ছে ওরা, আরেকটা গাড়িকে এদিকে আসতে দেখা গেল। হোয়াইট ডাক ইউনিফর্ম পরা এক লোক বসে আছে পিছনের সীটে, তার উদ্দেশে একটা চোখ টিপল রানা। অ্যাগানিসটেসও এক গাল হেসে সাড়া দিল। গাড়িতে তার সাথে দু'জন পুলিস রয়েছে। গাড়িপথ ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসছে লিংকন কন্টিনেন্টাল, আরও একটা গাড়ি ভেতরে ঢুকল। তৃতীয় গাড়িটার পিছনের সীটে বসে রয়েছে গোনজালেস। তার সাথেও রয়েছে দু'জন ইউনিফর্ম পরা পুলিস।

'ঈশ্বরের দোহাই, এসব কি ঘটছে?' জিজ্ঞেস করল বুলহ্যাম। 'শোনো, রানা, তুমি আমার ব্যবসায়িক বন্ধু। একটা ডিলে গড়বড় করেছি, সেজন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু আমাকে তোমার জানাতে হবে আসলে কি ঘটছে। দু'জনই আমরা পরিণত মানুষ, মাত্র কয়েকটা শেয়ারের জন্যে আমরা

ছেলেমানুষি করতে পারি না…।'

'দুই মিলিয়ন শেয়ার, বুলহ্যাম, মাত্র কয়েকটা নয়। ঘাড় সোজা করো, সামনের দিকে ফেরো,' আদেশ করল রানা।

'লোকজন দেখতে পেলেই আমি চেঁচাব!'

জবাবে তার মাথায় পিস্তলের বাট দিয়ে সজোরে আঘাত করল রানা। টুঁ-শব্দটিও না করে জ্ঞান হারাল বুলহ্যাম, সীট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল তার শরীর। 'গাড়ি থামাও,' নির্দেশ দিল রানা, যদিও বলার দরকার ছিল না, কারণ এরইমধ্যে ব্রেক কষে গাড়িটাকে রাস্তার এক পাশে থামাতে শুরু করেছে কাসিম। প্রফেসর গিলবার্টের সরবরাহ করা একটা ইঞ্জেকশন পুশ করা হলো বুলহ্যামকে। তারপর রানা বলল, 'এয়ারপোর্ট চলো।'

প্রায় একইভাবে ডিক ব্রুসকেও গাড়িতে তুলে নিল অ্যাগানিসটেস। ঘুমোচ্ছিল সে। ঘুমোচ্ছিল উইলিয়াম কার্টারও, তাকে কিডন্যাপ করল গোনজালেস। গুইসেপি ছুটে আসছে দেখে জ্যামাইকান পুলিসের ইউনিফর্ম পরা এক লোক তার সামনে দাঁড়াল, নিচুস্বরে কথা বলল সে, তার কথা শেষ হতেই ভিজে বেড়ালের মত বাড়ির ভেতর দিকে ফিরে গেল গুইসেপি—কিছুই জানে না সে, কিছুই দেখেনি।

সরাসরি অচিন পাখিতে তোলা হলো ওদেরকে, ঢোকানো হলো তিনটে টয়লেট কেবিনেটে। তার আগে প্রফেসর গিলবার্ট তিনজনকেই পরীক্ষা করলেন। 'ঘন্টাখানেকের মধ্যে ওদের জ্ঞান ফিরবে না,' বললেন তিনি। 'তবু নজর রাখছি আমি।'

'যদি দরকার হয়, এক ঘন্টার বেশি ওদেরকে অজ্ঞান রাখা যাবে না?'

'আপনি চাইলে ওদেরকে আমি আটচল্লিশ ঘন্টা বেহুঁশ করে রাখতে পারি।'

'আর যদি জ্ঞান ফেরাবার দরকার হয়?'

'যখন বলবেন তখনই ফিরিয়ে আনব। অ্যানটিডোট কাজ করবে পাঁচ মিনিটে।'

তিনটে টয়লেট কেবিনেটের বাইরে 'আউট অভ অর্ডার' কার্ড লটকে দিল রানা। অচিন পাখি থেকে নেমে টাওয়ারে চলে এল ও। দুটো টেলিগ্রাম পাঠাল—একটা কোস্টাস মেননকে, অপরটা রোমবার্ট পেরেজকে। টেলিগ্রামে বলা হলো, 'তোমাদের উপস্থিতি খুবই জরুরী। ইয়ট ক্লাবে নোঙর করা বনবনে মিলিত হও। মাছ ধরার নাম করে বোট নিয়ে চলে যাও গভীর সাগরে। আমি স্পীডবোট নিয়ে তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমার সাথে যোগাযোগ কোরো না।' দুটো টেলিগ্রামই স্যাম-এর নামে পাঠানো হলো। স্যাম বুলহ্যামের জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে না এসে পারবে না ওরা। বোট নিয়ে গভীর সাগর অভিমুখে রওনা হবে।

সাগরের পাশে, টেরেসে বসে ব্রেকফাস্ট সারলেন অতিথিরা। তাঁদের কেউ কেউ স্ফটিকস্বচ্ছ ক্যারিবিয়ান পানিতে সাঁতরানোর শেষ সুযোগটা হাতছাড়া

করেননি। দৈনিক খবরের কাগজের অনুপস্থিতিতে ব্রেকফাস্ট আলোচনা ঠিক জমল না, তবে দারা শিকদার জ্যামাইকান গ্লিনার থেকে ওয়াল স্ট্রীট ক্লোজিং প্রাইস-এর একটা টেলিটাইপ সংগ্রহ করেছেন। সারা দিনে আই বি এ-র শেয়ার আরও ত্রিশ পয়েন্ট নেমে গেছে, তবে অতিথিরা কেউই এমন কৌশলহীন নন যে এ-ব্যাপারে কোন মন্তব্য করবেন। ইংলিশ আবহাওয়ায় ফিরে যেতে হচ্ছে বলে খেদ প্রকাশ করলেন অনেকে। খানিক পর দারা শিকদার ঘোষণা করলেন, হাতব্যাগ সংগ্রহ করার সময় হয়েছে, একটু পরই রওনা হতে হবে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে। তার কথা শেষ হতেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন একজন ব্যারন। ছোট একটা ভাষণ দিলেন তিনি।

ব্যারন বললেন, আই বি এ আয়োজিত এই ভ্রমণ একটা রহস্য। তবে এমন আতিথেয়তা দেখানো হয়েছে, জীবনে কখনও ভুলবেন না তিনি। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন, অচিন পাখি অতুলনীয়, তাঁর ভাষায় স্বর্গীয় বাহন। মাসুদ রানা ও দারা শিকদারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ভাষণ শেষ করলেন তিনি। সবাই তুমুল করতালি দিলেন।

হোটেলের বাইরে গাড়ির বহর অপেক্ষা করছে। কোন হাঙ্গামা হলো না, সুশৃঙ্খলভাবে গাড়িতে চড়ে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন সবাই। এয়ারপোর্টে পৌঁছে কাস্টমস শেডের সামনে দিয়ে মার্চ করে এগোলেন তাঁরা, কারও কোন লাগেজ চেক না করেই হাত নেড়ে সবাইকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন চীফ কাস্টমস অফিসার। সবাই জানে, তাঁরা কেউ স্মাগলার বা হাইজ্যাকার নন।

টার্মিন্যাল ভবনের সামনে পার্ক করা রয়েছে অচিন পাখি। সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন অতিথিরা। ইতোমধ্যে পরস্পরের সাথে অনেকের হৃদ্যতা জন্মেছে, তাঁরা দল বেঁধে বসলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল, সেই সাথে শুরু হলো কেবিন প্রেশারাইজেশন। প্লেনটাকে ধীরে ধীরে রানওয়ের শেষ মাথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা ট্র্যাক্টর। ওখানে পৌঁছে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল অচিন পাখি, টাওয়ারের ক্লীয়ার‍্যান্স পাবার জন্যে। তারপর শুরু হলো টেক-অফ পর্ব।

নিরাপদে আকাশে উঠে এল অচিন পাখি।

উৎফুল্ল ডিউক যেন উৎসবে মেতে রয়েছেন, স্টুয়ার্ডেসকে ডেকে বললেন, 'জানি খুব বেশি চাওয়া হয়ে যাচ্ছে, তবু বলছি, এক গ্লাস শ্যাম্পেন হবে নাকি, মাই ডিয়ার?'

আই বি এ-র বিমান বালা তমা স্মিত হেসে বলল, 'কেন হবে না!' দু'মিনিটের মধ্যে ডিউককে শ্যাম্পেন পরিবেশন করা হলো, সাথে বালতি ভরা বরফও রয়েছে। শ্যাম্পেনের বোতল খোলার সময় পপ করে একটা শব্দ হলো। শব্দটা হলো মোট সাতবার, ডিউকের দেখাদেখি অন্যান্য অতিথিরাও শ্যাম্পেনের ভক্ত হয়ে উঠলেন।

দারা শিকদার আর প্রফেসর গিলবার্টের সাথে প্লেনের সামনে বসেছে রানা। চীফ এঞ্জিনিয়ার শামসুদ্দিন আহমেদ বসেছে ককপিটে। ককপিট থেকে বেরিয়ে আসতেই তার দিকে ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল রানা। 'গুড টেক-

অফ?' জিজ্ঞেস করল ও, যদিও চীফ এঞ্জিনিয়ার জানে আরও হাজারটা প্রশ্ন মাথা কুটছে মাসুদ ভাইয়ের মাথায়।

'সব ঠিক আছে, মাসুদ ভাই। স-ব।'

সীটে হেলান দিল রানা, ঢিল পড়ল পেশীতে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। অকারণ ভয় পাচ্ছে ও। চীফ এঞ্জিনিয়ার যদি বলেন সব ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই সব ঠিক আছে। অচিন পাখি ওদেরকে নিরাপদেই লন্ডন নিয়ে যাবে।

অবশ্য কপালের ওপর কারও হাত নেই।

শান্তভাবে দাঁড়াল রানা, গোটা প্লেনের ওপর চোখ বুলাল। সবাই হাসিখুশি, যে-যার সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সাথে গল্পে মশগুল। কফি ও শ্যাম্পেন পরিবেশন করা হয়েছে। কারও চোখে না পড়ে প্রফেসরকে ইঙ্গিত দিল ও। দু'জন স্টুয়ার্ডকে হাতছানি দিয়ে ডাকল রানা, তাদেরকে ওর পাশে দাঁড়াতে বলল। দেখে মনে হবে, আলোচনা করছে ওরা। তিনজনের তৈরি আড়াল পেয়ে প্রতিটি টয়লেট কেবিনেটের ভেতর ঢুকলেন প্রফেসর গিলবার্ট, এক এক করে ইনজেকশন দিলেন উইলিয়াম কার্টার, স্যাম বুলহ্যাম ও ডিক ব্রুসকে। সম্পূর্ণ শান্তভাবে নিজের সীটে ফিরে এলেন তিনি। রানাও নিজের সীটে বসল, দারা শিকদারের পাশে। স্টুয়ার্ড দু'জন পিছু হটল, কেবিন আর টয়লেটের মাঝখানে পজিশন নিল তারা।

প্রথমে বেরিয়ে এল উইলিয়াম কার্টার। রানা দেখল, প্রথমে সামান্য একটু ফাঁক হলো দরজাটা, তারপর আরও, আরও একটু, বাইরে উঁকি দিল কার্টারের মুখ। নেশাগ্রস্ত, আচ্ছন্ন লাগল তাকে। টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল সে, হাবভাব দেখে মনে হলো ঠিক যেন জেগে নেই, স্বপ্নের মধ্যে হাঁটছে। ফ্যালফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকাল সে। রহস্যটা বুঝতে পারছে না। তারপর হঠাৎ আরোহীদের পরিচিত মুখগুলো চিনতে পারল, চিনতে পারল রানাকে, সেই সাথে হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল আইল-এর ওপর। সাথে সাথে ছুটে এল স্টুয়ার্ডরা, ধরাধরি করে তুলে বসিয়ে দিল একটা খালি সীটে। অতিথিদের খোশগল্পে প্রায় কোন ছেদই পড়ল না।

এরপর এল স্যাম বুলহ্যাম। তার চেহারাই বলে দিল, সম্পূর্ণ সজাগ সে, জানে কোথায় রয়েছে। টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল যেন একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড়। আক্রোশে ফোঁস ফোঁস করছে সে, চোখ দুটো বিস্ফারিত, দাঁত চাপছে, কাকে যেন খুঁজছে পাগলের মত। তারপর গর্জে উঠল, 'তোমার মরণ ঘনিয়েছে, রানা! আজ তোমাকে আমি জাহান্নামে পাঠাব!' রানার গলা ধরার জন্যে হাত দুটো লম্বা করে দিল সে, ছুটে আসছে।

পিছন থেকে দু'জন স্টুয়ার্ড জড়িয়ে ধরল তাকে।

শুরু হলো চিৎকার আর ধস্তাধস্তি। এবার অতিথিদের মনোযোগ আকৃষ্ট হলো। কে লোকটা? মি. মাসুদ রানাকে হুমকি দিচ্ছে কেন? স্টুয়ার্ডরাই বা তাকে কেন ওভাবে ধরে রেখেছে?

'জাহান্নামে যাও তুমি, রানা!' টকটকে লাল হয়ে গেছে বুলহ্যামের মুখ। একই কথা বারবার বলছে চিৎকার করে, 'কি করছ নিজেও জানো না! কি

সর্বনাশ করছ নিজেও জানো না!'

কয়েকজন অতিথি ভাল করে দেখার পর তাকে চিনতে পারলেন। অতীতে তাঁরা তার সাথে ব্যবসা করেছেন। ডিউক স্বয়ং আইল ধরে ছুটে এলেন। 'ভদ্রলোককে ছেড়ে দাও!' বললেন তিনি। 'উনি মি. বুলহ্যাম, মি. স্যাম বুলহ্যাম। আমি ওঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। ছাড়ো! ওঁর পক্ষে আমি কথা বলছি!'

রিপোর্টাররা উপলব্ধি করল, এটাই হলো তাদের সেই প্রত্যাশিত গল্পের সূচনা। ভিড় ঠেলে সামনে এগোবার চেষ্টা করল তারা। অতিথিরা ইতোমধ্যে যে যার সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, জটলা পাকাচ্ছেন আইলের ওপর।

ডিউকের দিকে ফিরল রানা। 'প্লীজ, বসুন, ইওর গ্রেস,' বলল ও। 'কারও গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না।' দারা শিকদারকে ইশারা করল ও, দারা শিকদার এগিয়ে গিয়ে ডিউকের পথরোধ করে দাঁড়ালেন, বসার জন্যে অনুরোধ করলেন সবাইকে।

ইতোমধ্যে স্টুয়ার্ডদের নিয়ে ডেকের মাঝখানে চলে এসেছে স্যাম বুলহ্যাম। এখনও চিৎকার করছে সে, তবে গলার স্বরটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। 'প্লেন ঘুরিয়ে নিতে হবে!' গলার রগ ফুলে উঠল তার। 'এই মুহূর্তে ফিরে যেতে হবে মন্টেগো বে-তে!'

একজন স্টুয়ার্ড এগিয়ে এসে রানার হাতে একটা মাইক্রোফোন ধরিয়ে দিল। বোতামে চাপ দিয়ে মাইক্রোফোনের মাউথপীসটা মুখের সামনে তুলল রানা। 'শান্ত হোন, সবাই শান্ত হোন, প্লীজ-প্লীজ-প্লীজ!...উইল এভরিবডি বি...কোয়ায়েট।' হৈ-চৈ থেমে গেল ধীরে ধীরে। 'এবার সবাই যে যার সীটে বসুন।'

প্লেনের সামনের দিকে অনেক সীট খালি পড়ে ছিল, এখন সেগুলোর একটাও খালি নেই। অতিথিদের সামনে, ডেকের ওপর ব্যাঙ-এর আকৃতি নিয়ে বসে রয়েছে বুলহ্যাম, তাকে পিছন থেকে চারহাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছে দু'জন স্টুয়ার্ড। 'সিধে করো ওকে,' ফিসফিস করল রানা। দেখল, ব্যাগ খুলে একটা সিরিঞ্জ আর অ্যামপুল বের করছেন প্রফেসর। মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে রানা বলল, 'কেউ যেন দেখতে না পায়!'

ঘাড় সোজা করে অতিথিদের দিকে তাকাল রানা। 'জেন্টলমেন, উনি স্যাম বুলহ্যাম, আপনাদের অনেকেই তাঁকে চেনেন। যাঁরা চেনেন না তাঁদেরকে জানাচ্ছি, স্যাম বুলহ্যাম একজন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজার। স্যাম বুলহ্যাম এইমাত্র অনুরোধ করেছেন, প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে আমরা যেন মন্টেগো বে-তে ফিরে যাই।'

'রানা, তোমার দোহাই লাগে, দেরি কোরো না! ঘুরিয়ে নাও, প্লেন ঘুরিয়ে মন্টেগো বে-তে ফিরে চলো!' এখন আর চিৎকার করছে না বুলহ্যাম, যদিও তার কথা শুনতে পেল সবাই। ঘামছে সে, হাঁপাচ্ছে।

'কেন, বুলহ্যাম?'

'কারণ প্লেনে গোলমাল আছে...স্যাবোটাজ করা হয়েছে।'

'স্যাবোটাজ মানে?'

'স্যাবোটাজ মানে প্লেনটা বিধ্বস্ত হতে যাচ্ছে, রানা! আমার মরা মায়ের কিরে, আমার কথা না শুনলে সবাই মারা পড়ব! ফর গডস সেক, কতক্ষণ আকাশে রয়েছি আমরা?' আবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচাল সে। 'টেক-অফ করার পর ক'মিনিট পেরিয়েছে?'

'পনেরো মিনিট,' বলল রানা।

'তোমার অচিন পাখি স্যাবোটাজ করা হয়েছে, আমার কথা বিশ্বাস করো! যীশুর কিরে. আর পনেরো মিনিট পরই বিধ্বস্ত হবে প্লেন!'

নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল পরিস্থিতি। প্লেন বিধ্বস্ত হতে যাচ্ছে শুনে উপস্থিত সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। সবাই একসাথে কথা বলছে, ফলে কারও কথা শোনা যাচ্ছে না। পুরো ত্রিশ সেকেন্ড একনাগাড়ে চিৎকার করার পর বাইকে শান্ত করতে পারল রানা। তারপর মাইক্রোফোনে বলল, 'শান্ত হান আপনারা। পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে হলে মি. বুলহ্যামকে জেরা করতে বে আমাদের। আপনারা হৈ-চৈ করলে তাঁর কথা শুনব কিভাবে?'

মাইক্রোফোনটা বুলহ্যামের মুখের সামনে ধরল রানা। 'যা বলার পরিষ্কার করে বলো, বুলহ্যাম। বলো কিভাবে স্যাবোটাজ করা হয়েছে প্লেন। বলো কে করেছে। আর কেন করেছে। তারপর না হয় আমরা বারমুডায় ল্যান্ড করব।'

'টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো আমি জানি না,' বলল বুলহ্যাম, তার কণ্ঠে আবেদন, কথা বলছে ফিসফিস করে। 'আমি শুধু জানি প্লেনের কোন পার্টসে এমন কিছু করা হয়েছে, ত্রিশ মিনিট ওড়ার পর ইলেকট্রিক্স থাকবে না, আকাশ থেকে খসে পড়বে অচিন পাখি।'

'কাজটা করল কে, বুলহ্যাম?'

'ফর গডস সেক, কে করল তাতে কি আসে যায়!'

'কে করল বুলহ্যাম?'

'লোকটার নাম ডিক ব্রুস। আই বি এ-র স্টাফ, হেড প্ল্যান্টে কাজ করে...।'

'কার হুকুমে কাজটা করল সে?'

'তুমি কি প্লেনটা ঘোরাবে?'

'কার হুকুমে কাজটা করল সে, বুলহ্যাম?' রানা শান্ত।

'ঠিক আছে...জাহান্নামে যাও...আমার হুকুমে।'

'তোমার সাথে আর কে আছে, বুলহ্যাম?'

চিৎকার করল বুলহ্যাম। 'প্লেন ঘোরাও!'

'তোমার সাথে আর কে আছে, বুলহ্যাম?'

হাঁ করে শুনছে সবাই। সবার মাথায় একটাই প্রশ্ন, মি. রানা প্লেন ঘুরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন না কেন? মাটিতে নামার পরও তো লোকটাকে জেরা করা যায়, তাই না?

'ঠিক আছে, বুলহ্যাম। নামগুলো আমিই তোমাকে বলছি। তুমি, কোস্টাস মেনন আর রোমবার্ট পেরেজ। তিনজন মিলে একটা সিন্ডিকেট গঠন করো। তোমাদেরকে টাকা যোগায় বিভিন্ন এভিয়েশন কোম্পানী, ঠিক?'

'গো টু হেল!'

'আমি চাইছি তুমি সব কথা স্বীকার করো, বুলহ্যাম,' বলল রানা। 'অযথা সময় নষ্ট করা কি ঠিক হচ্ছে?'

সিধে হয়ে দাঁড়াল বুলহ্যাম। কাঁধ ঝাঁকাল। তার গা থেকে হাত সরিয়ে নিল স্টুয়ার্ডরা, তবে যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থাকল। 'ঠিক আছে, বলছি। আমরা তিনজন—আমি, কোস্টাস মেনন আর রোমবার্ট পেরেজ একটা সিন্ডিকেট গঠন করি। আমি কারও প্রতিনিধিত্ব করছি না, তবে ওরা আই বি এ-র প্রতিদ্বন্দ্বী কয়েকটা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করছে বলে সন্দেহ হয় আমার। আমরা প্ল্যান করি, আই বি এ-র বারোটা বাজাব। তোমাদের একটা প্লেন ক্র্যাশ করার ব্যবস্থা করা হয়। ইতিমধ্যে মিথ্যে গুজব ছড়িয়ে তোমাদের শেয়ারের দাম কমিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে। ইচ্ছে ছিল, শেয়ারের দাম একেবারে পানি হয়ে গেলে সব আমরা কিনে নেব। খুব ভাল করেই জানি, অচিন পাখি দুনিয়ার সেরা প্যাসেঞ্জার প্লেন। জানতাম, একটা প্লেন বিধ্বস্ত হলেও তোমাদেরকে ধ্বংস করা যাবে না। তোমাদের বেশিরভাগ শেয়ার কিনে নেয়া সম্ভব হলে ইস্পাত বাংলা এয়ারক্রাফটের প্রকৃত মালিক বনে যেতাম আমরা। আমি স্বেচ্ছায়, সুস্থ মস্তিষ্কে, এই স্বীকারোক্তি দিলাম। দেখতে পাচ্ছি, রিপোর্টাররা আমার স্বীকারোক্তি লিখে নিচ্ছেন। এবার, ঈশ্বরের দোহাই লাগে, আপনারা এই উন্মাদ লোকটাকে প্লেন ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য করুন!'

এবার আর কাউকে শান্ত করা গেল না।

'অচিন পাখি বিধ্বস্ত হবে না!' কথাটা আটবার পুনরাবৃত্তি করতে হলো রানাকে। খানিকটা শান্ত হলো পরিস্থিতি। তারপর রানা বলল, 'জেন্টলমেন, এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানি আমরা। ডিক ব্রুস কাল রাতে প্লেনে স্যাবোটাজ করেছিল, কথাটা সত্যি। আমি নিজের চোখে তাকে কাজটা করতে দেখেছি। তারপর, যান্ত্রিক অসঙ্গতিটা দূর করার সময়, আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, অচিন পাখি সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

রানা থামতেই স্কিপারের গলা ভেসে এল লাউডস্পীকারে। 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, আমি আপনাদের ক্যাপটেন বলছি। এইমাত্র যে কথাগুলো বলা হলো তা আমি শুনেছি। মি. রানার সাথে সম্পূর্ণ একমত আমি, প্লেনের কোথাও কোন ত্রুটি নেই। এই মুহূর্তে তেত্রিশ হাজার ফুট ওপরে রয়েছি আমরা, ক্যাপটেন হিসেবে লন্ডন পর্যন্ত ফ্লাইট চালাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে, আপনাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোক যদি চান, প্লেনটাকে আমি বারমুডায় ল্যান্ড করাতে পারি, যদিও তার কোন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়ালেন ডিউক। 'মি. রানা, ব্যাপারটা কোন

বানানো নাটক নয় তো, আপনার আর স্যাম বুলহ্যামের যোগসাজশে?'

মাথা নাড়ল রানা। ডিউকের পিছনে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে রিপোর্টাররা। তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ও, 'আপনারা কি বলেন?'

মাইকেল হবস আনন্দে আত্মহারা। 'আমি সম্ভবত আমার জীবনের সেরা স্টোরি লিখছি।'

'আমরা কি বারমুডায় যাব, ইওর গ্রেস?' ডিউককে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বারমুডা? বারমুডা? হু দ্য হেল ওয়ান্টস টু গো টু বারমুডা? ওই জায়গা একদম পছন্দ নয় আমার!' ডিউক এ-কথা বলার পর দেখা গেল কারও আর কিছু বলার নেই। 'ওহো, আরও এক গ্লাস শ্যাম্পেন হবে নাকি, সুন্দরী?' শাড়ি পরা বিমান বালার দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপলেন বৃদ্ধ। রিপোর্টারদের ভিড় ঠেলে নিজের সীটে ফিরে গেলেন তিনি, ধপ করে বসে পড়লেন। 'উফ, কি ভয় যে পেয়েছিলাম!'

সামনের দিকে একটা সীটে নেতিয়ে পড়েছে বুলহ্যাম, তার মুখ ঝুলে পড়েছে, বুকের ওপর ঠেকে রয়েছে চিবুক।

'দু'মিনিট পর প্রেস কনফারেন্স,' ঘোষণা করলেন দারা শিকদার। 'প্লেনের পিছন দিকে। এবার নো কমেন্ট বলা হবে না।'

হাতে শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাস নিয়ে আবার এগিয়ে এলেন ডিউক। রানার বুকে আঙুল দিয়ে টোকা দিলেন তিনি। 'বাই দ্য ওয়ে, ইউ ব্লাডি ইয়ং ফুল, এত সাহস আর বুদ্ধি রাখো অথচ এটা বোঝো না যে এ-ধরনের পরিস্থিতিতে পড়লে ভয়ে কেউ প্যান্ট খারাপ করে ফেলতে পারে?' রানাকে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটালেন তিনি, কেউ তাঁকে বাধা দেয়ার আগেই তিনটে টয়লেটের একটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ধাক্কা দিয়ে দরজা খুললেন ডিউক। ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডিক ব্রুস, চেহারায় রক্ত বলতে কিছু নেই। 'দুঃখিত, ওল্ড চ্যাপ। বুঝতে পারিনি ভেতরে লোক আছে,' বললেন ডিউক, তারপর পাশের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল ডিক ব্রুস, সামান্য টলছে, চেহারায় ঘুম ঘুম ভাব। রানাকে দেখল সে, দেখল দারা শিকদারকে। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি প্লেনে রয়েছি...লন্ডনগামী অসিন পাকিতে...,' তারপর কেঁপে কেঁপে হাসতে শুরু করল, যেন একটা পাগল, ঠোঁটের দুই কোণ থেকে থুথু বেরিয়ে আসছে। 'আপনি তাহলে সবই জানতেন। কাজটা আমাকে করতে দেখেছেন। বাই-মেটালটা আবার সিধে করে বসিয়ে দিলেন, কেমন? বাহ্!'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'প্রথম থেকেই জানতাম আমরা। জহির আব্বাস, ডাফ ডানকান, সুবীর নন্দী আর বাই-মেটাল—সব কথাই জানতাম আমরা।'

'কিন্তু, মি. রানা, স্যার,' বিড়বিড় করে বলল ডিক ব্রুস, 'ডিউকের সুটকেসে যে বোমা আছে, তা-ও কি জানেন?'

রানার মনে হলো শুনতে ভুল করেছে ও। 'ডিউকের সুটকেসে কি আছে?' ডিক ব্রুসকে আড়ালে টেনে এনে ফিসফিস করে জানতে চাইল ও, কেউ যাতে ওদের কথা শুনতে না পায়।

'বোমা। আমি একটা বোমা বানিয়েছি। ডিউকের সুটকেসে রেখেছি ওটা। আমি নিজে রাখিনি, একজন ওয়েটার রেখেছে। ভেগা কটেজের ওয়েটার, আমাদের হয়ে কাজ করছিল···।'

'কি ধরনের বোমা? কি ধরনের মেকানিজম? টাইম?'

'টাইম বোমা টিক টিক করে।'

'অ্যাসিড ক্যাপসুল টিকটিক করে না।'

'না, তবে ওগুলো নির্ভরযোগ্য নয়, তাই না?'

'তাহলে কি ধরনের বোমা রেখেছ তুমি ডিউকের সুটকেসে?'

গড়গড় করে সব বলে গেল ডিক ব্রুস। শুধু বলল না, এঁকেও দেখাল রানাকে।

ডিউকের সুটকেসটা রয়েছে প্লেনের হোল্ডে।

মেঝেতে গর্ত না করে হোল্ডে পৌঁছুনোর কোন উপায় নেই।

তেত্রিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ছে প্লেন, কেবিনটা প্রেশারাইজড। হোল্ডটা প্রেশারাইজড নয়। প্লেনের মেঝেতে গর্ত করা হলে তিনটে স্কিন-এর শেষটা ফুটো হওয়ামাত্র গোটা প্লেন বিস্ফোরিত হবে।

'তুমি বলছ বোমাটা এই মুহূর্তে জ্যান্ত—আর্মড?'

'মাটি থেকে এক হাজার ফুট ওঠার সাথে সাথে আপনা থেকেই জ্যান্ত হয়ে গেছে ওটা,' বলল ডিক ব্রুস।

'কখন ওটা বিস্ফোরিত হবে?'

'আমরা দশ হাজার ফুটের নিচে নামলে।' ডিক ব্রুসের চেহারায় ভয় বা উত্তেজনার কোন ছাপ নেই, নেই কোন ইতস্তত ভাব। 'আমরা মারা যাচ্ছি,' ঘোষণা করল সে।

দারা শিকদার শুনলেন কথাটা। শুনলেন প্রফেসর গিলবার্ট। তিনজন বাদে আর কেউ কিছু জানে না এখনও। 'আর কে জানে?' ডিক ব্রুসকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি আর কার্টার।'

কার্টারের ঘুম যাতে না ভাঙে তার ব্যবস্থা করার জন্যে প্রফেসরকে অনুরোধ জানাল রানা। কার্টারকে একটা ইঞ্জেকশন দিলেন তিনি। রানার ইঙ্গিত পেয়ে বুলহ্যামকেও অজ্ঞান করলেন। স্বীকারোক্তি দেয়ার পর এমনিতেই প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল সে।

'কি করা যায়, মি. রানা?' থমথম করছে দারা শিকদারের চেহারা।

'ডিক যা বলল আপনি তার অর্থ বুঝেছেন?'

'এইটুকু যে হোল্ডে একটা বোমা আছে।'

'প্লেনটা আমরা দশ হাজার ফুটের নিচে নামাতে পারব না, নামালেই ওটা বিস্ফোরিত হবে। তারমানে, কোথাও আমরা ল্যান্ড করতে পারব না। জানা কথা, চিরকাল ওড়াও সম্ভব নয়। ফুয়েল যা আছে তাতে পাঁচ কি ছ'ঘণ্টা উড়তে পারব। তারপর কি হবে আমি জানি না।'

'আমরা লাফ দিতে পারি না?'

'দশ হাজার ফুট ওপর থেকে? এমন কি পানিতে পড়লেও সাথে সাথে মারা যাব।'

'বোমাটা উদ্ধার করাও সম্ভব নয়?'

'কোনভাবেই না। কেবিনটা প্রেশারাইজড, হোল্ডটা প্রেশারাইজড নয়।' হঠাৎ সামান্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'এক মিনিট,' বলল ও। 'বোধহয় একটা আইডিয়া পেয়েছি।' পাইলটের কেবিনে গিয়ে ঢুকল ও। হেডসেট মাথায় গলিয়ে চ্যানেল টু-র সুইচ অন করল, শুধু পাইলট ওর কথা শুনতে পাবে। 'খারাপ খবর, আহমেদ।'

'কি রকম খারাপ?'

'এর চেয়ে খারাপ আর হয় না।'

'বোমা!'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নাসাউ-এ ল্যান্ড করতে হবে আমাদের।'

'তা-ও সম্ভব নয়। বোমাটায় একটা নেগেটিভ-প্রেশার ডিটোনেটর রয়েছে। সেলফ-আর্মিং। এরইমধ্যে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে ওটা।'

'সর্বনাশ! নেগেটিভ প্রেশার কত? অলটিচ্যুড বলুন, হিসাবের ঝামেলা থেকে বাঁচান।'

'দশ হাজার ফুট।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল স্কিপার। 'অত উঁচুতে কোন এয়ারফিল্ড কোথাও নেই, তাই না?'

'আমার অন্তত জানা নেই।' রানা অনুভব করল, ওর মুখের ভেতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে।

'তাহলে একমাত্র সমাধান দিতে পারে হিমালয়। দশ হাজার ফুট ওপরে কোন গ্লেসিয়ারে ল্যান্ড করার চেষ্টা করতে হবে।'

'তা তুমি পারবে না…।'

'যথেষ্ট ফুয়েল আছে।'

'ফুয়েলের কথা বলছি না।'

'গোটা ব্যাপারটা অ্যাকাডেমিক, তাই না? দশ হাজার ফুটের নিচে আমরা নামতে পারছি না। কাজেই আমাকে হিমালয়ের কোথাও নামার চেষ্টা করতে হবে। বেশ, ল্যান্ড করতে পারলাম না, দুর্ঘটনা ঘটল। তবু কেউ বেঁচে যেতে পারে। আগে থেকে খবর দিলে, মাথার ওপর চক্কর দেবে রেসকিউ হেলিকপ্টার। রেসকিউ টীম সার্চ করবে এলাকাটা। তাছাড়া, আর তো কোন বিকল্প নেই, মাসুদ ভাই।'

'হিমালয়ের চেয়ে আন্দেজ অনেক কাছে,' বলল রানা।

'তা বটে। কিন্তু হিমালয়ে লোক বসতি আছে। গ্লেসিয়ারগুলো আকারে বড়।'

'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, সেটা শোনার পর সিদ্ধান্ত নাও?'

'বলুন, মাসুদ ভাই।'
'তোমার স্লোয়েস্ট স্পীড কত?'
'কত অলটিচ্যুডে?'
'বারো হাজার ফুটে?'
'বারো হাজার ফুটে? যতটুকু মনে পড়ছে, প্রতি ঘণ্টায় একশো সত্তর মাইল। মাটির যত কাছে হবে, স্পীড তত কমবে।'
'সবেচেয়ে কত কম রেঞ্জ অভ হাইটে রাখতে পারবে প্লেনটাকে?'
'তাও নির্ভর করবে হাইটের ওপর। গ্রাউন্ড লেভেলে প্লেনটাকে চালাতে হলে ওপর নিচে বিশ ফুট জায়গা দরকার হবে আমার, সব মিলিয়ে চল্লিশ ফুট।'
'বারো হাজার ফুটে?'
'মাসুদ ভাই, ওখানে আমার দরকার হবে হাজার ফুট...।'
'দু'দিকেই?'
'না, পাঁচশো ফুট ওপরে, পাঁচশো ফুট নিচে।'
'ওখানে কি তুমি প্রতি ঘণ্টায় একশো সত্তর মাইল রাখতে পারবে প্লেনটাকে?'
'অসম্ভব, মাসুদ ভাই! বারো হাজার ফুটে ওই স্পীড কল্পনাও করা যায় না—ওই স্পীডে আর ওই হাইটে প্লেন চালালে ওপর নিচে হাজার ফুট করে অতিরিক্ত জায়গা দরকার হবে আমার।'
'তবে পারবে, দু'দিকে এক হাজার ফুট করে জায়গা নিয়ে?'
'তা পারব, যদি আবহাওয়া বাদ না সাধে। কিন্তু, মাসুদ ভাই, এ-সবই তো আপনার মুখস্থ, আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?'
'হ্যাঁ, নিজেকেই ঝালাই করে নিচ্ছি। কি জানো, এমন অবস্থায় পড়েছি যে নিজেকেও বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছে।'
'আপনি খানিকটা হুইস্কি খান, মাসুদ ভাই। তারপর কথা বলা যাবে। ইতিমধ্যে নাসাউ-এর সাথে যোগাযোগ করি আমি।'
'না, থামো! আমার কথা শেষ হয়নি। প্রেশারাইজেশন ছাড়া গত মহাযুদ্ধে কত হাইটে বোম্বার চালিয়েছে ওরা?'
'দশ হাজার ফুটে। তারচেয়ে ওপরে উঠলে শ্বাস কষ্ট হত ওদের।'
'বারো হাজার ফুটে কি অবস্থা দাঁড়াবে?'
'শোচনীয়। মাসুদ ভাই, আপনি বোধ হয় ভাবছেন...অবশ্যই প্লেনটাকে আমরা ডিপ্রেশারাইজ করতে পারি। কিন্তু ভেবে দেখুন, আরোহীদের মধ্যে বয়স্ক লোকই বেশি, তাদের ফিজিক্যাল কন্ডিশন আমার-আপনার মত নয়। বারো হাজার ফুটে নেমে যদি ডিপ্রেশারাইজ করা হয়, অনেকেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়বেন।'
'মারা যাওয়ার চেয়ে সেটা ভাল নয়?'
'মাসুদ ভাই, তাঁরা মারাও যেতে পারেন।'
'প্রফেসর গিলবার্ট ওঁদের প্রত্যেককে পরীক্ষা করে দেখবেন। কারও

হার্টের সমস্যা আছে কিনা।'

'আর যদি থাকে?'

নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তিকে আত্মবিসর্জন দিতে হয়, শোনোনি?'

প্লেন চালাবার দায়িত্ব কো-পাইলটকে দিয়ে সীট থেকে নেমে এল স্কিপার। 'মাসুদ ভাই, বলুন তো আসলে কি ভাবছেন আপনি?'

'বারো হাজার ফুটে নামাও প্লেন, কেবিনটা ডিপ্রেশারাইজ করো। এস্কেপ টুল ব্যবহার করে মেঝেতে গর্ত করো একটা, যাতে হোল্ডে নামা যায়। আমি নিজে নামব, অকেজো করব বোমাটা। টর্চ থেকে একটা তার টেনে নিলেই তা সম্ভব, শয়তানটার কথা শুনে তাই মনে হয়েছে আমার।'

'একটা কথা আপনি ভুলে গেছেন, মাসুদ ভাই। ওটা একটা নেগেটিভ প্রেশার ডিটোনেটর, ঠিক? দুটো পয়েন্ট, একটা প্রেশার কন্ট্রোলড্। প্রেশার কমতে শুরু করলে দুটো পয়েন্ট এক হবে। ঠিক? তারমানে হলো পয়েন্ট দুটো এই মুহূর্তে পরস্পরের কাছ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। তাছাড়া, আপনি জানেনও না যে সুটকেসটা কোথায় আছে। মেঝের যেখানটায় গর্ত করা হবে, ঠিক তার নিচেই যদি থাকে ওটা, তাহলে কি ঘটবে?'

'আইডিয়াটা আমার পছন্দ নয়,' বলল রানা। 'সেজন্যেই তোমার স্লোয়েস্ট স্পীড জানতে চেয়েছি। অচিন পাখিকে তুমি বারো হাজার ফুটে নামাও, তারপর ডিপ্রেশারাইজ করো। দরজা খুলে বাইরে বেরুব আমি, একটা রশি নিয়ে। বাতাসের বেগ প্লেনের গায়ের সাথে সাঁটিয়ে রাখবে আমাকে। হোল্ডের দরজা খুলে...।'

'একশো আশি মাইল স্পীডের বাতাস ঘাড় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে আপনার মাথা। আপনি জানেন, রেসিং মোটরিস্টরা জানালার বাইরে হাত বের করলে তাদের কব্জি ভেঙে যায়?'

'তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে, আহমেদ।' স্কিপারকে রাজি করাতে মূল্যবান পাঁচটা মিনিট বেরিয়ে গেল রানার।

স্কিপার সিদ্ধান্ত নিল, প্লেনের দায়িত্ব থাকবে কমপিউটরের ওপর। নিজেকে সে বিশ্বাস করে, আরও বেশি বিশ্বাস করে কমপিউটরকে।

আরোহীদের সব কথা জানাবার দায়িত্ব নিলেন দারা শিকদার। আশ্চর্যই বলতে হবে, গোটা ব্যাপারটাকে গম্ভীর ও শান্তভাবে গ্রহণ করলেন তাঁরা। অনেকেই জানতে চাইলেন, কোন এয়ারপোর্টের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব কিনা, সম্ভব হলে তাঁরা নিজেদের প্রিয়জনদের কাছে বার্তা পাঠাবেন। দৃঢ়তার সাথে রানা বলল, 'না।' রানার এই সিদ্ধান্ত বিশেষ করে রিপোর্টারদের খেপিয়ে তুলল। মাইকেল হবস বলল, 'অন্তত আমাদের সবার পক্ষ থেকে একজনকে স্টোরিটা ডিকটেট করতে দিন, প্লীজ!'

কিন্তু রানা বলল, 'আমি যদি সফল হই, স্টোরিটা লন্ডন থেকে প্রচার করতে পারবেন আপনারা।'

'আর আপনি যদি ব্যর্থ হন?'

'তাহলে কার কি আসে যায়?'

একটা হারনেস দিয়ে নিজেকে বাঁধতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা, প্রতি ঘণ্টায় একশো আশি মাইল বাতাসের গতি সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে ওটার, তা না হলে ওর বাহু ছিঁড়ে নিয়ে যাবে ওটা। সবশেষে চারটে সীটবেল্ট ব্যবহার করল ও। দুই পায়ের চারদিকে দুটো, দুই বগলের নিচে দুটো, তারপর চারটেকেই ওর মুখের সামনে এক করে বাঁধা হলো।

প্রত্যেক আরোহীর কাছে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হলেন প্রফেসর গিলবার্ট, প্রত্যেকের মেডিকেল হিস্ট্রি জানতে চাইলেন। ভাগ্যই বলতে হবে, হার্টের অবস্থা সবারই ভাল; কেউ শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানিতে ভুগছেন না।

কমপিউটর নিয়ন্ত্রিত প্লেন ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামছে, সেই সাথে বাইরের আবহাওয়ার সাথে মিল রেখে কেবিনের প্রেশার কমিয়ে আনা হলো। রানার পরামর্শে গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের কাছ থেকে ফ্লাইট করিডর ত্যাগ করার অনুমতি চাইল স্কিপার। ফ্লাইট কন্ট্রোলের লোকজন বুঝতে পারল কিছু একটা ঘটেছে প্লেনে, কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না। তবে আধ ঘণ্টা পরপর রিপোর্ট করার নির্দেশ দিল। ভাগ্যই বলতে হবে, বারো হাজার ফুট লেভেলে অন্য কোন প্লেন নেই।

প্রতি ঘণ্টায় একশো আশি মাইল স্পীড হলো অচিন পাখির, প্রায় ওই একই সময় বারো হাজার ফুটে নেমে এল ওরা। প্রেশার ডিফারেন্স গজের রীডিং দেখা গেল—জিরো। বাইরে আর ভেতরে সমান।

প্রফেসর গিলবার্ট প্রত্যেক আরোহীকে চাদরমুড়ি দিয়ে মাথা নিচু করে বসার নির্দেশ দিলেন। শুধু অনুরোধ করায় একজন রিপোর্টারকে সিধে হয়ে বসার অনুমতি দেয়া হলো। 'ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাবেন আপনি!' তাকে সতর্ক করলেন প্রফেসর। রিপোর্টাররা সবাই অনুমতি চেয়েছিল, সুযোগটা পেল মাইকেল হবস।

বাঁ দিকের সামনের দরজাটা খোলা হলো। সগর্জন বাতাসে ভরে উঠল প্লেন, ভুলে যাওয়া অসংখ্য জিনিস কেবিনের ভেতর উড়তে শুরু করল। চারজন স্টুয়ার্ড স্বেচ্ছায় সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের একজন উবু হয়ে বসেছে মেঝেতে, খোলা দরজার সামনে। তার পা দুটো লোহার স্ট্যানশন-এর সাথে শক্তভাবে আটকানো। লোহার স্ট্যানশনটা প্লেনের মেঝেতে গাঁথা, সেটার চারধারে নাইলন রোপ জড়ানো হয়েছে। প্লেনের ব্যাগেজ লকার খোলা হয় চৌকো একটা শ্যাফট কী দিয়ে, সেটা কব্জির সাথে জড়িয়ে বেঁধে নিল রানা। লেদার-সোলড শু পরেছিল, একজন স্টুয়ার্ডের সাথে বদলে একজোড়া প্লিমসোলস পরেছে। একই স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে একটা জ্যাকেট ধার করেছে ও।

সামনের সারির সীটগুলোর পিছনে এক লাইনে দাঁড়িয়েছে বাকি তিনজন স্টুয়ার্ড, সীটগুলোর পিঠ জড়িয়ে ধরেছে। সবাই ওরা সীট বেল্ট পরেছে, নাইলন রোপটা যদি ফাঁদ হয়ে দেখা দেয়, বাতাস যাতে রানাকে প্লেনের বাইরে টেনে নিতে না পারে। মেঝেতে শুয়ে আছে রানা, মাথাটা সামনের

দিকে, খোলা দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে পা দুটো বের করে দিল। বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় একটা জুতো গোড়ালি থেকে নেমে গেল। ঝট্ করে পাটা টেনে নিল ও, ফিতেটা ভাল করে বাঁধল। তারপর আবার বের করল পা, প্লেনের পিছন দিকে তাক করে। রোপটা ধরে আছে প্রথম লোকটা, ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ বাতাস টেনে নিচ্ছে রানাকে, মেঝেতে ঘষা খেতে খেতে বেরিয়ে যাচ্ছে শরীরটা। এরইমধ্যে পা দুটো যেন বরফ হয়ে গেছে ওর। দরজার ফ্রেমে আটকে আছে শরীরটা। দরজার ঠোঁটের দিকে ঘুরে গেল ও, বাতাসের নিয়ন্ত্রণে ধীরে ধীরে ছেড়ে দিল নিজেকে। এখনও রশিতে টান পড়েনি, প্রচণ্ড বাতাসের মধ্যে ওর সমস্ত ভার বহন করছে শুধু হাত দুটো। এরপর হাত দুটো লম্বা করল রানা, সেই সাথে প্লেন থেকে গোটা শরীরটা বেরিয়ে গেল, বরফশীতল হাতুড়ির মত মাথার মাঝখানে আঘাত করল বাতাস।

স্টুয়ার্ড তিনজন ঢিল দিল রশিতে, দরজার ফ্রেম থেকে হাত সরাল রানা, পিছলে বারো ইঞ্চি এগোল ও, রশিতে আবার টান পড়ার আগেই। সাগর থেকে বারো হাজার ফুট ওপরে, সমান্তরাল রেখায়, নিচের দিকে মুখ করে দৃশ্যত বাতাসের ওপর শুয়ে রয়েছে রানা, তাকিয়ে রয়েছে সরাসরি নিচের দিকে। একটা হাঁটু ভাঁজ করল ও, বাতাসের প্রচণ্ড চাপে হাঁটুর হাড়টা এমন ব্যথা করে উঠল যে প্রায় চিৎকার দিতে যাচ্ছিল, যেন তীক্ষ্ণ বালির সচল একটা নদীতে ছোঁয়া লেগেছে, এক পলকে তুলে নিয়েছে হাঁটুর সবটুকু চামড়া। হাত দুটো শরীরের দু'পাশে। তোলার সাহস হলো না। ঘাড়টা বাঁকা করারও সাহস হলো না। দোরগোড়া থেকে ওর ওপর নজর রাখছে একজন স্টুয়ার্ড, তাকে সঙ্কেত দিতে হবে। অনেক কষ্টে, কিভাবে বলতে পারবে না রানা, শরীরটাকে কাত করল ও, পাশ ফিরে শুলো বাতাসে, মুখটা থাকল প্লেনের ফিউজিলাজের দিকে।

এবার রশিতে ঢিল দিতে শুরু করল স্টুয়ার্ডরা। এগোচ্ছে রানা, ফিউজিলাজের গায়ে ঘষা খেল গাল। কোন ব্যথা অনুভব করল না, শুধু দেখতে পেল ফিউজিলাজের গায়ে শুকনো রক্তসহ ওর গালের খানিকটা চামড়া লেগে রয়েছে।

এই প্রথম সাংঘাতিক ভয় পেল রানা। তারমানে প্লেনের গায়ে একটা চোখ ঘষা খেলে মণিটা কোটর ছেড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসবে! এভাবে যদি নাকটা হারায় ও?

ধীরে ধীরে ছাড়া হচ্ছে রশি। প্রথম অ্যাপারচার-এর লেভেলে চলে এসেছে রানা। হ্যাচ আর রানার মাঝখানের দূরত্ব আন্দাজ করছে একজন স্টুয়ার্ড, বাকি স্টুয়ার্ডদের রশিতে ঢিল দিতে নিষেধ করল সে। বাতাস যেন জ্যান্ত একটা দানব, তার প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে একটা হাত উঁচু করল রানা, কনুইটা সামান্য বাঁকা করল, যাতে শরীরটা ফিউজিলাজের গা থেকে দূরে থাকে, তারপর গর্তের ভেতর চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাল।

ফিউজিলাজের গায়ে চাবি দিয়ে টোকা দিল রানা, প্লেনের ভেতর মেঝেতে কান ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছেন প্রফেসর গিলবার্ট, শব্দটা শুনেই

সঙ্কেত দিলেন তিনি স্টুয়ার্ডদের, সাথে সাথে রশিতে ঢিল দিল তারা। আর তিন ফুট পিছু হটল রানা, খুলল আরও একটা ফাসেনার। তিন নম্বরটা খোলার সময় হাত থেকে পড়ে গেল চাবিটা। বুলেটের বেগে ছুটে যেত ওটা, যদি না কব্জির সাথে বাঁধা থাকত। চার নম্বর ফাসেনার খোলার সময় ফিউজিলাজের গায়ে হাতের ছোঁয়া লাগল, সাথে সাথে ইঞ্চি দুয়েক চামড়া হারাল রানা। কোন ব্যথা লাগল না বটে, কিন্তু ব্যথাটা মনে মনে অনুভব করল রানা, চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল, পরমুহূর্তে মুখের ভেতর যেন প্রচণ্ড ঘুসি খেল ও। দম বন্ধ হয়ে এল, নিঃশ্বাস ফেলতে না পেরে হাঁসফাঁস করছে, ফুসফুসে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগায় জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা।

রশিতে আবার ঢিল পড়বে। পাঁচ নম্বর ফাসেনারটা খুলতে হবে রানাকে। রশিটা এখন অনেক লম্বা, হঠাৎ ঢিল পড়তেই ঘুরতে শুরু করল সেটা। বাতাসের একটা ঘূর্ণি ছোঁ দিয়ে ছিনিয়ে নিল রানাকে প্লেনের গা থেকে তিন ফুট দূরে, লাটিমের মত বন বন করে ঘোরাচ্ছে ওকে। প্রাণপণ চেষ্টা করল রানা প্লেনের গায়ে একটা পা ঠেকিয়ে নিজেকে স্থির করার, কিন্তু পা-টা নাড়তেই পারল না, ঘূর্ণিটা এতই জোরাল। কি ঘটছে দোরগোড়া থেকে দেখতে পেল স্টুয়ার্ড, অনুভব করল হাতের মুঠোয় মোচড় খাচ্ছে রশি, কিন্তু তার কিছু করার নেই। মুঠো আলগা করল সে, তা না হলে রশিটা ছিঁড়ে যেতে পারে, চিরকালের জন্যে হারিয়ে যেতে পারে রানা। তবে, যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ থামল রশির মোচড় খাওয়া, ধীরে ধীরে উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করল। মড়ার মত শুয়ে থাকল রানা, প্লেনের গায়ে বারবার কনুই ঠেকিয়ে শরীরটাকে দূরে রাখছে, তাতে কনুইয়ের চামড়া বলে কিছু থাকছে না বটে, তবে মুখ আর হাত বাঁচছে।

অবশেষে পাঁচ নম্বর ফাসেনারের পাশে চলে এল রানা। এটা খোলার সময় বিপদ ঘটতে পারে। পাঁচ নম্বরটা খোলার সাথে সাথে প্লেনের দু'দিকে লাগেজ হোল্ডের কবাট ঝট্ করে নিচের দিকে নেমে যাবে। যে উচ্চতা ও গতিতে ছুটছে প্লেনটা, হঠাৎ যদি তার দুটো ফিন নেমে যায়, কি ঘটবে বলা মুশকিল। দ্রুতগামী একটা সাইকেলের সামনের ব্রেক কষার মত হবে ব্যাপারটা। আবার বলা যায় না, দরজার কবাটগুলো নাও নামতে পারে। বাতাসের চাপ বা ধাক্কায় কি ঘটবে আন্দাজ করা সম্ভব নয়, চলন্ত কোন প্লেনের লাগেজ ডোর আগে কেউ কখনও খোলেনি। পাঁচটা ফাসেনার রাখা হয়েছে সেফটি ডিভাইস হিসেবে, দুর্ঘটনাবশত দরজাটা কোনদিনই খুলবে না।

কী হোলে চাবি ঢোকানোর আগে প্লেনের গায়ে টোকা দিল রানা। একটা ছন্দ বজায় রেখে, পরপর পাঁচবার একই ছন্দের সাথে তাল রেখে বিশ পর্যন্ত গুনল ও। বিশে পৌঁছে কী হোলে চাবি ঢোকাল, পঁচিশ পর্যন্ত গুনে চাবিটা ঘোরাল।

প্রফেসরের কাছ থেকে মাইক্রোফোনে সঙ্কেত পেয়ে রানার সাথে গুনছিল স্কিপারও। পঁচিশ পর্যন্ত গোনার পর ধরে নিল সে, প্লেনটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাবে। প্লেনের নাক উঁচু করে নিল, বাড়িয়ে দিল এঞ্জিনের গতি। পরমুহূর্তে

নিচের দিকে টান পড়ল, পাঁচশো ফুট নেমে গেল অচিন পাখি,' তারপর এক হাজার ফুট। 'ইয়াল্লা!' আঁতকে উঠল স্কিপার। 'দশ হাজার ফুট ছুঁতে যাচ্ছি আমরা!' কিন্তু তা ঘটল না। কারেকশন শেষ করেই কমপিউটরকে আবার দায়িত্ব ফিরিয়ে দিয়েছে সে, তার হয়ে কমপিউটরই এখন যুদ্ধ করছে, প্রয়োজনীয় অ্যাডজাস্টমেন্ট সারছে প্লেনকে সঠিক স্পীড আর উচ্চতায় ফিরিয়ে আনার জন্যে।

অবশেষে হোল্ডের খোলা দরজার ভেতর পা দুটো ঢোকাতে পারল রানা। ভেতরে হাত গলিয়ে একটা অ্যাংগেল বাকেট ধরতে গেল ও, তারপর হাতটা সরিয়ে নিল। মনে পড়ে গেছে খালি হাতে ওটা ছুঁলেই চামড়া উঠে যাবে, এতই ঠাণ্ডা হয়ে আছে মেটালটা।

হোল্ডের ভেতর দিকের গায়ে একটা ধাপ পেয়ে সেটায় পা রাখল রানা। ধীরে ধীরে শরীরটা হোল্ডের ভেতর ঢুকিয়ে নিল। পরমুহূর্তে নেতিয়ে পড়ল শরীরটা, টেনশন আর উদ্বেগে অসুস্থ বোধ করল। বার কয়েক মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিজেকে চাঙা করার চেষ্টা করল ও।

হোল্ডের নিচে নেমে স্থির হয়ে দাঁড়াল রানা। তারপর খুঁজতে শুরু করল। ডিউকের সুটকেসটা সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। চাবিটা নিয়ে আসতে ভোলেনি, সেজন্যে ধন্যবাদ দিল নিজেকে। সুটকেসটা নাড়ল না, সতর্কতার সাথে খুলে ভেতরে তাকাল। জিপার ব্যাগটা বের করছে, দমকা বাতাসে পপ আর্ট পা'জামাটা উড়ে গেল হোল্ড থেকে, ওটার যেন পাখা গজিয়েছে। হাসতে শুরু করল রানা, তবে নড়ল না। জিপার কেসটা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে দাঁড়াল ও, সাবধানে এগিয়ে এল খোলা দরজার দিকে। তারপর ছুঁড়ে দিল শূন্যে।

কোথায় বা কোন্ দিকে গেল সেটা দেখার গরজ অনুভব করল না রানা।

দশ হাজার ফুটে পৌঁছে বিস্ফোরিত হলো ওটা, আওয়াজটা শুনতে পেল রানা, দেখতে পেল মুহূর্তের জন্যে হোল্ডের ভেতটা উজ্জ্বল সাদা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল।

সুটকেস আর ব্যাগগুলোর মাঝখানে বসে পড়ল রানা। ওর মাথার ওপর আরোহী আর ক্রুরা প্লেনের গায়ে একযোগে চাপড় মারছে—অভিনন্দন আর কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা আর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে রানাকে।

রানা শুনতে পেল না, কিন্তু বোধহয় অনুভব করতে পারল, ডিউকের দেখাদেখি সবাই ওরা গান ধরেছে। বেঁচে থাকার আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়েছে সবাই। এরইমধ্যে রিপোর্টারদের একজন দুঃসাহসী বীর হিসেবে বর্ণনা করে রানার নামে একটা গান লিখে ফেলেছে। সেটাই সমস্বরে গাইছে ওরা।

অপারেশন চিতা

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৯১

এক

টিপটিপ টিপটিপ বৃষ্টি পড়েই চলেছে গত তিনদিন ধরে। সেই সাথে এলোমেলো দমকা বাতাস। কাদাপানিতে প্যাচপেচে হয়ে আছে রাস্তাঘাট। রাত সবে সাড়ে আটটার কিছু বেশি হয়েছে, এরই মধ্যে বেশিরভাগ দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। যানবাহনও তেমন একটা চোখে পড়ছে না, পড়ে পড়ে ঝিমুচ্ছে রাজপথগুলো। এমন দিনে নিতান্ত দায় না ঠেকলে ঘর ছেড়ে বেরোয় না কেউ, মাঝে-মধ্যে এক-আধটা স্কুটার বা রিকশা চোখে পড়ছে. ফাঁকা রাস্তা পেয়ে তুফান বেগে ছুটে চলেছে গন্তব্যের দিকে।

ঢাকার ব্যস্ত জনজীবন প্রায় অচল করে ফেলেছে এই অবিরাম বৃষ্টি। অথচ এখনও মেঘের আনাগোনার কমতি নেই, সারাক্ষণ মুখ ভার করে আছে আকাশ।

কাকরাইল চৌরাস্তা পেরিয়ে এসে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সরকারী বাসভবনের সামনের আইল্যান্ড ঘুরে মগবাজারের দিকে ছুটল মাসুদ রানার মেটালিক গ্রীন প্রোটন সাগা। হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল বাঁয়ে রেখে আরেকটু এগিয়েই গতি কমাতে হলো ওকে, সামনে টকটকে লাল ট্রাফিক কন্ট্রোল সিগন্যাল জ্বলছে। মুচকে হাসল রানা, ট্রাফিকই নেই, তার আবার কন্ট্রোল সিগন্যাল। তবুও গাড়ি থামাল রানা। আইন আইনই।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখে বাঁ দিকের নিউজ পেপার স্ট্যান্ডের সামনে জবুথুবু হয়ে বসে থাকা বাচ্চা একটা মেয়ে ছুটে এল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। ওর হাতে কয়েকটা বেলী ফুলের মালা, বিবর্ণ। জানালার পাশে এসে একটা মালা তুলে ধরল মেয়েটা, চাউনিতে নীরব আকুতি, মালা কিনতে বলছে।

ফুলের মালা কেনার মত মনের অবস্থা এ মুহূর্তে নেই মাসুদ রানার। বড্ডো ব্যস্ত ও এখন। তবু চুপচুপে ভেজা মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। শীতে কাঁপছে মেয়েটা হি হি করে, রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ঠোঁট দুটো। একটা কুকুরও নেই রাস্তায়, অথচ এই খোঁড়া বাচ্চাটা পড়ে আছে এত রাত অবধি—পেটের ধান্ধায়, যদি আর একটা মালা বেচা যায়।

হাত বাড়িয়ে মালাটা নিল রানা, দশ টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিল মেয়েটার হাতে। কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে চাইল ওকে, কিন্তু পিছন থেকে হর্নের আওয়াজে থেমে গেল। সামনের আলো সবুজ হয়ে গেছে কখন যেন। আবার বেজে উঠল হর্ন। পিছনে তাকাল রানা, একটা পাজেরো

জীপ—একেবারে ওর পিছনের বাম্পারের সাথে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উইন্ডশীল্ডে ছোট্ট করে রেড ক্রিসেন্ট আঁকা। ওকে পিছন ফিরে চাইতে দেখে দাঁত খিঁচিয়ে কি যেন বলল ওটার চালক, দ্রুত হাত নেড়ে এগুতে বলছে রানাকে।

গাড়ি ছাড়ল রানা। চট করে নজর বুলিয়ে নিল ড্যাশবোর্ডের ঘড়িটার ওপর। নটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি। এই বিশ মিনিটের মধ্যে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছুতে হবে ওকে। রেঙ্গুন চলেছে মাসুদ রানা। ঠিক নটায় ছাড়বে বিমান। টুকটাক কিছু কাজ সারতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে বেরোতে।

দ্রুত মগবাজার রেল ক্রসিং পেরিয়ে এল ও। পিছনে আঠার মত লেগে আছে পাজেরো। একটু পর আবার হর্ন বাজাল ওটা, সেই সাথে ঘন ঘন হেডলাইট ডিপ করছে। মাইল মিটার ইন্ডিকেটরের দিকে তাকাল রানা, প্রায় একশো কিলোমিটার বেগে ছুটছে ওর গাড়ি, এই ভেজা রাস্তায় এরপরও সাইড চায়?

বোধহয় কোন জরুরী কলে চলেছে ডাক্তার, সিরিয়াস রোগী। গতি কমিয়ে রাস্তার কিনারা ঘেঁষে চলতে লাগল রানা। পরমুহূর্তে সাঁ করে ওকে পাশ কাটাল জীপ টানা হর্ন বাজিয়ে। ওটার পিছনের আসনে বসা কোট টাই পরা একজনকে দেখতে পেল রানা পলকের জন্যে, ওর দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল লোকটা। প্রতি সেকেন্ডে রানাকে পিছনে ফেলে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা, ভেজা রাস্তায় চড়চড় চড়চড় আওয়াজ তুলছে ওটার চওড়া টায়ার।

ঠিক মত কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেল দুর্ঘটনাটা। রানার থেকে পঞ্চাশ গজমত এগিয়ে গেছে তখন পাজেরো, বাঁ দিকের বিজি প্রেস স্টাফ কোয়ার্টারের আড়াল থেকে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে বেরিয়ে এল একটা মোটর সাইকেল, বড় রাস্তায় উঠেই ডানে মোড় নিল। ব্যাপারটা চোখে পড়ামাত্র শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার, এক্সিলারেটর ছেড়ে ব্রেক পেডালে পা রাখল তাড়াতাড়ি।

দপ্ করে জ্বলে উঠল পাজেরোর ব্রেক লাইট, রাস্তার সাথে টায়ারের ঘর্ষণের তীক্ষ্ণ আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল পুরো এলাকা। ব্রেক চাপার সাথে সাথে পিছলে গেল ওটার পিছনের চাকা, সাঁৎ করে ঘুরে গেল গাড়ি। উন্মত্তের মত হুইল ঘুরিয়ে সিধে করার চেষ্টা করল ওটাকে চালক, ঘন ঘন ব্রেক চেপে যথাসাধ্য চেষ্টা করল বাগে আনার, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। নিয়ন্ত্রণহীন ভারী গাড়িটা তখন পুরোপুরি যন্ত্রদানবে পরিণত হয়েছে, সামান্য একটু সোজা হয়েই আবার ঘুরে গেল, বিদ্যুৎগতিতে গোটা তিনেক ডিগবাজি খেল ওটা রাস্তার ওপর।

শেষ ডিগবাজিটা খেয়েই চার চাকা আকাশে তুলে দিয়ে রকেটের মত ছুটে চলল পাজেরো, ত্রিশ চল্লিশ ফুট রাস্তা পলকে পেরিয়ে গিয়ে বাঁ পাশের চওড়া ফুটপাথের কিনারায় দড়াম করে গুঁতো খেয়ে থেমে পড়ল। চাকাগুলো

ঘুরছে সাঁই সাঁই। ওদিকে বড় রাস্তায় উঠেই আজরাইলের মত হাঁ হাঁ করে ছুটে আসতে থাকা গাড়িটাকে দেখে জমে গিয়েছিল মোটর সাইকেল চালক, কোনরকমে হ্যান্ডেলটা বাঁয়ে ঘুরিয়ে নিতে পারল সে, একেবারে শেষ মুহূর্তে রাস্তা ছেড়ে কাদাপানির ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ওপাশের পানি ভর্তি খাদে ঝপাং করে আছড়ে পড়ল গিয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে।

পাজেরোর দেখাদেখি ব্রেক চেপেছিল রানাও। জান উড়ে গেছে সামনের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে। ভাগ্যিস অনেকটা পিছিয়ে ছিল ও তখন, আরেকটু কাছাকাছি থাকলে আর রেহাই ছিল না, সোজা ছুটে গিয়ে পাজেরোর পেছনে গুঁতো মারত প্রোটন সাগা।

বিধ্বস্ত জীপগাড়ির কাছে এসে লাফিয়ে নামল রানা গাড়ি থেকে। সংঘর্ষের প্রচণ্ড আওয়াজে ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে অনেক লোক। হৈ হৈ করতে করতে ছুটে আসছে সবাই। ড্রাইভারের দরজার হাতল ধরে খানিক টানাটানি করল রানা গায়ের জোরে, কিন্তু কাজ হলো না,বডি তুবড়ে পুরোপুরি জ্যাম হয়ে গেছে দরজা, এক চুল নড়ল না ওটা।

ঝুঁকে পড়ে ভেতরে উঁকি দিল রানা। স্টিয়ারিং হুইলের রড চালককে আসনের সাথে গেঁথে ফেলেছে, তার বুক ও সীটের ব্যাক ভেদ করে পিছনদিক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। পিছনের আরোহীর ওপর এক পলক নজর বুলিয়েই সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা, এ-ও চলে গেছে সব সাহায্যের বাইরে। সীটের পাশে পড়ে আছে লোকটা উপুড় হয়ে, অথচ মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন চিত হয়ে শুয়ে আছে। দু'চোখ বিস্ফারিত। ঘাড় মটকে মৃত্যু হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পিছিয়ে এল মাসুদ রানা। আশ্চর্য! ভাবল ও, দু'মিনিটও বোধহয় হয়নি ওকে ওভারটেক করেছে জীপগাড়িটা। অথচ এরই মধ্যে···। ওপাশের খাদের দিকে তাকাল রানা। কয়েকজন লোক নেমে পড়েছে ডোবায়, ভীত সন্ত্রস্ত মোটর সাইকেল চালককে তুলে আনছে। দুদিক থেকে তিন চারটে গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে এরমধ্যে ঘটনাস্থলে, হেডলাইটের আলোয় আলোকিত গোটা জায়গা।

লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচি ক্রমেই বাড়ছে। কেউ ছুটছে ডাক্তার ডাকতে, কেউ গাড়ির দরজা ভাঙার জন্যে শাবল আনতে, কেউ আবার গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে, পুলিসে বা ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করতে বলছে অন্যকে।

ভিড় ঠেলে রাস্তায় উঠে এল রানা। ঘড়ির দিকে চোখ যেতে চঞ্চল হয়ে উঠল ভেতরে ভেতরে—আর মাত্র চোদ্দ মিনিট সময় আছে। তাড়াতাড়ি গাড়িতে এসে উঠল ও। ধীর গতিতে জটলাটার পাশ কাটিয়ে এপাশে এসে আইল্যান্ড ঘুরল, তারপর দাবিয়ে ধরল এক্সিলারেটর। এক মিনিটের মধ্যে মহাখালী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল ছাড়িয়ে এল রানা। ঢাকা গেট পেরিয়ে ঘড়ি দেখল আবার—নয় মিনিট। উত্তেজনায় শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওর।

মাঝেমধ্যে টঙ্গী-গাজীপুরের দিক থেকে এক আধটা বাস মিনিবাস আসছে, এছাড়া রাস্তা প্রায় ফাঁকাই। তুমুল গতিতে ছুটছে প্রোটন সাগা। কিন্তু

বেশিক্ষণ ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না গতি। নতুন এয়ারপোর্ট রোডটা বড্ডো বেশি বাঁকবহুল, বারবার গতি কমাতে হচ্ছে। তারপরও গাড়ি সামলানো দায়, চুল পরিমাণ এদিক ওদিক হলেই পিছলে যাচ্ছে চাকা, গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছে স্টিয়ারিং হুইলটা।

আড়াই মিনিট বাকি থাকতে বিমানবন্দরের লাউঞ্জের দোড়গোড়ায় উঠে এসে সজোরে ব্রেক কষল রানা। একহাতে ব্রীফকেস, অন্যহাতে পেটমোটা একটা ব্যাগ নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। পিছন দিকে ফিরেও চাইল না ও, ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে লাথি মেরে দরজাটা বন্ধ করেই ছুটল ভেতরদিকে।

সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যালিটি সেরে প্লেনে উঠতে উঠতে নটা বেজে গেল। গ্যাঙওয়ের মাথায় সুন্দরী এক বিমানবালা দাঁড়িয়ে আছে 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স' লেখা ছাতা মাথায় দিয়ে। হন্তদন্ত যুবকের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল সে। 'ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড, স্যার।'

'ধন্যবাদ।' তাকে পাশ কাটিয়ে আলোকিত বোয়িং ৭০৭-এর ভেতরে পা রাখল রানা। কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে প্রকাণ্ড বোয়িংটা। নারী পুরুষ মিলিয়ে বড় জোর ষাট-পঁয়ষট্টিজন যাত্রী হবে, অনুমান করল ও। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে তারা।

প্রথম সারিতে কোন যাত্রী নেই দেখে বাঁ দিকের জানালার পাশের সীটটায় বসতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় ধূসর রঙের কমপ্লিট স্যুট পরা এক লোক নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়াল ওর সামনে। রানার চেয়ে ইঞ্চি তিনেক খাটো হবে লোকটা, কিন্তু পাশে প্রায় দ্বিগুণ। ক্রু কাট্ চুল, চৌকো চোয়াল। পরিষ্কার টের পাওয়া যায় একটু নড়লেই এর পোশাকের নিচে কিল্‌বিল্ করছে অসংখ্য পেশী। বডি বিল্ডার। একবার রানার মুখের দিকে, আরেকবার হাতের পেটমোটা ব্যাগটার দিকে চাইছে ঘন ঘন।

আড়চোখে বিমানের দরজা বন্ধ করার কাজে ব্যস্ত বিমানবালার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে উঠল লোকটা, 'আপনার দেখছি সময়জ্ঞান বলে কিছুই নেই, সাহেব। যাচ্ছেন কত গুরুত্বপূর্ণ মিশনে, অথচ ভাব দেখে মনে হচ্ছে...।'

'জ্বি?' বিস্মিত হয়ে লোকটার মুখের দিকে চাইল মাসুদ রানা, 'আমাকে বলছেন?'

'না!' দাঁত খিঁচাল ক্রু কাট্, 'বলছি আপনার পিছনের দরজাটাকে।' পরক্ষণেই মিষ্টি করে হাসল, কাজ সেরে এদিকেই আসছে বিমানবালা।

'আপনারা বসে পড়ুন, স্যার,' বলল মেয়েটি। 'এখুনি ফ্লাই করব আমরা।'

'হ্যাঁ, বসছি,' রানার দিকে ইশারা করে বলল লোকটা। 'আমার বন্ধু, বুঝলেন? ওর দেরি দেখে ভীষণ টেনশনে পড়ে গিয়েছিলাম।'

রানার চোখে চোখ রেখে মৃদু একটু হাসল বিমানবালা। 'সত্যি, স্যার, প্রায় মিস্ করছিলেন আপনি ফ্লাইটটা।'

'হ্যাঁ, গাড়িটা হঠাৎ পথের মাঝখানে গোলমাল শুরু করল…তাই…,' চট্ করে বডি বিল্ডারের ওপর নজর বুলিয়ে নিল রানা তার অজান্তে। কে এই লোক? একে কখনও দেখেছে বলে তো মনে পড়ে না।

রানার ব্যাগ দুটোর দিকে হাত বাড়াল মেয়েটা, 'আমাকে দিন, স্যার। হোল্ডে তুলে রাখি।'

'ধন্যবাদ। আমিই পারব।' ব্রীফকেসটা মাথার ওপরের ব্যাগেজ হোল্ডে ঢুকিয়ে দিল রানা। তারপর সীটে বসে পেটমোটা ব্যাগটা রাখল দুপায়ের ফাঁকে।

'ঠিক আছে, বিশ্রাম করুন,' রানার কাঁধ চাপড়ে দিল লোকটা। 'আপনার চার সারি পেছনে আছি আমরা। কোন দরকার হলে জানাবেন, কেমন?' আরেকবার ব্যাগটার ওপর নজর বুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। হেঁটে চলেছে বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে।

ঘাড় ঘুরিয়ে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে রানা। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে ভেতরে ভেতরে। ব্যাগটার দিকে ঘন ঘন চাইছিল কেন লোকটা বোঝা গেল না। আবার বলছে 'আমরা', তার মানে সঙ্গে আরও লোক আছে! খেয়াল হলো, প্রথমেই 'মিশন' কথাটা উল্লেখ করেছিল লোকটা। কিন্তু সে কি করে জানল ও মিশনে যাচ্ছে! এ কথা তো রানা ছাড়া আর কারও জানার প্রশ্নই আসে না।

চার সারি পিছনে আইলের ওপাশের আসনটায় বসে পড়ল গিয়ে বডি বিল্ডার। চোখ তুলে এদিকে তাকাবার আগেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে রানা। ভুরু কুঁচকে আছে চিন্তায়—কারা এরা?

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। এক এক করে চারটে শক্তিশালী এনজিনই স্টার্ট নিয়েছে ততক্ষণে বোয়িঙের, বাইরের প্রচণ্ড গর্জন ভেতরে বসে ভ্রমরের গুঞ্জনের মত লাগছে। ডানার নিচে ও লেজের কাছে খুব দ্রুত জ্বলছে নিভছে দুটো চোখ ধাঁধানো রঙিন আলো। বৃষ্টিস্নাত টারমাক আয়নার মত ফিরিয়ে দিচ্ছে সে আলো।

নড়ে উঠল প্রকাণ্ড বোয়িং। মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল রানওয়ের উত্তর প্রান্তের দিকে। প্রচুর সময় নিয়ে ট্যাক্সিইঙ শেষ করে ঘুরে দক্ষিণমুখো হয়ে দাঁড়াল স্থির হয়ে—দৌড় শুরু করার জন্যে প্রস্তুত। এয়ারপোর্ট টার্মিনালের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। বিরামহীন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সোডিয়াম লাইটগুলোও যেন ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বাতাসে ধূলিকণা না থাকায় ওগুলোর উজ্জ্বলতা বেড়ে গেছে বহুগুণ, কটমট করে তাকিয়ে আছে বিমানটার দিকে।

হঠাৎ দৌড় শুরু করল বোয়িং, সেকেন্ডে সেকেন্ডে বাড়ছে গতি, সেই সাথে রানার পিঠ একটু একটু করে সেঁধিয়ে যাচ্ছে সীটের নরম স্পঞ্জের ভেতর। দশ সেকেন্ডের মাথায় রানওয়ে ত্যাগ করল বিমান, নাক উঁচু করে ক্রমেই উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে।

সীট বেল্ট খুলে নড়েচড়ে বসল রানা। ব্যাগটা তুলে নিল কোলের ওপর।

পিছনে মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে তখন আলো ঝলমল বর্ষণসিক্ত ঢাকা। গন্তব্যের পানে ছুটে চলল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর ঢাকা-রেঙ্গুন-ব্যাংকক-কুয়ালালামপুর-সিঙ্গাপুর-ঢাকা ফ্লাইট।

দুই

এগারো ঘণ্টা আগের কথা।

রানা এজেন্সির অফিসে একবার ঢুঁ মারবে বলে বাসা থেকে বেরিয়ে আসছিল মাসুদ রানা। তিন দিন পর দেশের বাইরে যাচ্ছে ও, এজেন্সির হাতে গুরুত্বপূর্ণ যে কেসগুলো আছে, তা নিয়ে গিলটি মিয়ার সাথে আলোচনা করা দরকার। এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। পিছিয়ে এসে রিসিভার তুলল রানা, 'হ্যালো!'

'কি রে, শালা!' বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের গলা ভেসে এল ওপ্রান্ত থেকে। 'হারাম খেয়ে খেয়ে গায়ে খুব তেল চর্বি জমে গেছে, না? বেলা দশটা পর্যন্ত নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো হচ্ছে!'

'এই যাহ্, দিনটাই গেল নষ্ট হয়ে! কোথায় জরুরী ব্যবসায়িক কাজে বেরুচ্ছি, আর তুই কিনা ফোন তুলেই যা তা ভাষা শুরু করে দিলি সাত সকালে?'

'কি বললি, সাত সকাল? কথাটার মানে বুঝিস? সামনে পেলে অ্যায়সা এক লাথি মারতাম না তোর পোঁদে, শা-লা!'

'ফের গাল দিচ্ছিস?'

'গাল দিলাম কখন?' খুব অবাক হয়েছে যেন সোহেল, 'ওটা তো সম্বোধন। তুই যা, তাই বলে ডাকলাম।'

'ঠিক আছে। সময় নেই বলে এখনই এর একটা হেস্তনেস্ত করতে পারছি না। কিন্তু মনে রাখিস, এক মাঘমে শীত নেহি যাতা। পরে যখন তোকে হাতের কাছে পায়েগা, স্রেফ তুলোধুনা করেগা হাম। স্মরণ রাখ্না।'

'নে থাম্!' ধমকে উঠল সোহেল, 'বাংলার হদ্দ করে এখন উর্দুর পিণ্ডি চটকানো হচ্ছে। সেই সোয়া নটা থেকে এখানে ওখানে ফোন করছি তোর খোঁজে, আর তুই কি না...।'

'বল, কেন খুঁজছিস।'

'কাঁচাপাকা ডেকেছে তোকে।'

'কেন?'

'জুতোপেটা করবে বলে।'

'আমার অপরাধ?'

'অপরাধ না? চাকরির নামে তো শালা ঠন্ঠন্, অফিসের ধারেকাছেও

আসিসনে। ওদিকে রানা এজেন্সি খুলে দুহাতে মানুষের টাকা পয়সা লুটছিস, যা সরকারী চাকরিনীতির পরিষ্কার বরখেলাপ। তাছাড়া...'

'কখন আসতে হবে,' মুচকে হাসল রানা।

'এক্ষুণি, এই মুহূর্তে।' ফোন ছেড়ে দিল সোহেল।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। সাততলার পুরু কার্পেট মোড়া করিডর পেরিয়ে মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের পি এ ইলোরার ছোট্ট রুমে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। কিছু একটা টাইপ করছিল ইলোরা, ওকে দেখে হাসল মিষ্টি করে। 'কেমন আছ?'

'এই মুহূর্তে বড্ডো টেনশনে, বুঝতেই পারছ,' চোখ মটকাল রানা।

'যাও ভেতরে,' বুড়ো আঙুল দিয়ে রাহাত খানের বন্ধ দরজা দেখাল ইলোরা। 'স্যার অপেক্ষায় আছেন।'

দুরু দুরু বুকে ঝকঝকে পালিশ করা দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল ও। বুকের মধ্যে ছলকে উঠল এক ঝলক রক্ত, শুকিয়ে উঠল মুখের ভেতরটা। যতবার এই দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় রানা, ততবারই হয় এই অনুভূতি। কঠোর নীতিপরায়ণ, আজীবন ব্রহ্মচারী তীক্ষ্ণধী ওই বৃদ্ধের সামনে যাওয়ার সময় প্রতিবারই বুকের ভেতর কাঁপুনি উঠে যায়।

এই একটি মানুষ, যাঁর সামনে দাঁড়ালে শ্রদ্ধা ভক্তি আর ভালবাসা, সব মিলিয়ে কেমন এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগে রানার মনে। কাঁচাপাকা পুরু একজোড়া ভুরুর নিচের শাণিত দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছে ভেবে কেমন ভয় ভয়ও লাগে। টাইয়ের নট্ ঠিক করে নিয়ে দরজায় মৃদু নক করল রানা দুবার।

'কাম ইন,' মেঘ ডাকার মত গুরুগম্ভীর, চিরচেনা সেই আহ্বান ভেসে এল। বুড়োর ওই কাম ইনের মধ্যে লুকিয়ে আছে গভীর স্নেহ আর বাৎসল্য, ব্যাপারটা জানা আছে রানার, অথচ শুনলে মনে হয় তেড়ে মারতে আসছে বুঝি।

একটা ফাইলের মধ্যে ডুবে ছিলেন রাহাত খান। রানা ঢুকতে চোখ তুলে চাইলেন একটু। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবছা ইঙ্গিতে বসে পড়তে বললেন। আবার ডুবে গেলেন কাজের মধ্যে। কয়েক মিনিট চুপচাপ কাটল।

মেজর জেনারেলের পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। বিরামহীন পড়েই চলেছে বৃষ্টি। এ এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। টানা তিন দিন হয়ে গেল, অথচ আকাশ পরিষ্কার হওয়ার কোন লক্ষণই নেই এখন পর্যন্ত। চোখ নামিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকাল রানা। পুরু কাঁচ ঢাকা বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার ওপাশের সেই পিঠ উঁচু রিভলভিং চেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছেন মেজর জেনারেল।

ছাই রঙের স্যুট, ইজিপশিয়ান কটনের ধবধবে সাদা শার্ট, ব্রিটিশ কায়দায় বাঁধা দামী ক্রিমসন রঙের টাই, সব মিলিয়ে মানিয়েছে দারুণ বুড়োকে। বয়স

যেন কমে গেছে কয়েক বছর। অবশ্য পাকা ভুরুর সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়ে গেছে কিছুটা। ফাইলটা বন্ধ করে মুখ তুললেন রাহাত খান।

'কেমন আছ, রানা?'

'জ্বি, স্যার, ভাল।'

'তোমার সেই সম্মেলন কবে শুরু হচ্ছে যেন?'

'আর তিন দিন পর, স্যার। আটাশ তারিখে।'

'রওনা হতে চাও কবে?'

'সাতাশ তারিখের বিমানের ডিরেক্ট ঢাকা-টোকিও ফ্লাইটেই যাব ভাবছি।'

'তাহলে তো বেশ সময় আছে হাতে,' তর্জনী দিয়ে নাকের ডগাটা একটু চুলকে নিলেন মেজর জেনারেল। 'যাওয়ার পথে যদি একটু রেঙ্গুন ঘুরে যাও...' থেমে গেলেন কথা শেষ না করেই।

'রেঙ্গুন, স্যার?'

'হ্যাঁ, রানা। ওখানে আমাদের দূতাবাসের কমিউনিকেশন সিস্টেম কাল সন্ধের পর অচল হয়ে পড়েছে হঠাৎ করে। তোমার সেই ম্যাজিক ফরটি ফোর ক্রিপটোসাইফার মেশিনটা আর কি, একটা রোটর জ্বলে গেছে ওটার।'

বৃদ্ধের বক্তব্য শেষ হয়নি, বুঝতে পারছে রানা। কথার মাঝখানে কথা বললে বিরক্ত হন তিনি, তাই চুপ করেই থাকল।

'মনে আছে তোমার মেশিনটার কথা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, 'আছে, স্যার।'

অনেকদিন আগের স্মৃতি মনে পড়ল ওর। পাকিস্তান আমলের কথা, চাইনীজ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ অ্যাডমিরাল হো ইনের বিশেষ অনুরোধে হংকং যেতে হয়েছিল রানাকে একবার। চীন তখন নিজেকে পারমাণবিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে পুরোদমে। এমনকি মহাশূন্যে রকেট পাঠানোর সব ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত করে এনেছে। কিন্তু পশ্চিমা কোন কোন শত্রু ভাবাপন্ন দেশের একেবারেই পছন্দ ছিল না চীনের এই অগ্রযাত্রা। উঠে পড়ে লাগল তারা পিছনে।

হংকঙের কুখ্যাত রেড লাইটনিং টং গ্রুপের প্রধান দস্যু চ্যাঙকে হাত করে তাকে দিয়ে অভিনব সব কায়দায় চীনের একমাত্র ইউরেনিয়াম খনি থেকে ইউরেনিয়াম পাচার করতে শুরু করে তারা। ওখানে গিয়ে কায়দা করে ঢুকে পড়েছিল রানা রেড লাইটনিং টং গ্রুপে। গ্রুপটাকে সমূলে ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিল চাইনীজ সিক্রেট সার্ভিসকে। সেই উপকারের জন্যে কৃতজ্ঞ চীন সরকার রানার মাধ্যমে তখনকার পিসিআইকে একটা ক্রিপটোসাইফার মেশিন উপহার দিয়েছিল।

স্বাধীনতার পর রাহাত খান ওটার অনেকগুলো ডুপ্লিকেট তৈরি করিয়েছিলেন বিসিআইয়ের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে। বিদেশে বাংলাদেশের প্রতিটি দূতাবাসে একটা করে আছে এই মেশিন। পৃথিবীর সমস্ত অয়্যারলেস ট্রাফিক ট্যাপ করে তা ডিকোড করা যায় এর সাহায্যে। যে কোন চ্যানেল—আর্মি, ন্যাভাল, এয়ারফোর্স বা ডিপ্লোম্যাটিক বার্তা আদান-প্রদান, মোট কথা দুনিয়ার

কোথায় কি ঘটতে যাচ্ছে, আগেভাগেই জানতে পারে বাংলাদেশ।

দেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোন ষড়যন্ত্র চলছে কিনা, বা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন গোপন সংবাদ, জানার প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক, আপনা থেকেই জেনে যায় সব বাংলাদেশ।

স্মৃতির পিঠে স্মৃতি জাগে। চট্ করে মনের পর্দায় ভেসে উঠল দস্যু চ্যাঙের সৎ মেয়ে মায়া ওয়াঙের অপূর্ব সুন্দর মুখটা। চমক ভাঙল রানার রাহাত খানের কথায়।

'রোটরটা রিপ্লেস করা অত্যন্ত জরুরী। ভাবলাম, তুমি তো যাচ্ছই, একটু ঘুরে পৌছে দিয়ে যাও জিনিসটা।'

'আমার কোন অসুবিধে নেই, স্যার। এমনিতেই বসে আছি কাজের অভাবে। কোন্ রোটরটা নষ্ট হয়েছে, স্যার, কত নম্বর?'

'আউটার, তিন নম্বরটা।' সামান্য কৌতূহল যেন ঝিলিক মেরে উঠল বৃদ্ধের দু'চোখে। 'ওটার মেকানিজম মনে আছে তোমার এখনও?'

চোখ বুজে ম্যাজিক ফরটি ফোরের মেকানিজমের ব্লু প্রিন্ট মনে করার চেষ্টা করল রানা। অনায়াসেই পুরো প্রিন্টটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। আপনমনে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'আউটার, থার্ড রোটর, পাশাপাশি দুটো মেটাল প্লেট—বাঁ দিকেরটায় ছয়টা ভেরিয়েবল ডিপ্রেশন পিন আর সাতটা স্ট্যাটিক পিন। ডান দিকেরটায় পাঁচটা ভেরিয়েবল ডিপ্রেশন পিন, স্ট্যাটিক পিন আটটা,' চোখ মেলল, 'মনে আছে, স্যার।'

ওর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন মেজর জেনারেল। দৃষ্টিতে উপচানো প্রশংসা আর অকৃত্রিম স্নেহ। কিন্তু রানা চোখ মেলতেই চেহারা গম্ভীর করে তুললেন, মুখ নামিয়ে পাইপে তামাক ভরার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'আজ রাতে রওনা হচ্ছ তুমি। তোমার রওনা হবার খবর আমি জানিয়ে দেব ওখানকার কমিউনিকেশন অফিসারকে। আর হ্যাঁ, কালকের দিনটা রেঙ্গুনেই থাকছ তুমি। আমার ধারণা, ওদেশে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটতে চলেছে।'

'কি রকম?'

'কাল হাইলি ক্লাসিফায়েড একটা কোডেড মেসেজ ট্যাপ করতে শুরু করার সাথে সাথেই জ্বলে গেল হতচ্ছাড়া রোটরটা। সামান্য যেটুকু ট্যাপ করা গেছে, ওখানকার কমিউনিকেশন অফিসার তা ডিকোড করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই যে, পড়ে দেখো,' সামনের ফাইলটা খুলে এক টুকরো কাগজ ওর দিকে এগিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। তামাক ভরে বসিয়ে নিলেন পাইপে বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে টিপে।

চোখ কুঁচকে কাগজটার দিকে চেয়ে আছে রানা। তিনটে মাত্র শব্দ লেখা আছে ওতে: **মেজর জেনারেল ইবরা**...

মুখ তুলল ও। 'মেজর জেনারেল ইবরা?'

'ইব্রাহিম, মেজর জেনারেল ইব্রাহিম।' পাইপ ধরালেন রাহাত খান, একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'রোহিঙ্গা মুসলমান। বর্মী সেনাবাহিনীতে আর

কোন মুসলমান অফিসার নেই এত উঁচুপদে। বুঝতে পারছি না ওঁর ব্যাপারে কী এমন তথ্য থাকতে পারে যা কোডে চালাচালি করার মত গোপনীয়।'

থামলেন বৃদ্ধ। পর পর কয়েকটা টান দিলেন পাইপে। ভাবছেন কিছু একটা চোখ বুজে। 'আমার ধারণা বড় রকম কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। রোহিঙ্গাদের ওপর কী অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে বর্মী সামরিক জান্তা, সে তো জানোই।'

মাথা দোলাল রানা। 'শুধু অমানুষিক বললে পুরোটা বলা হয় না, স্যার।'

'ঠিক। কাল রেঙ্গুনে থাকো তুমি। আমি অন্য সোর্সে এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর করছি, যদি সিরিয়াস কিছু হয়, দূতাবাসের মাধ্যমে জানাব তোমাকে। কালকের মধ্যে যদি যোগাযোগ না করি, তাহলে পরশু চলে যেয়ো তুমি টোকিও। কোনও প্রশ্ন?'

'না, স্যার।'

পাইপ দাঁতে কামড়ে ধরে আরেকটা ফাইল খুলে সামনে ঝুঁকে বসলেন মেজর জেনারেল। সেই সাথে বাঁ হাতে আবছা একটা ইঙ্গিত করলেন রানার উদ্দেশে। পশ্চাদ্দেশ উত্তোলন করতে বলা হলো ওকে।

'সোহেলের সাথে দেখা করো গিয়ে।'

'জ্বি।'

নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ও। সোহেলের রুমে ঢুকে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজাটা। চমকে উঠল সোহেল। রানাকে গম্ভীর মুখে সরাসরি ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তুলোধুনার কাজটা এখনই শুরু হয়ে যায় কিনা ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি এক প্যাকেট সিলভার কাট বের করে এগিয়ে দিল ও রানার দিকে। 'নে, দোস্ত, সিগারেট খা। কদ্দিন পর দেখা, তাই না?'

ব্রেক কষল রানা। থাবা দিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে বসে পড়ল ওর মুখোমুখি। খুলে দেখল একেবারে নতুন প্যাকেট, পুরো বিশটাই রয়েছে। চেহারাটা প্রশান্ত হয়ে উঠল ওর। একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা টুপ্ করে কোটের পকেটে ফেলল, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে নাচাতে লাগল প্রবলবেগে। 'তোরা সব অফিসে বসে করিস কি, বল তো! ঘোড়ার ঘাস কাটিস?'

'কেন?'

'নয়তো কি! কোথায় আন্তর্জাতিক বেসরকারী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সম্মেলনে যোগ দিতে টোকিও যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে বসে আছি, আর এখন কি না সে সব ছেড়ে যেতে হচ্ছে রেঙ্গুনে, সামান্য একটা মেশিনের পার্ট পৌঁছে দিতে? এ সমস্ত ছোটখাট কাজ...'

'তাহলেই দ্যাখ,' দাঁত বের করে হেঁ হেঁ করে হাসল সোহেল। 'আমরা তোর প্রতি কত দয়াশীল। কাজ করাই ছোটখাট, অথচ বেতন দিই রাজা-বাদশার সমান।'

'বাজে কথা বন্ধ কর, কি কি দেয়ার আছে দিয়ে দে। মাঝেমধ্যে এসে কাজ করে দিয়ে যাই বলেই না এখনও টিকে আছে প্রতিষ্ঠানটা, আর মাস গেলে তোরাও দুটো পয়সার মুখ দেখিস। নইলে কবে সদরঘাটে গিয়ে খুজলি-

পাঁচড়ার ওষুধ বেচতি।'

পায়ের কাছে রাখা একটা কালো চামড়ার পেটমোটা ব্যাগ টেবিলের ওপর তুলে আনল সোহেল। দেখতে অনেকটা ডাক্তারি ব্যাগের মত। পার্থক্য শুধু মাঝখানে একটা লকিং ল্যাচের বদলে এটার রয়েছে দু প্রান্তে দুটো ল্যাচ। খোলাই ছিল ব্যাগ, ভেতরে তাকাল রানা। ভেতরের লাইনিঙের গায়ে দুটো পকেট, দুটো রোটর প্লেট আলাদা আলাদা করে রাখা আছে ওর মধ্যে। ব্যাগটা বন্ধ করল সোহেল।

'এবার মন দিয়ে শোন,' বলল ও, 'দেখতে যতই নিরীহগোছের মনে হোক না কেন, ব্যাগটা আসলে ভয়ঙ্কর একটা বোমা। কোন আনাড়ি যদি খুলতে চেষ্টা করে, বা ধর, কেউ যদি জোর জবরদস্তি করে খোলে, তাহলে ভেতরের জিনিস আর ব্যাগটা তো যাবেই, সেই সাথে যে খুলবে সে-ও যাবে ফউত হয়ে।

'এর ভেতরের লাইনিংটা স্টাইরোফোমের তৈরি। সাথে থারমাইট প্লাস্টিক জুড়ে দেয়া হয়েছে ভেতর দিকে। ট্রিগারিং মেকানিজমও সেট করা হয়েছে কায়দা করে। কাজেই, নির্ধারিত নিয়ম ছাড়া কেউ যদি যেনতেন ভাবে খুলতে চেষ্টা করে এই ব্যাগ, তাহলেই বুম্!' হাতের তালু চিত করে দেখাল সোহেল।

'হুঁম, শুনেছি এই ধরনের সিস্টেমের কথা।'

'শুধু শুনেছিস, দেখিস্নি,' সুযোগ পেয়ে ফোড়ন কাটল সোহেল। ভারিক্কি চালে বলল, 'আজ দ্যাখ্, দেখে সার্থক কর জীবনটা। এবার শিখে নে কি করে খুলতে হয়।'

ব্যাগটার একদিকে সাঁটা মিকি মাউসের একটা স্টিকার দেখিয়ে বলল, 'এটা হচ্ছে সামনের দিক। ব্যাগ খোলার সময় এটা রাখবি পেটের দিকে। এবার খেয়াল কর,' এক ইঞ্চি লম্বা, কোল্ড ড্রিঙ্কসের স্ট্র-র মত মোটা, গোল দুটো স্টেইনলেস স্টীলের পিন দেখাল ওকে সোহেল। হাতলের দু-প্রান্ত যেখানে ব্যাগের সাথে মিশেছে, সেখানে দুটো ফুটোর দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বলল, 'ব্যাগ খোলার আগে এই পিন দুটো অবশ্যই এই দুই ফুটোয় ভরে নিতে হবে। এরপর প্রথমে বাঁ দিকের ল্যাচটা আস্তে করে বাইরের দিকে ঠেলে দিবি এক ইঞ্চিমত। পরে ডান দিকেরটাও একইভাবে ঠেলে দিবি। মনে রাখবি, উল্টোপাল্টা হয় না যেন। আগে বাঁ দিকেরটা, পরে ডান দিকেরটা। ব্যস, খুলে গেল ব্যাগ। তবে আসল হচ্ছে এই পিন, এগুলো ছাড়া কাজ হবে না। জোর জবরদস্তি করে খোলা হয়তো যাবে, কিন্তু সাথে সাথেই বুম্! বুঝলি?' কথার সাথে হাত চলছিল সোহেলের, ব্যাগটা খুলে দেখাল ও।

'ভেতরে প্লেট দুটো ছাড়া কিছু নেই, হালকা লাগছে খুব। পারলে কিছু খবরের কাগজ বা বইপত্র ভরে নিস। নে, এবার প্র্যাকটিস কর কয়েকবার।'

'দরকার নেই। কিন্তু, দোস্ত, এ নিয়ে ঝামেলায় পড়ি যদি রেঙ্গুন কাস্টমসের চেকিঙের সময়? তাছাড়া, এই ছোট্ট দুটো জিনিসের জন্যে এতবড় ব্যাগের কি দরকার?'

'তোর ব্যাগ চেক করবে না ওরা। কারণ ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টে যাচ্ছিস তুই, ছদ্মনামে। আর ব্যাগটা পাঠানো হচ্ছে রেঙ্গুন দূতাবাসের জন্যে। অনেক সময় অনেক জরুরী ছোটখাট জিনিস আনা নেয়ার কাজে এই ব্যাগ ইউজ করতে পারবে ওখানকার অফিশিয়ালরা। আর সব দূতাবাসেও পাঠানো হয়েছে এর একটা করে। রাত ন'টায় ছাড়বে তোর প্লেন। কোনও প্রশ্ন?'

হাত বাড়িয়ে খপ্ করে সোহেলের বাঁ কানটা মুচড়ে ধরল রানা। 'কি বললি?'

কাকুতি মিনতি শুরু করল সোহেল। 'ভুল হয়ে গেছে, ভাই, মাফ করে দে, তোর খোদার কসম লাগে। উফ্ শালা! ছিঁড়ে গেল তো কানটা!' কাত হয়ে টেবিলের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ল ও।

'আর কখনও নকল করবি বুড়োর গলা?'

'না, দোস্ত, জীবনেও না। পাগল নাকি! ছেড়ে দে, বাপ্।'

'কী? আমি তোর বাপ্?'

'না…পুত্র!' বলেই টেবিলের তলা দিয়ে কষে একটা লাথি মারল সোহেল।

দুই উরুর মাঝখানটা বাঁচাতে লাফিয়ে সরে গেল রানা কান ছেড়ে দিয়ে। ঠিক এই সময় দু কাপ কফি নিয়ে কামরায় ঢুকল সোহেলের সেক্রেটারি। বিস্মিত হয়ে এর-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল মেয়েটা।

'কি ব্যাপার? আবার মারামারি করছেন আপনারা?'

'কোথায়!' আকাশ থেকে পড়ল দুজন। ট্রে থেকে একটা কাপ তুলে নিয়ে যথেষ্ট দূরে চেয়ার টেনে বসল রানা, কপট গাম্ভীর্যের সাথে অন্য কাপটা তুলে নিল সোহেল।

আপোসের নমুনা হিসেবে নিজের সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল রানা সোহেলের দিকে। খুশি হয়ে উঠেছিল সোহেল, কিন্তু প্যাঁচা হয়ে গেল মুখটা যখন দেখল মাত্র একটা সিগারেট রয়েছে ওতে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করছিল এতক্ষণ মেয়েটা, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে দোলাতে ঘুরে নিজের কামরার দিকে চলে গেল। ভাবখানা যেন এ দুটো আর মানুষ হবে না কোনদিন। দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই আচমকা হা হা করে হেসে উঠল দুই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু।

তিন

ঘুমিয়ে ছিল রানা। আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে উঠে বসল ধড়মড় করে। ডিম লাইট জ্বলছে প্লেনের ভেতর। গভীর ঘুমে মগ্ন যাত্রীরা সবাই। পাশের সীটে বডি বিল্ডারকে বসা দেখে চোখ কোঁচকাল ও। 'কি ব্যাপার?'

'এসে গেছে রেঙ্গুন,' বলল লোকটা। 'তৈরি হয়ে নিন।'

কটমট করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকল রানা, ইচ্ছে হলো এক থাপ্পড়ে খসিয়ে দেয় ব্যাটার চারটে দাঁত। কিন্তু বিন্দুমাত্র পাত্তা দিল না লোকটা, রানা কিছু বলার আগেই উঠে দাঁড়াল, ক্ষিপ্র পায়ে হেঁটে চলে গেল নিজের আসনের দিকে।

চাউনি দিয়ে তাকে ভস্ম করতে ব্যর্থ হয়ে বাইরে তাকাল। গাঢ় অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে ঝিমুচ্ছে ধরণী। মাথার মধ্যে ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে ওর। লোকটা কে আসলে? বাঙালী যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কথায় কুমিল্লার আঞ্চলিক টান পরিষ্কার। দেহের শক্ত পোক্ত গঠন আর ক্রু কাট্ চুল দেখে মনে হয় আর্মির লোক। কিন্তু ওর পিছনে লাগল কেন ব্যাটা? লোকটার গায়ে পড়া আচরণ, কথাবার্তা, সবই কেমন যেন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে। কিছুই বুঝতে পারছে না রানা।

বাল্কহেড উইন্ডোর গায়ে কয়েকটা ছায়া পড়তে ঝট্ করে ঘুরে তাকাল ও। ফিরে এসেছে লোকটা, আরও দুজন রয়েছে এবার সঙ্গে। তাদের একজনের ওপর চোখ আটকে গেল রানার। টেনেটুনে বড়জোর পাঁচ ফুট পাঁচ হবে মানুষটা, কিন্তু বুকের বেড় কম করেও আটচল্লিশ ইঞ্চি। হাফ হাতা শার্ট আর ট্রাউজার পরেছে লোকটা। ঘন লোমে ভরা থোকা থোকা পেশীবহুল দুটো হাত দেখলে ভীমের গদার কথা মনে পড়ে। ক্রু কাট্ চুল, গালে চাপ দাড়ি। সব মিলিয়ে গরিলার মত লাগছে লোকটাকে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে রানার মুখের দিকে।

অন্যজন লম্বায় প্রায় রানার সমানই হবে। এ-ও ক্রু কাট্। বাঁ হাতে বড়সড় একটা রাকস্যাক ঝুলছে। ছোট্ট রেডক্রিসেন্ট প্রতীক আঁকা ওটায়। বাঁ ভুরুর ওপর থেকে নিয়ে চুলের রেখা পর্যন্ত লম্বা একটা কাটা দাগ রয়েছে লোকটার, শুকনো।

প্রথমজন বসে পড়ল রানার পাশে। অন্য দুজন বসল আইলের ওপাশের সীটে।

'আমাদের প্ল্যানে সামান্য রদবদল হয়েছে,' চাপা গলায় রানার উদ্দেশে বলল বডি বিল্ডার।

'মানে! কিসের প্ল্যান?'

ককপিটের দরজার ওপর দুটো লাল আলো জ্বলে উঠল এই সময়:

NO SMOKING

FASTEN YOUR SEAT BELT PLEASE

ভেতরের উজ্জ্বল আলো জ্বেলে দেয়া হয়েছে আগেই। রানার প্রশ্নটা মনে হলো শুনতে পায়নি, সীট বেল্ট বেঁধে নিয়ে দু পা লম্বা করে মেলে দিয়ে বসল লোকটা আরাম করে। এই সময় শুরু হলো ক্যাপ্টেনের গৎ বাঁধা অ্যানাউন্সমেন্ট। প্রথমে বাংলা, পরে ইংরেজিতে যাত্রীদের ধন্যবাদ জানাল সে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে ভ্রমণ করার জন্যে।

অ্যানাউন্সমেন্ট থামতে রানার দিকে সামান্য ঝুঁকে এল বডি বিল্ডার। তেমনি চাপা গলায় বলল, 'শুনুন, সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, এয়ারপোর্ট টার্মিনাল

এড়িয়ে যাব আমরা, বুঝলেন? নিরাপত্তার খাতিরেই আর কি,' একটু হেসে কাঁধ ঝাঁকাল সে অসহায় ভঙ্গিতে। 'কি আর করা!'

অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে থাকল রানা। 'কি বলছেন এসব আপনি! কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমি!'

ঘুরে সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকাল লোকটা। পরিষ্কার বিরক্তি ফুটে উঠল কণ্ঠে, 'অ্যাকটিং বন্ধ করুন তো। আপনার অ্যাকটিং দেখার মত মনের অবস্থা নেই আমার। এমনিতেই বহুত টেনশনে আছি।'

কপাল কোঁচকাল রানা। 'আচ্ছা ঝামেলা! অ্যাকটিং আমি করছি, না আপনি? ভুল করে কাকে…'

'ফের?' এবার সত্যি সত্যি রেগে গেছে লোকটা। চোখ গরম করে বলল, 'ন্যাকা! জানেন না কিসের কথা বলছি? হাওয়া খেতে রেঙ্গুন এসেছেন নাকি আপনি আমাদের সাথে?'

'আপনাদের সাথে! আমি?' আকাশ থেকে পড়ল রানা, 'আমি আপনাদের সাথে এসেছি?'

ওর চোখমুখের ভাব দেখে একটু যেন দ্বিধায় পড়ে গেল বডি বিল্ডার। ইতস্তত করতে লাগল, 'আপনি…আপনি, হাসান সাহেব না?'

এবার অবাক হওয়ার পালা রানার। এই লোক কি করে জানল ওর ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টের ছদ্মনাম? নিজের অজান্তেই মাথা দোলাল ও। 'হ্যাঁ।'

'তো?'

'তো কি?'

'থামুন!' কষে একটা দাবড়ি লাগাল লোকটা। 'আর একটা কথাও শুনতে চাই না। এখন থেকে আমার প্রত্যেকটা নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন আপনি মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত। অলরাইট?'

'আপনি ভুল করছেন,' কঠিন গলায় বলল রানা। 'আপনাকে চিনি না আমি।'

প্রচণ্ড রাগে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল লোকটার। ভয় হলো এখনই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে রানার ঘাড়ের ওপর। নাকের ফুটো ঘন ঘন স্ফীত হচ্ছে, নিঃশ্বাস ছাড়ছে ঝড়ের বেগে। ওদিকে আইলের ওপাশ থেকে রানার মুখের দিকে চেয়ে আছে অন্য দুজন। গরিলার মুখে মিটিমিটি হাসি। শুভেচ্ছার নাকি ব্যঙ্গের, বোঝা গেল না সঠিক।

ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে গিয়েছিল রানা। প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল বডি বিল্ডার। উল্টে অমায়িক হেসে বলল, 'এই দেখো, এখনও পর্যন্ত নিজের পরিচয়টাই তো জানাইনি আপনাকে। কি করে চিনবেন? সরি, ভাই। ভুল হয়ে গেছে। আমি জাহেদ, ক্যাপ্টেন জাহেদ। মিশন লীডার। এ হচ্ছে,' গরিলার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'গোরা। আর ও জসিম। এবার সন্তুষ্ট? যাক্‌গে, শুনুন। সময় থাকতে বাকি…'

একটা হাত তুলল রানা। 'জাহেদ সাহেব, আপনার কোন কথা শোনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। এবার দয়া করে থামুন, বন্ধ করুন আপনার প্যান প্যানানি। ভুল হচ্ছে আপনার। আমি আপনার লোক নই।'

থমকে গেল জাহেদ। মুখে সামান্য এক চিলতে হাসি ছিল, দফায় দফায় মিলিয়ে গেল সেটা। ঝাড়া এক মিনিট পলকহীন চোখে রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল সে। দু চোখ জ্বলছে ধক্ ধক্ করে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তাই মনে হচ্ছে আপনার, না? হাসান সাহেব, সেধে বিপদ ডেকে আনছেন আপনি। রেঙ্গুন ট্যুর দিতে আসিনি আমরা, এসেছি একটা মিলিটারি মিশন নিয়ে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এখনও বাকি, অথচ সেসব বলতে না দিয়ে অহেতুক সময় নষ্ট করছেন আপনি আমার। আমি চাই না আমাদের সম্পর্কটা তেতো হোক, কিন্তু ভাব দেখে মনে হচ্ছে আপনি চাইছেন।'

'আগে আমার একটা কথা…'

'নো! শাট্ ইওর ডার্টি মাউথ আপ, ইউ ব্লাডি সিভিলিয়ান! আর একটা শব্দ মুখ দিয়ে বের করলে…' থেমে গেল জাহেদ কথা শেষ না করেই।

যাত্রীরা সবাই সীট বেল্ট বেঁধেছে কি না পরীক্ষা করে দেখছে সেই বিমানবালা। সামনে এসে রানা আর জাহেদের বেল্ট দুটো টেনে দেখল সে। তার সাথে চোখাচোখি হতে কাষ্ঠ হাসি হাসল জাহেদ।

এক মিনিট পর বাম্প করল বোয়িং, মিঙ্গালাদনের রানওয়ে স্পর্শ করেছে চাকা।

আচ্ছা ফ্যাসাদেই পড়া গেল তো! ভাবছে রানা, এ কোন্ যন্ত্রণা? কার বদলে কাকে নিয়ে টানাটানি করছে ব্যাটা! আলতো করে শোল্ডার হোলস্টারটার স্পর্শ নিল ও। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এটা ব্যবহার করাটা কি ঠিক হবে? নাকি অপেক্ষা করে দেখবে রানা? লোকটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি…।

হাসান কথা বলছে না, তার মানে ভয় পেয়েছে লোকটা, সিদ্ধান্তে পৌঁছুল জাহেদ। একটু নরম হলো। অভয় দেয়ার জন্যে বলল, 'জানি, মনে মনে ঘাবড়ে গেছেন আপনি অ্যাকশনের কথা ভেবে। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকুন, হাসান সাহেব, আপনার নিরাপত্তার ভার আমি নিলাম। শুধু আমার নির্দেশ মেনে চলুন শেষ পর্যন্ত, দেখবেন, কত সহজে মিটে গেছে সব।'

লোকটার আত্মবিশ্বাস দেখে অবাক হলো রানা। জেদি, একগুঁয়ে মানুষ সন্দেহ নেই। জীবনে এরা কমই হারে, ব্যাপারটা জানা আছে ওর।

'রেঙ্গুনে বিমানের আধঘণ্টা হল্টেজ,' আবার বলে উঠল সে। 'ল্যান্ডিঙের পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে সবার অলক্ষে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যাব আমরা অ্যালার্ট থাকবেন।'

কিছুই বলল না রানা। মাথার মধ্যে একশো মাইল বেগে দুইশো রকম চিন্তাভাবনা চলছে ওর। ভেবে পাচ্ছে না কি করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। সেই সাথে মনের ভেতরে একটা আগ্রহও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ওর। জানতে ইচ্ছে করছে, বাংলাদেশ থেকে কোন্ বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে এ

দেশে এসেছে এরা। মিশনটা কিসের?

'একটা কথা কি জানেন, দেশসেবার চাইতে বড় আর কিছুই হতে পারে না। এরচে' মহান কিছু নেই। মনে মনে ভাবুন, দেশসেবা করতে এসেছেন আপনি, দেখবেন সমস্ত ভয়-ডর উধাও হয়ে গেছে মন থেকে। আপনি সিভিলিয়ান বলেই এত কথা বলছি। ওঁদের মত আর্মি পারসন হলে তার দরকার হত না।'

'আপনার সব কথাই বুঝতে পারছি আমি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু আপনি আমার কথা বুঝছেন না। শুনুন, জাহেদ সাহেব, কাকে আপনি আশা করছিলেন আমি জানি না, কিন্তু আমি সেই লোক নই। আপনার মিশন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই আমার।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু চোখের পলকে নড়ে উঠল লোকটা।

রানার ডান হাতের নিচ দিয়ে কিছু একটা এগিয়ে এসে সজোরে আঘাত করল ওর পাঁজরে। আঁধার হয়ে এল সবকিছু, দম বন্ধ হয়ে এল রানার।

'দেখো!' হিস্ হিস্ করে বলল জাহেদ। 'সাবধানে তাকাও, দেখো আমার হাতে এটা কি।'

চোখ নামিয়ে তাকাল রানা। একটা পয়েন্ট থ্রী এইট পুলিস স্পেশাল ঠেসে ধরে আছে লোকটা ওর পাঁজরে। 'আমি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত মুখ খুলবে না তুমি আর। যদি খুলেছ, পরিণতির জন্যে তুমিই দায়ী থাকবে,' হাত সরিয়ে নিল সে।

ধীর গতিতে টার্মিনাল ভবনের দিকে এগিয়ে চলেছে বিমান, গতি ক্রমেই আরও কমছে, থেমে দাঁড়াবে যে কোন মুহূর্তে।

উঠে দাঁড়াল জাহেদ। হাত ইশারায় গরিলাকে কাছে ডাকল। রানাকে দেখিয়ে বলল, 'এর দিকে খেয়াল রাখো, আমি আসছি।'

দ্রুত পায়ে ককপিটে গিয়ে ঢুকল লোকটা, দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল ভেতর থেকে। গোরা এসে বসল তার শূন্য আসনে। রানার দিকে একবারও তাকাল না লোকটা, জানালা দিয়ে চেয়ে আছে বাইরের দিকে। দু মিনিট পরই বেরিয়ে এল জাহেদ। চেহারা একটু যেন খুশি খুশি লাগছে। কাছে এসে গোরার উদ্দেশে বলল, 'তৈরি থেকো। পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে ঘটবে ব্যাপারটা। এই লোকটাকে নামাবার দায়িত্ব তোমার।'

'জ্বি, স্যার।' উঠে দাঁড়িয়ে নিজের আসনের দিকে পা বাড়াল গোরা।

এই সময় একটা অস্বাভাবিক তৎপরতা চোখে পড়ল রানার। একজন-দুজন করে বিমানবালা আর কেবিন-ক্রু গিয়ে ঢুকছে ককপিটে, প্রায় সাথে সাথেই আবার বেরিয়ে আসছে তারা। বেরিয়েই কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে সামনের সারির চার যাত্রীর দিকে তাকাচ্ছে সবাই একবার করে, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ছে যার যার কাজে। দ্বিতীয়বার ভুলেও আর তাকাচ্ছে না এদিকে, এমন ভাব করছে যেন অস্তিত্বই নেই ওদের।

পাশে তাকাল রানা। মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে আছে জাহেদ। দু চোখ ককপিটের দরজার ওপর নিবদ্ধ। রানা ওর দিকে চেয়ে আছে বুঝেও ফিরল

না। বাইরে তাকাল রানা। দাঁড়িয়ে পড়েছে বোয়িং। বার্মা বিমান সংস্থার ছাপমারা একটা গ্যাঙওয়ে এসে দাঁড়িয়েছে গা ঘেঁষে। টার্মিনাল ভবনের দিকে চাইল ও, বড় বড় চারটে ফ্লাডলাইট জ্বলছে মাথায়। প্রায় দিনের মত আলো করে রেখেছে অনেকখানি জায়গা।

দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। এক এক করে মোট সতেরোজন যাত্রী নেমে গেল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সেই সুন্দরী বিমানবালা মুখস্থ বিদায় সম্ভাষণ জানাল সবাইকে। মুখে আড়ষ্ট হাসি।

নেমে যাবে কি না একবার ভাবল রানা। ইচ্ছে করলে খুব সহজেই নেমে যেতে পারে ও ওয়ালথার দেখিয়ে, কিন্তু এত যাত্রীর মধ্যে সে ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হবে না। তাছাড়া এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির কারও চোখে যদি ব্যাপারটা ধরা পড়ে তাহলেই হয়েছে। বার্মা সরকারের রাষ্ট্রীয় অতিথিখানার মেহমান হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না কারও। এরা কি মিশনে এসেছে কে জানে, ভণ্ডুল করে দেয়াটা উচিত হবে বলে মনে হলো না ওর; হয়তো দেশের কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজেই এসেছে।

ভেবেচিন্তে অপেক্ষা করারই সিদ্ধান্ত নিল রানা। দেখা যাক, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। ধৈর্য ধরলে এদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার একটা উপায় হয়তো পাওয়া যাবে পরে। এক এক করে পনেরো মিনিট কেটে গেল, উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ছাড়াই। আরও তিন মিনিট পর ঘটল ঘটনাটা—শেষ যাত্রীটিও তখন ঢুকে পড়েছে টার্মিনাল ভবনের ভেতরে।

আচমকা অত্যুজ্জ্বল নীলচে একটা আভা ঝলসে উঠল, পলকের জন্যে পুরো এয়ারপোর্ট উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সে আলোয়, সেই সাথে বজ্রপাতের মত প্রচণ্ড কড়াৎ শব্দ। পরমুহূর্তে দপ্ করে নিভে গেল বিমানবন্দরের সব আলো, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল সব।

'মুভ!' চাপা হুঙ্কার ছেড়েই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল জাহেদ। পরক্ষণে দুহাতে রানার কোটের ল্যাপেল দুটো আঁকড়ে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল গোরা, শূন্যে উঠে গেল রানা আসন ছেড়ে। হোল্ড থেকে ওর ব্রীফকেস বের করে নিয়েছে এর মধ্যে জাহেদ, ওদের পাশ কাটিয়ে তীরবেগে নিচের দিকে ছুটল সে। আবছাভাবে দেখতে পেল রানা, লোকটার এক হাতে ওর ব্রীফকেস, অন্যহাতে রোটরের ব্যাগ শোভা পাচ্ছে।

গ্যাঙওয়ের মাথায় এনে নামিয়ে দিল ওকে গোরা, পিছন থেকে পিঠে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিল সামনের দিকে। 'নামেন!'

ইমার্জেন্সি জেনারেটর চালু হয়ে গেছে এয়ারপোর্টের। সামনের ফ্লাড লাইটগুলো জ্বলে উঠল, কিন্তু বড্ডো দুর্বল আলো। দূর থেকে বালব্‌গুলোর ভেতরের আঁকাবাঁকা লালচে ফিলামেন্ট পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

পিছন থেকে গরিলার ধাক্কা গুঁতো খেতে খেতে নেমে এল রানা। গ্যাঙওয়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে এক লোকের সাথে নিচু গলায় খুব দ্রুত কি আলাপ করছে জাহেদ। ওরা সবাই নামতে ঘুরে দাঁড়াল আগন্তুক। 'ফলো মি,' বলে হনহন করে হেঁটে চলল সে আগে আগে। লোকটাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল

জাহেদ, পিছন থেকে থাবা দিয়ে তার কোটের কলার মুঠো করে ধরল রানা।

'আমার ব্যাগটা!'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল জাহেদ। মাথায় রক্ত চড়ে গেছে রানার ব্যাগ চাওয়ার ধরন দেখে।

'আমার ব্যাগটা!' একই সুরে, একই ভঙ্গিতে বলল রানা। বাঁ হাত বাড়িয়ে রেখেছে ব্যাগের দিকে।

'কাম, কুইক!' প্লেনের পেটের নিচে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আগন্তুক। 'কামন, ম্যান!'

ঝামেলা বেধে যেতে পারে ভেবে বহুকষ্টে নিজের রাগ দমন করল জাহেদ। ব্যাগ এগিয়ে দিল রানার দিকে। ব্রীফকেসটা দিল গোরার হাতে। 'লেটস গো!' হোলস্টার থেকে পুলিস স্পেশালটা বের করে নিয়েছে সে।

প্লেনের নিচ দিয়ে ওপাশে চলে গেল দলটা, তারপর ছুটল নিঃশব্দ পায়ে। আগন্তুক লোকটার পিছনেই রয়েছে গোরা, তার পিছনে জসিম। রানা আর জাহেদ সবার পিছনে, পাশাপাশি ছুটছে। সতর্ক নজর রেখেছে লোকটা রানার ওপর। পালাবার চেষ্টা করলে বাধা দেবে।

এক দৌড়ে রানওয়েতে উঠে এল ওরা। তারপর আবার ছুটল যে প্রান্তে বোয়িং ল্যান্ড করেছে, তার বিপরীত প্রান্তের দিকে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে চার-পাঁচ হাতের ওপাশে দেখা যায় না কিছুই, সম্পূর্ণ অনুমানের ওপর নির্ভর করে ছুটছে সবাই আগন্তুকের পিছন পিছন। রানওয়ের শেষ মাথায় একটা পাঁচ টনি ট্রাক দেখা গেল আকাশের পটভূমিতে, দাঁড়িয়ে আছে খোলা মাঠে। লাফিয়ে ওটার ক্যারিয়ারে উঠে পড়ল পথ প্রদর্শক, গোরা আর জসিম।

'আপনি সামনে,' রানার উদ্দেশে অস্ত্র নাচাল জাহেদ।

ওকে মাঝখানে বসিয়ে সে বসল ওপাশের জানালার ধারে। মৃদু গর্জন করে স্টার্ট নিল ট্রাক, এবড়োখেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে চলল নাচতে নাচতে। দূর থেকে দেখা যাবে বলে হেডলাইট জ্বালেনি ড্রাইভার, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে চায় সে। ড্যাশবোর্ডের মৃদু আলোয় লোকটার মুখের এপাশটা দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।

বার্মিজ বলেই মনে হলো রানার। মুখটা প্রকাণ্ড, থুত্নির কাছে গিজগিজ করছে কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে, ওদের দিকে একবারও ফিরে তাকায়নি এ পর্যন্ত।

'কারা এরা?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'বন্ধু,' বলল জাহেদ।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কি ধরনের বন্ধু?'

'চুপ করে বসে থাকুন!' ঝাঁঝিয়ে উঠল সে। রানার ওপর রেগে টং হয়ে আছে, লোকটা ওর কলার ধরার স্পর্ধা দেখিয়েছে, কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

আর কিছু জিজ্ঞেস করল না রানা। লোকটা মুখে কিছু না বলুক, ভাবছে রানা, এরা যে বাংলাদেশ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের লোক, সে ব্যাপারে কোন

সন্দেহ নেই এখন আর। কিন্তু এ দেশে কি কাজ এদের, ভেবে পাচ্ছে না ও। মনের মধ্যে হাজারটা প্রশ্ন, হাজারো সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারছে, অথচ কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদের সাথে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। জীবনে কখনও এ ধরনের পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি বলেই হয়তো বেশি অস্বস্তিতে ভুগছে ও।

কোথাও কোন ভুল হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। ভাবল রানা, এ না হয়েই যায় না। কিন্তু কোথায়? কি যেন একটা মনে পড়ব পড়ব করছে, অথচ মনে পড়ছে না। মনে হচ্ছে ভুলটা কোথায় হয়েছে, যেন জানে ও। ওর অবচেতন মন মূক ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু যেন বোঝাতে চাইছে ওকে অনেকক্ষণ থেকেই, কিন্তু ব্যাপারটা কি, ধরতে পারছে না রানা।

দূর ছাই! ওসব কিছু না। আসল কথা হচ্ছে, জাহেদের ভুল হচ্ছে। ওদের এই যোগাযোগ দৈব-সংযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা, আরও দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই ব্যাপারটা খোলসা হয়ে যাওয়া ভাল। লাফ-ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে ট্রাকের, মাঠ ছেড়ে পাকা রাস্তায় উঠে এসেছে ওটা। এখনও হেডলাইট জ্বালানো হয়নি।

'মিস্টার জাহেদ, একটা প্রশ্নের উত্তর চাই আমার। এখনই।'

রানার বলার মধ্যে কাঠিন্য প্রকাশ পেল, ব্যাপারটা কান এড়াল না জাহেদের। ফিরে তাকাল সে, 'মিশন সম্পর্কিত কিছু?'

'ওটা পরে জানতে চাইব। আগে অন্য একটা ব্যাপার জানতে চাই।'

'অন্য ব্যাপারে যত খুশি প্রশ্ন করতে পারেন, তবে মিশন সম্পর্কে নয়।'

পাত্তা দিল না রানা। বলল, 'প্লেনের প্যাসেঞ্জার লিস্টে আমার নাম আছে...'

'নেই।'

'মানে?'

'নেই মানে নেই। সোজা কথাটা বুঝতে পারছেন না? আমাদের চারজনের একজনেরও নাম নেই ওতে।'

থমকে গেল রানা উত্তর শুনে। তারপর বলল, ' আমাদের দূতাবাস থেকে আমাকে রিসিভ করার জন্যে লোক আসার কথা ছিল, আমি আসিনি দেখে সে নিশ্চই খোঁজখবর করতে শুরু করে দেবে।'

'করবে না। কারণ, ঢাকা ছাড়ার আগেই প্ল্যান পরিবর্তন করেছি আমি। কথাটা প্রথমেই আপনাকে জানিয়েছি, মনে হয় ভুলে গেছেন। কাজেই ও নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই।'

বেমক্কা ঝাঁকি খেয়ে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা ও জাহেদ। রাস্তা ছেড়ে আবার মাঠে নেমে পড়েছে ট্রাক। কোনরকমে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে বসল ওরা, ড্যাশবোর্ড আঁকড়ে ধরে বসে থাকল শক্ত হয়ে। একটু পর হেডলাইট জ্বেলে দিল ড্রাইভার, উজ্জ্বল আলোর দুটো ধারা ছুটে গেল অন্ধকারের চাদর ভেদ করে।

ঝাঁকি খেতে খেতে একটা সরু রাস্তায় উঠে এল ট্রাক আবার, গিয়ার

বদলে এক্সিলারেটর দাবিয়ে ধরল ড্রাইভার ফুটবোর্ডের সাথে। হঠাৎ সামনেই একটা গার্ড পোস্ট দেখা গেল। এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি হবে হয়তো, ভাবল রানা। সোজা ওদিকেই ছুটছে গাড়ি। ঘাড় ঘুরিয়ে ক্যাবের পিছনের চৌকো ছোট্ট জানালাটা দিয়ে পিছনদিকে তাকাল রানা। জানালা জুড়ে বসে আছে গরিলা, হাতে একটা ওয়েবলি অ্যান্ড স্কট, রানার মাথার পিছনদিক সই করে ধরে আছে। চোখাচোখি হতে একটু হাসল গোরা।

মুখ ফিরিয়ে নিল রানা। সাথে সাথে চোখ কুঁচকে উঠল। গার্ড পোস্টটা অনেক কাছে এসে পড়েছে, খাকি পোশাক পরা কুণ্ডলী পাকানো একটা দেহ পড়ে থাকতে দেখল রানা ওটার সামনে। হঠাৎ নড়ে উঠল দেহটা, উঠে বসল ধীরে ধীরে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে—ভেতরে ট্রাক নিয়ে ঢোকার সময় এরাই বোধহয় পিটিয়ে অজ্ঞান করে রেখে গিয়েছিল গার্ডটাকে।

ট্রাকের গর্জন কানে যেতে সচকিত হলো লোকটা, তাড়াতাড়ি উঠে বসল হাঁটুতে ভর দিয়ে। হেডলাইটের আলোয় পাশেই পড়ে থাকা নিজের রাইফেলটা দেখতে পেয়ে থাবা দিয়ে তুলে নিল সে ওটা, ট্রাক লক্ষ্য করে তুলল।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। জানালা দিয়ে বাঁ হাত বের করে দিয়েছে জাহেদ, বিন্দুমাত্র দেরি না করেই টেনে দিল সে পয়েন্ট থ্রী এইটের ট্রিগার। আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল গার্ড রাইফেল ছেড়ে দিয়ে, বাঁ হাতে খামচে ধরে আছে বুকের মাঝখানটা। সাঁ করে তাকে পাশ কাটাল ট্রাক।

ঘুরে চওড়া আলোকিত একটা রাস্তায় উঠে এল, ছুটে চলল তীব্রগতিতে। কিন্তু কয়েক মাইল যেতেই সন্দিহান হয়ে উঠল রানা। পথের দু ধারের বাড়িঘরের সংখ্যা একটু একটু করে কমে আসছে বলে মনে হলো ওর। তার মানে শহরের দিকে নয়, সম্পূর্ণ উল্টোদিকে চলেছে ওরা। ক্রমেই সরে যাচ্ছে রেঙ্গুনের কেন্দ্র থেকে দূরে।

'কোথায় চলেছি আমরা?' জাহেদের দিকে ফিরল রানা।

'গেলেই দেখতে পাবেন।'

চুপ করে গেল ও। বসে থাকল ব্যাগ কোলে নিয়ে। কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে করল ট্রাক। তারপর একটা বাজারের মধ্যে দিয়ে ছুটল আবার। দুপাশে অসংখ্য সাইনবোর্ড, প্রায় সবগুলোই বর্মী ভাষায় লেখা, কিছুই বুঝল না রানা। শুধু হোন্ডা, এক্সাইড ব্যাটারি, হ্যাডফিলডস্ পেইন্টস ইত্যাদি কয়েকটা সাইনবোর্ড ইংরেজিতে লেখা বলে পড়া গেল।

বাজার ছাড়িয়ে আবার বড় রাস্তায় উঠল ট্রাক।

চার

আরও দু মাইল এগিয়ে গাড়ি দাঁড় করানো হলো। আগেই অফ করে দেয়া

হয়েছে হেডলাইট। জায়গাটা অন্ধকার, রাস্তায় একেবারেই আলো নেই। পিছনের ক্যারিয়ার থেকে ঝপাঝপ্ নেমে পড়ল পথ প্রদর্শক, গোরা আর জসিম। জানালার পাশে এসে জাহেদের উদ্দেশে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল প্রথমজন, 'নেমে আসুন। গাড়ি বদল করব আমরা।'

ইগনিশন থেকে চাবি খুলে নিয়ে ড্রাইভার নেমে পড়েছে ততক্ষণে। জাহেদ আর রানাও নেমে এল। 'কোথায় গাড়ি?' জানতে চাইল জাহেদ।

'ওই যে,' একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ফোক্সওয়াগেন মাইক্রোবাস দেখাল লোকটা।

দ্রুত পা চালাল ওরা। জাহেদের নীরব ইশারায় রানার একেবারে গা ঘেঁষে চলছে গোরা। রানার ব্রীফকেসটা ওর বাঁ হাতে। জসিম লোকটার কোনও খেয়ালই নেই রানার দিকে, এ পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। নিজের ভারী রাকস্যাক নিয়েই ব্যস্ত। ডাক্তারি যন্ত্রপাতি আছে হয়তো ওটায়, ভাবল রানা। বেশ ভারী বোঝা যায়, স্ট্র্যাপগুলো টানটান হয়ে আছে।

ওদের দেখতে পেয়ে মাইক্রোবাসের ড্রাইভারের আসন থেকে নেমে এল এক তালগাছ। কম করেও ছয় ফুট সাত আট ইঞ্চি লম্বা হবে লোকটা। তেমনি ছিপছিপে। কাঠির মত সরু সরু হাত দুটো প্রায় হাঁটু ছুঁয়েছে।

'সব ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করল পথ প্রদর্শক।

'জ্বি, স্যার,' গমগম করে উঠল লম্বু। প্রায় চমকেই উঠল রানা লোকটার গলা শুনে। বাবারে বাবা! মানুষের গলা এত মোটা হয়!

'গুড।' ঘুরে দাঁড়াল প্রশ্নকর্তা, ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল জাহেদের দিকে। বলল, 'পরিচয় পর্বটা সেরে ফেলা যাক সংক্ষেপে। আমি রাশেদ। আজ সকালে আমিই ফোন করেছিলাম ঢাকায়।'

'আমি জাহেদ, ক্যাপ্টেন জাহেদ,' রাশেদের বাড়ানো হাতটা জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল সে। 'মিশন লীডার। ভেরি প্লীজড্ টু মিট ইউ।' এরপর রানা, গোরা আর জসিমের সঙ্গে রাশেদকে পরিচয় করিয়ে দিল সে।

এবার ট্রাক ড্রাইভার আর তালগাছের সাথে আলাপ করিয়ে দেয়া হলো ওদের। 'এ হচ্ছে আবদুর রহমান,' বলল রাশেদ। 'কানে কম শোনে। আর এ,' তালগাছের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। 'নাম যদিও সোলায়মান, কিন্তু আমরা ডাকি আবহাওয়া অফিসার। জোরে বাতাস উঠলে ওর মাথায়ই প্রথমে লাগে কি না!'

লজ্জা পেল তালগাছ। মুখ নিচু করে মাথা চুলকাতে লাগল।

'চলুন। গাড়িতে উঠে কথা হবে। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না।'

জাহেদকে নিয়ে রাশেদ বসল সামনের সীটে। রানাকে মাঝখানের সীটে বসানো হলো জানালার ধারে। তার পাশে গোরা। আবদুর রহমান আর জসিম বসল পিছনের সীটে। চলতে শুরু করল ফোক্সওয়াগেন। নানারকম বিদঘুটে আওয়াজ করছে ওটা চলতে চলতে, মেঘের মত ঘন কালো ধোঁয়া ছাড়ছে এগজস্ট পাইপ দিয়ে। একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা এনজিনের, ভাবল

রানা; কতদিন সার্ভিসিং করানো হয় না কে জানে। পিছনে তাকাল ও। একে অন্ধকার, তারওপর কালো ধোঁয়া, মনে হচ্ছে পিছনের কাঁচের গায়ে কে যেন একপোচ কালো রঙ লাগিয়ে দিয়েছে।

একটু পর মুখ খুলল জাহেদ। নিচু গলায়, পিছনের কেউ যাতে শুনতে না পায়, বলল, 'টেলিফোনে প্রথমে বললেন তিন তারিখ সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকতে হবে আমাদের টেকনাফ হয়ে। তারপরই আবার আমাদের দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে নতুন প্ল্যান জানালেন, আজই আসতে হবে, আকাশ পথে। ব্যাপারটা কি, মিস্টার রাশেদ?'

'সবই চিতার নির্দেশে করেছি আমি।'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ। টেলিফোন করেছিলাম আসলে শত্রুপক্ষকে মিসগাইড করার জন্যে। এদেশে আন্তর্জাতিক তো বটেই, এমনকি সমস্ত লোকাল ফোন কল পর্যন্ত ট্যাপ করা হয়। বহু আগে থেকেই চলে আসছে এসব। ফোন করে তাই ব্যাপারটা একটু জটিল করে তুলতে চেয়েছিলাম আসলে আমরা। ওরা জানবে একরকম, আর আমরা করব আরেকরকম, এই ছিল চিতার উদ্দেশ্য। মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েই ছুটলাম আপনাদের দূতাবাসে। আপনার বস্, ব্রিগেডিয়ার জলিল খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন আমার খোলামেলা প্ল্যান শুনে, তাই না?'

'শুধু তাই? রীতিমত ঘাম ছুটে গিয়েছিল বন্ধুর বিপদের কথা ভেবে।'

একটু হাসল রাশেদ। 'তা ভদ্রলোকের গলা শুনেই টের পেয়েছি আমি। কিন্তু কি করব, চিতার হুকুম। অনেকদিন ধরে দেখা-সাক্ষাৎ নেই ওঁদের দুজনের, কিন্তু টেলিফোনে মাঝেমধ্যে আলাপ-সালাপ হয় শুনেছি।'

'জানি। চিতার অনেক গল্প শুনেছি আমি বসের মুখে। তারপর? ফোন সেরেই ছুটলেন দূতাবাসে?'

'হ্যাঁ। ফোন করার এক ঘণ্টার মধ্যে দেখা করি গিয়ে রাষ্ট্রদূত মিস্টার রেজাউল করিমের সঙ্গে, তাঁকে চিতার দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত সেট আপটা জানাই বিস্তারিতভাবে। সব শুনে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে দেরি হয়নি ভদ্রলোকের। আমাকে আশ্বাস দিলেন তিনি, বললেন ঢাকার সাথে যোগাযোগ করবেন গোপন মাধ্যমে। আপনার চীফকে জানাবেন নতুন পরিকল্পনার কথা।'

'প্ল্যানটা এককথায় চমৎকার হয়েছে,' বলল জাহেদ। 'হাতে সময় আছে বলে আমরা সবে ভাবতে শুরু করেছিলাম, কিভাবে কি করব। হঠাৎ করে বিকেলবেলা শুনি এই খবর, ফ্লাইটের তখন বাকি আড়াই ঘণ্টার মত। খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে...'

'আপনাদের এই ঝামেলায় ফেলার জন্যে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। আশা করি সমস্যাটা বুঝবেন আপনি। চিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে বড্ডো দুশ্চিন্তায় আছি আমরা।'

'দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই আপনার, মিস্টার রাশেদ। চিতাকে সাহায্য করার এই বিরল সুযোগ পেয়ে আমি বরং ধন্য মনে করছি নিজেকে। গর্ব অনুভব করছি।'

'ধন্যবাদ।'

এনজিনের অবস্থা যাই হোক, গাড়িটা ছুটছে বেশ জোরেই। খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে ঢুকছে ঠাণ্ডা বাতাস। শীত শীত লাগছে। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল রানা, মেঘ করেছে খুব—বৃষ্টি নামতে পারে। কোনদিকে ছুটছে গাড়ি বোঝার কোন উপায় নেই। এমনিতেই রেঙ্গুনের পথঘাট বলতে গেলে কিছুই চেনে না রানা। তারওপর আলোও নেই।

এর আগে একবারই মাত্র রেঙ্গুন এসেছে রানা, অনেক আগে। সবে স্বাধীন হয়েছে তখন বাংলাদেশ, কিন্তু বিশেষ এক মহল ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। ষড়যন্ত্র শুরু করে তারা শিশু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, আস্তে আস্তে দেশটাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে উঠেপড়ে লাগে। এই রেঙ্গুনেই এক হয় সেইসব কুচক্রী, তথাকথিত 'মুসলিম বাংলা ফৌজ' গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দিয়েছিল মাসুদ রানা। এখানেই সেবার প্রথম টক্কর লাগে ওর অত্যন্ত প্রতিভাধর, দোর্দণ্ডপ্রতাপ দস্যু উ সেনের সঙ্গে।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে সামনে তাকাল রানা। হেডলাইটে তেমন জোর নেই, সামনেটাও ভাল দেখা যায় না। নিবিষ্ট মনে গাড়ি চালাচ্ছে আবহাওয়া অফিসার, মাথা প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে গাড়ির ছাত। তার পাশে এখনও নিচু গলায় বকবক করে চলেছে জাহেদ-রাশেদ। কি এত আলাপ করছে ব্যাটারা? ভুরু কোঁচকাল রানা।

ভেতরে ভেতরে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে ওর। ভেবেছিল প্লেন থেকে নেমে এদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার একটা উপায় খুঁজে নেবে, ফাঁক বুঝে সটকে পড়বে। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। এত লোককে কি করে ফাঁকি দেবে ও?

চিন্তায় বাধা পড়ল, আচমকা বাঁয়ে টার্ন নিয়েছে মাইক্রোবাস। সিধে হয়েই আবার ডানে টার্ন নিল গতি একটুও না কমিয়েই। আরও মিনিট পাঁচেক চলার পর থেমে দাঁড়াল প্রকাণ্ড একটা অন্ধকার দোতলা বাড়ির সামনে।

'নামুন সবাই,' বলল রাশেদ। 'কুইক!'

নেমে পড়ল ওরা। রাশেদকে অনুসরণ করে দ্রুত ঢুকে পড়ল বাড়িটার বাউন্ডারির মধ্যে। বাড়ির ভেতরে ঢুকল না সে, দেয়ালের গা ঘেঁষে খুব সাবধানে পিছনের বাউন্ডারি ওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'কি হলো?' কিছুটা বিস্মিত হলো জাহেদ। 'এখানে কেন?'

'জাম্প!' দেয়ালের ওপর চড়ে বসেছে ততক্ষণে রাশেদ এক লাফে। পরমুহূর্তে ধুপ করে লাফিয়ে পড়ল ওপাশে। দেখাদেখি অন্যরাও অনুসরণ করল তাকে, এক এক করে দেয়াল টপকাল সবাই। রানার ঠিক পিছনেই আঠার মত লেগে রয়েছে গোরা, ঠোঁটে কুলুপ এঁটে কেবল অনুসরণ করে চলেছে।

বাড়িটার পিছনে সরু একটা রাস্তা। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকটা বিল্ডিং। বেশিরভাগই অন্ধকারে ডুবে আছে। বেশ বড় একটা মাঠও

দেখা যাচ্ছে ওদিকে। তার মাঝেখান দিয়ে কোনাকুনি ভাবে ছুটল ওরা এবার। মাঠ পেরিয়ে আরেকটা সরু রাস্তায় এসে উঠল। সামনেই অনেকখানি জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশাপাশি অনেকগুলো প্রকাণ্ড বিল্ডিং। কোন অভিজাত আবাসিক এলাকা হবে এটা, ভাবল রানা। এটা পিছন দিক।

রাশেদের নির্দেশে সন্তর্পণে এগোল ওরা। চার পাঁচটা বাড়ি পাশ কাটিয়ে চট্ করে ঢুকে পড়ল একটা তিনতলা বাড়ির পিছন দরজা দিয়ে। ভেতরে এসে চারদিকে তাকাল রানা। বাড়িটা বেশ পুরানো মনে হচ্ছে। কাঠের ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড রয়েছে জানালায়, তার ফাঁক দিয়ে ভেতরের আলো আসছে বাইরে।

নিঃশব্দে পিছনের একটা দরজা খুলে দিল কেউ ভেতর থেকে।

মিঙ্গালাদন এয়ারপোর্ট। রেঙ্গুন।

টার্মিনাল ভবনের দোতলার ক্যাফেটেরিয়ার এক কোণে বসে আছে ছোটখাট এক লোক। সারা ক্যাফেটেরিয়া আলোয় আলোয় ঝলমল করলেও এই জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। বাল্‌ব নেই বা ফিউজ হয়ে গেছে বলে নয়, ওপরমহলের নির্দেশে নিভিয়ে রাখা হয়েছে। আরও দুজন খদ্দের রয়েছে ওদিকে, দরজার কাছাকাছি বসে কফি পান করতে করতে গল্প করছে দুই যুবক। এই তিনজন ছাড়া এ মুহূর্তে আর কেউ নেই ক্যাফেটেরিয়ায়।

একটা টেবিলের ওপর বসে আছে ছোটখাট মানুষটা। চোখে নাইটগ্লাস। দেয়ালজোড়া পুরু কাঁচের জানালা দিয়ে টারমাকের দিকে চেয়ে আছে সে। 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের' বিজি ০৭৬ ফ্লাইট অবতরণ করেছে। ট্যাক্সি করে টার্মিনাল ভবনের একটু দূরে এসে দাঁড়িয়েছে সবে। পলকহীন চোখে চেয়ে আছে সে বিমানটার দিকে।

বার্মিজ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের ওয়াচার লোকটা, উ উইন। মনে মনে কর্নেল উ ক মঙের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করছে উইন। কর্নেল মঙ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের চীফ। ভীষণ বগরাগী মানুষ। দেহখানাও তেমনি দশাসই। উইনের ধারণা কম করেও তিনশো পাউন্ড ওজন হবে চীফের। চর্বিবহুল মুখখানা দেখলে ওর কেন যেন জলহস্তীর কথা মনে পড়ে যায়। তার চোখে চোখ রেখে নির্ভয়ে কথা বলতে পারে, এমন কেউ নেই তাদের সার্ভিসে, কথাটা নির্দ্বিধায় লিখে দিতে পারে উইন।

আজ দ্বিতীয় বিয়ে বার্ষিকী উইনের। কথা ছিল যত কাজই থাক, আজ রাতটার জন্যে অন্তত ছুটি নেবে সে। স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরবে-বেড়াবে, ছবি দেখবে এবং চ্যাঙ জিয়াঙে চাইনীজ খাবে। কিন্তু কোনটাই হলো না। বেচারী এখনও হয়তো সাজগোজ করে বসে আছে ওর অপেক্ষায়।

এ সবের জন্যে দায়ী ওই ব্যাটা কর্নেল। দুপুরে ওকে নিজের কামরায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন কর্নেল মঙ। হুকুম দিয়েছেন, রাতে এয়ারপোর্টে বসে 'বিমানের' বিজি ০৭৬ ফ্লাইটের ওপর নজর রাখতে হবে। কজন যাত্রী নামে, তাদের মধ্যে কারও আচরণ সন্দেহজনক মনে হয় কি না ইত্যাদি ওয়াচ করতে হবে। কাউকে সন্দেহ হলে তৎক্ষণাৎ জানাতে হবে তা কর্নেলকে।

উইন জানে না, এয়ারপোর্ট কাস্টমসকেও এই একই নির্দেশ পাঠিয়েছে কর্নেল। নির্দেশে বলা হয়েছে, ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট হোল্ডার কেউ যদি আসে ওই ফ্লাইটে, যত আপত্তিই করুক, অবশ্যই তন্ন তন্ন করে চেক করতে হবে তার বা তাদের ব্যাগেজ। সাধারণ যাত্রীদের বেলায়ও ওই নির্দেশ।

চেয়ে চেয়ে দেখছে উইন, একটা বাচ্চা মেয়েসহ নারী পুরুষ মিলিয়ে মোট সতেরোজন যাত্রী নেমে এল প্লেন থেকে। ধীর পায়ে টার্মিনাল ভবনে এসে ঢুকল তারা এক এক করে। কারও মধ্যে কোনরকম সন্দেহজনক আচরণের আভাস পর্যন্ত নেই। নিতান্ত নিরীহ, সাধারণ যাত্রী এরা—নিশ্চিত হলো উইন। ঘুরে আবার প্লেনের দরজার দিকে তাকাল সে, আর কেউ নামে কিনা দেখার জন্যে। কিন্তু একনাগাড়ে প্রায় দশ মিনিট চেয়ে থাকার পরও যখন আর কেউ নামল না, নাইটগ্লাস নামিয়ে নিল সে। দুহাত টনটন করছে তার জিনিসটা একভাবে ধরে থাকতে থাকতে। ডানে-বাঁয়ে তাকাল উইন, বয়-বেয়ারাদের কাউকে পেলে এক কাপ কফি চাইবে। কিন্তু কেউ নেই ব্যাটারা। শুধু সেই দুই খদ্দেরকে দেখা যাচ্ছে ও প্রান্তে—সিগারেট টানছে এখনও বসে বসে।

এইসময় চমকে উঠল উইন, আচমকা উজ্জ্বল নীল আলোর একটা ঝলক, এবং সাথে সাথে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের আওয়াজে ধড়াস্ করে উঠল কলজে। পরমুহূর্তে নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল চারদিক। নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না উইন চোখের সামনে তুলে ধরেও।

দ্বিধায় পড়ে গেল সে। কি করবে বুঝতে পারছে না। সারা এয়ারপোর্টে আলো বলতে আছে সদ্য আসা বিমানটার ভেতরের আলো, তাও বাইরে খুব কমই আসছে। কিন্তু ওরই মধ্যে ব্যাপারটা চোখে পড়ল উইনের। ঠিক পরিষ্কার নয় যদিও, তবুও, মনে হলো একটা ছায়া যেন উড়ে বেরিয়ে এল বিমানটার পেটের ভেতর থেকে, চোখের পলকে মিশে গেল বাইরের কালিগোলা অন্ধকারে।

মাথা ঝাড়া দিয়ে আবার প্লেনটার দিকে চাইল সে। আরেকটা ছায়া! এবার পরিষ্কার দেখা গেল, হাতে বিরাট একটা ব্যাগ নিয়ে দুই লাফে গ্যাঙওয়ে পেরিয়ে মাটিতে পা রাখল আরেকজন। ব্যাপারটা এতই অভাবিত এবং এতই দ্রুত ঘটে গেল যে নাইটগ্লাস চোখে তোলার সময় পর্যন্ত পেল না উইন। এবার ব্যস্ত হয়ে ওটা তুলল সে, সাথে সাথেই আরও দুটো ছায়ামূর্তি দেখা গেল। এই সময় এমারজেনসি জেনারেটরটা চালু হয়ে গেল। মেইন এয়ারপোর্ট ভবন আর বাইরের কয়েকটা আলো জ্বলে উঠল। সে আলোয় প্রায় পরিষ্কার দেখা গেল, বেশ লম্বা চওড়া একজনকে দুহাতে প্রায় শূন্যে তুলে গ্যাঙওয়ের মাথায় এনে দাঁড় করাল গরিলার মত এক লোক। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে সময় লাগল বড়জোর দুই কি তিন সেকেন্ড।

প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও সামলে নিতে দেরি হলো না উইনের। হাজার হলেও ট্রেনিং পাওয়া ওয়াচার, অনুমানের ওপর নির্ভর করে ক্যাফেটেরিয়ার প্রবেশ পথের দিকে পা বাড়াল সে। টেলিফোন করতে হবে

কর্নেল মঙকে। কিন্তু সামনেই একটা খসমস শব্দ উঠতে থমকে দাঁড়াল। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল কে যেন।

'কে ওখানে!' কেন যেন গলাটা কেঁপে গেল উইনের।

কোন উত্তর এল না। কিন্তু পরিষ্কার টের পেল সে, দুজোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে তার দিকে। যারাই হোক, বেশ নিশ্চিন্তে পা ফেলে এদিকেই আসছে।

প্রায় ককিয়ে উঠল এবার উইন, 'কে! কারা?' অজান্তেই গলা চড়ে গেছে তার, কাঁপুনি উঠে গেছে বুকের মধ্যে।

হঠাৎ ওর হাত দুটো চেপে ধরল কারা যেন দুপাশ থেকে। চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বাঁ বাহুতে তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা অনুভব করল উইন, চামড়া মাংস ভেদ করে ইনজেকশনের সুঁই ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ওখানটায়। মৃত্যুভয় গ্রাস করল তাকে, হাত-পা অসাড় হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

এমন সময় পাশ থেকে মোলায়েম কণ্ঠে কেউ বলে উঠল, 'ভয় পেয়ো না, তোমাকে জানে মারব না আমরা। এটা ঘুমের ওষুধ। কাল বিকেলে বা সন্ধেয় যখন তোমার ঘুম ভাঙবে, তোমার চীফকে বোলো, চিতা তাকে সালাম জানিয়েছেন। কেমন?'

'চিতা!' কথা এরই মধ্যে জড়িয়ে এসেছে উইনের, জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। বহুকষ্টে জিজ্ঞেস করল সে, 'চিতা কে?'

'তুমি চিনবে না তাঁকে। কর্নেলকে বোলো, সে চিনবে।'

ওইদিন সকাল ন'টার ঘটনা।

সুলে প্যাগোডা রোডের বর্মা হোটেলস অ্যান্ড ট্যুরিজম সার্ভিসের আকাশছোঁয়া বিশাল ভবনটার পাশের দশতলা ভবন। এর পাঁচতলার একটা কামরায় সামনের টাইপ করা কাগজটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে বার্মিজ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের চীফ কর্নেল উ ক মঙ। চোখ লাল করে কাগজটার দিকে চেয়ে আছে সে। টাইপ করা শব্দগুলো এ পর্যন্ত বিশ-পঁচিশবার পড়া হয়ে গেছে, কিন্তু নিজেকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছে না সে যে এমনটি হতে পারে, বা হওয়া সম্ভব।

তার প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বসে আছে টেলি কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের এক উঁচু পদের কর্মকর্তা, আই হাপ। একভাবে চেয়ে আছে সে সামনের বিশালদেহী মানুষটার থলথলে প্রকাণ্ড মুখটার দিকে। সাইকেলের টায়ারের মত পুরু ঠোঁটজোড়া বিচ্ছিরিরকম কালো। নিচেরটা সামান্য ঝুলে পড়েছে, ফাঁক দিয়ে কালো মাড়ি দেখা যাচ্ছে। খোলা মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ছে লোকটা ঝড়ের বেগে। কাঁচা রসুনের উৎকট গন্ধের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না বেচারা কর্মকর্তা। মনটা পালাই পালাই করছে তার।

এক সময় হঠাৎ সিধে হলো কর্নেল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ জুড়ে দিল

রিভলভিং চেয়ারটা। বিড়বিড় করে বলল সে, 'ওপেন লাইনে কেউ এ ধরনের প্ল্যান নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। তাও আবার এক দেশের আর্মি ইন্টেলিজেন্সের চীফের সাথে?' আনমনে দুম করে প্রচণ্ড এক কিল বসাল কর্নেল টেবিলটার ওপর।

আঁতকে উঠেছিল হাপ প্রথমে, পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিল। তার ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা কর্নেলের চোখে ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে কান-গাল গরম হয়ে উঠল। বারকয়েক খুক্ খুক্ করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সে। বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটা ঘটেছে ঠিক তাই, কর্নেল। আপনি চাইলে রেকর্ড করা কথাগুলো বাজিয়ে শোনাবার ব্যবস্থা করা যাবে। অবশ্য...ওপাশ থেকে রিসিভার তোলার পর এখান থেকে প্রথমে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, সেগুলো বহু চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি। কথাগুলো যেমন ছিল চাপা, তেমনি দ্রুত। তবে পরের কথাগুলো একদম পরিষ্কার।'

'কত নম্বর থেকে টেলিফোন করা হয় ঢাকায়? ফোনটা কার?'

'ওটা একটা পে-টেলিফোন, কর্নেল। আমাদেরই ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জের। সকাল পোনে আটটার সময় করা হয়েছে।'

'ঢাকার নাম্বারটা কার, জানা গেছে? সত্যিই ওটা ব্রিগেডিয়ার জলিলের?'

'সন্দেহ আছে। ওই নাম্বারে কয়েকবার ট্রাই করে দেখেছি আমি নিজে, ঢাকার পুরনো এয়ারপোর্ট এলাকার শাহীনবাগের একটা বাসার নাম্বার ওটা। বাড়ির লোক বলেছে, ওটা নাকি বাংলাদেশ শিল্প অধিদফতরের কোন এক সচিবের বাসার নাম্বার।'

চোখ বুজে কিছু একটা ভাবল কর্নেল মঙ। উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই এখন তার চেহারায়, সম্পূর্ণ শান্ত দেখাচ্ছে। চোখ মেলল সে। 'ঠিক আছে, মিস্টার হাপ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি ওদিকে আরেকটু লক্ষ রাখবেন, আর কোন টেলিফোন করা হয় কিনা ঢাকায়। ওকে? গুড ডে।'

'গুড ডে, কর্নেল,' মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল হাপ। বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

আবার চোখ বুজল কর্নেল। আপনমনে বিড়বিড় করে বলতে লাগল কী সব। এক সময় উঠল সে। চেয়ারের পিছনের প্রকাণ্ড ফাইলিং র‍্যাক থেকে একটা ফাইল নিয়ে এসে বসল আবার। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার ফ্লাইট শিডিউল আছে ওই ফাইলে।

পাঁচ

ছোট্ট একটা প্যাসেজ পেরিয়ে কিচেনে এসে ঢুকল দলটা। কিচেনটা প্রকাণ্ড। পুরো মেঝে ও চার দেয়ালের ছ ফুট পর্যন্ত দামী মার্বেল টাইলস দিয়ে মোড়া। দামী বর্মা টিকের তৈরি সদৃশ্য ওয়াল কেবিনেট ঝুলছে দেয়ালের এমাথা থেকে

ওমাথা পর্যন্ত। সিঙ্ক বার্নারসহ সবকিছুই অত্যন্ত দামী। ঝকঝক তকতক করছে পুরো কিচেন।

অন্য প্রান্তের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা কিচেন থেকে। লম্বা করিডর পেরিয়ে এসে দাঁড়াল এক সুসজ্জিত হলরূমে। অত্যাধুনিক সব আসবাবপত্রে সাজানো রূমটা। অর্থই শুধু নয়, সেই সাথে সুরুচিরও সমন্বয় ঘটানো হয়েছে রূমটার ডেকোরেশনে। পুরু কার্পেটে মোড়া মেঝের প্রতিটি ইঞ্চি। ও মাথায় প্রকাণ্ড কাঠের সিঁড়ি, 'এল' প্যাটার্নের বাঁক খেয়ে উঠে গেছে দোতলায়।

ওদের দোতলায় নিয়ে এল রাশেদ। একটা রূমে বসতে দিল। 'একটু জিরিয়ে নিন,' বলল সে। 'আমি দেখি ম্যাডাম কি করছেন।' দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা।

'ম্যাডামটা আবার কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

উত্তর দিল না জাহেদ। জসিমের দিকে ফিরল, রাকস্যাকের দিকে ইঙ্গিত করল ভুরু নাচিয়ে। 'ইকুইপমেন্ট সব ঠিক আছে তো?'

'জ্বি, ক্যাপ্টেন। ঠিক আছে।' এই প্রথম লোকটাকে কথা বলতে শুনল রানা। কথার মধ্যে কেমন সর্দি সর্দি ভাব।

'আমাকে এখন কি করতে হবে, ক্যাপ্টেন?' বলল রানা। 'দয়া করে বলবেন কি?'

ঝট্ করে ওর মুখের দিকে তাকাল জাহেদ নতুন সম্বোধন শুনে। নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করল লোকটা তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে কি না। কিন্তু মুখের ভাবে তেমন কিছু বোঝা গেল না। গম্ভীর গলায় বলল, 'করার মত কাজ আপনার একটাই, মুখ বুজে আমার নির্দেশ পালন করে যাওয়া, শেষ পর্যন্ত।'

'সেই শেষটা কোথায়, তাই তো জানতে চাইছি।'

'শেষটা...' থেমে গেল জাহেদ, বোধহয় ভাবল কি বলা যায়, তারপর বলল, 'শেষটা অন্তিম মুহূর্তে, স্বভাবতই।'

'আমি যখন এই মিশনেরই সদস্য, তখন নিশ্চয়ই আমার জানার অধিকার আছে মিশনটা কিসের, না কি বলেন?'

অন্যদিকে মুখ করে একটা সিগারেট ধরাল জাহেদ। 'হ্যাঁ, আছে।'

'এবার তাহলে দয়া করে বলুন, এ মিশনের উদ্দেশ্য কি?'

'কেন, জানেন না? ঢাকা থেকে কিছু শুনে আসেননি আপনি?'

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল রানার। থেমে থেমে বলল, 'এ ব্যাপারে আগেই বলেছি একবার, ভুলে গেছেন হয়তো। তাই আরেকবার...'

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' হাত তুলে রানাকে শান্ত করার চেষ্টা করল ক্যাপ্টেন। রানার মুখচোখের ভাব দেখে মনে হয়েছে আবার বোধহয় বেয়াড়া হয়ে উঠতে যাচ্ছে লোকটা এয়ারপোর্টের মত। 'এসব কথা এখন থাক। পরে এক সময় আলাপ করা যাবে।'

'দেরি হয়ে যেতে পারে তখন।'

'হয় হোক, ও নিয়ে আমি ভাবব।'

উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। চিন্তিত মনে পায়চারি শুরু করল ঘরের এ মাথা ও মাথা। দু হাত পিছনে বাঁধা, পা ফেলছে মেপে মেপে। তিনজোড়া চোখ চেয়ে আছে ওর দিকে সম্মোহিতের মত। এক সময় থামল রানা, ঘুরে সরাসরি জাহেদের চোখের দিকে তাকাল। 'শুনুন, ক্যাপ্টেন, আমাকে ধরে এনে মারাত্মক ব্লান্ডার করেছেন আপনি। আমি বারবার ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করার পরও ভুল শোধরাবার কোন চেষ্টাই করছেন না। যাকে ভেবে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছেন, এখনও বলছি, আমি সে লোক নই। বুঝতে চেষ্টা করুন।'

'হাসান,' বাধা দিল জাহেদ। 'আপনার ভাষণ বন্ধ করুন দয়া করে। আমি অন্য চিন্তা করছি। বললাম তো, পরে কথা হবে এ নিয়ে।'

কানে তুলল না রানা। বলে চলেছে, 'আমি যে কাজে এসেছি, তার তো বারোটা বাজালেনই, আপনার মিশনও শেষ পর্যন্ত না বরবাদ হয়। ভাবছি, আমার বদলে আসলে যার আসার কথা ছিল, সে কে? কোন্ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সেই লোক? এল না কেন? তার ওপর কতখানি নির্ভরশীল এ মিশন? এখনও সময় আছে, ক্যাপ্টেন, পরে হয়তো সময় পাবেন না। আপনি এসেছেন মিলিটারি মিশন নিয়ে, আমি এসেছি ডিপ্লোম্যাটিক মিশন নিয়ে। অথচ মাঝখান থেকে আমাকে নিয়ে অনর্থক টানাটানি শুরু করেছেন আপনি। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলে এখনও হয়তো...' থেমে গেল রানা, ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে ক্যাপ্টেন ঠোঁট বাঁকিয়ে।

'ডিপ্লোম্যাটিক মিশন?' ভুরু নাচাল সে। 'আচ্ছা!'

পকেটে হাত ঢোকাল রানা। পাসপোর্টটা দেখিয়ে এবার চমকে দেয়া যাক গাধাটার পিলে। কিন্তু ওর নিজেরই পিলে চমকে গেল ওটা খুঁজে না পেয়ে। এ পকেট ও পকেট হাতড়াতে লাগল রানা, কিন্তু নেই হয়ে গেছে পাসপোর্টটা। পরিষ্কার মনে আছে, ঢাকা এয়ারপোর্টের ফর্ম্যালিটিজ সেরে তাড়াহুড়োর মধ্যে কোটের ডান পকেটে রেখেছিল সে ওটা আর টিকেট একসাথে। গেল কোথায়? উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে গেল রানার, ঘেমে উঠল হাতের তালু। নিজেকে অসহায় মনে হলো ওর।

'কি খুঁজছেন?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন।

'আমার পাসপোর্ট আর টিকেটটা রেখেছিলাম এই পকেটে। কিন্তু...।'

'পাসপোর্ট! টিকেট? কি যা তা বলছেন? ওগুলো তো থাকারই কথা ছিল না! বিনা পাসপোর্ট, বিনা টিকেটের যাত্রী আমরা চারজনই। তার...'

'থামুন!' ধমকে উঠল রানা। 'আপনি কি জানেন?'

জসিমের দিকে ফিরে ঠোঁট টিপে হাসল ক্যাপ্টেন। নিচু গলায় বলল, 'ভয় পেয়েছে ব্যাটা। একেবারে ঘাবড়ে গেছে। সিভিলিয়ানদের নিয়ে এই হচ্ছে জ্বালা।'

'মিথ্যে বলেননি,' বলল রানা। কথাটা কানে গেছে আস্তে বলা হলেও। 'তবে আমার নিজের জন্যে নয়, আপনার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি আমি। আজ

আমি সিভিলিয়ান, ঠিকই, কিন্তু এক সময় আর্মিতে ছিলাম। রিটায়ার করেছি মেজর হয়ে। আপনার এই ভুলের…'

'ব্যস্, ব্যস্। মেজর জেনারেল হয়ে যে রিটায়ার করেননি, তাতেই আমি খুশি। জেনে রাখুন, হাসান, আমি ভুল করে থাকলে তার মাসুলটাও আমিই দেব। এ নিয়ে আপনাকে অনর্থক মাথা ঘামাতে হবে না।'

দরজায় মৃদু আওয়াজ উঠতে ঘুরে দাঁড়াল রানা। খোলা দোরগোড়ায় অপূর্ব সুন্দরী এক বার্মিজ যুবতী দাঁড়িয়ে। ছিমছাম, হালকা পাতলা গড়ন। বয়স খুব বেশি হলে উনিশ কি কুড়ি হবে। টাইট জিনসের সাথে অফ হোয়াইট ঢোলা শার্ট পরেছে ইন করে, পায়ে দেশী চপ্পল। কুচকুচে কালো চুলগুলো ঘাড়ের সামান্য নিচে ইউ শেপ করা। বাঁ হাতের কব্জিতে কালো ব্যান্ডে ছোট্ট সোনালী ঘড়ি—অনামিকায় দুধ সাদা হীরের আংটি।

ঈষৎ চাপা গাল আর স্বাভাবিকের তুলনায় সামান্য ছোট আকারের চোখ দুটো ছাড়া বোঝার কোন উপায়ই নেই এ মেয়ে বার্মিজ। কোমল স্নিগ্ধ হাসি ঠোঁটে ধরে ভেতরে এসে দাঁড়াল যুবতী। ওদের চারজনের মধ্যে চেহারা সুরতে রানাকেই দলনেতা ধরে নিল। এগিয়ে এসে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। পরিষ্কার ঝরঝরে ইংরেজিতে বলল, 'আমি জিনিয়া। আমাদের সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে হাজারো ঝুঁকি আছে জেনেও এতপথ ছুটে এসেছেন, সে জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ সরকারের এই সহযোগিতার কথা আজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করব আমরা।'

জিনিয়ার হাত ঝাঁকিয়ে দিল রানা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। তারপর নিজেই তার ভুল ভাঙিয়ে দিল। 'আমি না, ম্যাডাম। মিশন লীডার ইনি, ক্যাপ্টেন জাহেদ।'

'ও, আয়্যাম সো সরি,' গাল দুটো সামান্য রাঙা হয়ে উঠল জিনিয়ার। তাড়াতাড়ি জাহেদের সঙ্গে হাত মেলাল সে। 'রিয়েলি সরি, ক্যাপ্টেন।'

'দ্যাটস অলরাইট, ম্যাম।'

রানার দিকে ফিরল আবার যুবতী। ততক্ষণে বসে পড়েছে ও আগের জায়গায়। চোখাচোখি হতে লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল, 'উনি…'

'হাসান,' বলল ক্যাপ্টেন। 'মিস্টার হাসান। মিশনের সদস্য। আর এ হচ্ছে জসিম,' সবশেষে আঙুল তুলে গরিলাকে দেখাল। 'ও গোরা।'

'চলুন, পাশের রুমে গিয়ে আলোচনাটা সেরে ফেলি,' জাহেদকে বলল জিনিয়া। দু পা এগিয়ে কি মনে করে থেমে দাঁড়াল, রানার দিকে ফিরে বলল, 'আপনারা বিশ্রাম করুন। সোলায়মান, এঁদের কফি দাও।'

দরজার বাইরে থেকে প্রায় কুর্নিশের ভঙ্গিতে জিনিয়াকে সালাম করল তালগাছ, 'জ্বি।'

পিছন থেকে প্রায় নিঃশব্দে দুটো ট্রুপ ক্যারিয়ার এসে দাঁড়াল ফোক্সওয়াগেনটার পাশে। সামনের ক্যারিয়ারের দরজা খুলে প্রথমে নেমে এল কর্নেল উ ক মঙ। এরপর নামল এক মেজর। মাইক্রোবাসের ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল তারা। রাস্তার ওপাশের একটা আলোবিহীন ইলেকট্রিক পোস্টের গোড়ায়

বসে ছিল লুঙ্গি পরা চাষাভুষো ধরনের এক লোক, ট্রাক দুটো দেখে উঠে এল সে। সামনে এসে স্যালুট করল কর্নেলকে।

'এই বাড়িতেই ঢুকেছে তো?' থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

'জ্বি, কর্নেল, স্যার!' মুখটা সামান্য পিছিয়ে নিতে বাধ্য হলো লোকটা। ভক্ ভক্ করে কাঁচা রসুনের গন্ধ বেরুচ্ছে কর্নেলের মুখ দিয়ে, পেটের নাড়ি গুলিয়ে উঠেছে তার। ঠেলে উঠে আসা টক্ টক্ পানিটুকু জোর করে যথাস্থানে ফেরত পাঠাল সে।

'জানতাম,' আপনমনে প্রকাণ্ড মাথা দোলাতে লাগল কর্নেল মঙ। 'আমি জানতাম এখানেই আসবে ওরা। বিদেশ থেকে ফিরে এই বাড়িতেই আড্ডা গেড়েছিল ছুঁড়িটা। কিন্তু কদিন আগে সেই যে গায়েব হলো হঠাৎ করে, তারপর থেকে আর পাত্তাই নেই কোন। ওকে যদি ধরতে পারি তাহলেই কেল্লা ফতে, বুঝলে, মেজর?'

'জ্বি, কর্নেল।'

'ঠিক আছে, ঘিরে ফেলো বাড়ি।'

'রাইট, স্যার।'

মেজরের নির্দেশে দুই প্লাটুন সৈন্য ঘেরাও করে ফেলল অন্ধকার বাড়িটা। মুখের সামনে একটা মেগাফোন ধরে চ্যাঁচাতে লাগল মেজর, 'সারেন্ডার! বাড়ির ভেতরে কে কে আছ, বেরিয়ে এসো সামনে। কেউ পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি ছোঁড়া হবে, সাবধান! পুরো বাড়ি ঘিরে ফেলেছি আমরা, বেরিয়ে এসো।'

একটু থামল মেজর। কিন্তু ভেতর থেকে কারও বেরিয়ে আসার কোন লক্ষণ নেই দেখে আবার চ্যাঁচাতে শুরু করল, 'পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হলো তোমাদের বেরিয়ে আসার জন্যে। এরমধ্যে সারেন্ডার না করলে আর্মি ঢুকবে ভেতরে। ভাল চাও তো বেরিয়ে এসো সবাই।'

এবারও কাজ হলো না দেখে ভীষণ রেগে গেল কর্নেল মঙ। মেজরকে ভেতরে ঢোকার নির্দেশ দিল সে। টপাটপ দেয়াল টপকাল দুই প্লাটুন সৈন্য, তালা ভেঙে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে। পুরো বাড়ি, আঙিনা, ছাত, কার্নিস তন্ন তন্ন করে সার্চ করল তারা দশ মিনিট ধরে। কিন্তু পাওয়া গেল না কাউকেই। ইঁদুর আর তেলাপোকা ছাড়া আর কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই প্রকাণ্ড বাড়িটায়।

হতাশায় কালো মুখটা আরও কালো হয়ে উঠল কর্নেলের। প্রচণ্ড রাগে রক্ত চড়ে গেছে মাথায়। 'কোথায় গেল?' ওয়াচার লোকটার দিকে ফিরে খেঁকিয়ে উঠল সে। 'তুমি না বললে এই বাড়িতে ঢুকেছে ওরা? কোথায় গেল তাহলে? নাকি ঘুমাচ্ছিলে পড়ে পড়ে? এতগুলো মানুষ পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল, দেখতে পাওনি?'

'জ্বি না, কর্নেল, স্যার!' থরথর করে কাঁপছে লোকটা। 'আমি ঘুমাইনি, স্যার। জেগেই ছিলাম। ওরা…ওরা তাহলে পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে, কর্নেল। অন্ধকারের জন্যে দেখতে পাইনি।'

লোকটার জানা আছে রেগে গেলে পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যায় কর্নেল। আর যার ওপর তার রাগ হয়, সে যদি তখন একচুলও নড়াচড়া করে, চোখের পলকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে হিংস্র জানোয়ারের মত। তাই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেচারা। এসব ক্ষেত্রে কর্নেলের আক্রোশের হাত থেকে বাঁচার একটাই উপায় আছে, তা হলো, হোক আর না হোক, ভুল হয়েছে কি অন্যায় হয়েছে, তা স্বীকার করে নেয়া। তাহলেই রাগ পড়ে যাবে কর্নেলের। ঠোঁট একটুও না নাড়িয়ে তাই বলল সে, 'ভুল হয়ে গেছে, স্যার। আমার বোধহয় পিছনদিকে খেয়াল রাখা উচিত ছিল।'

যথারীতি রাগ পানি হয়ে গেল মঙের। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'হ্যাঁ, অন্ধকার একটু বেশিই মনে হচ্ছে এদিকটায়। তুমি আর তার কি করবে! যেখানে থাকতে বলা হয়েছে সেখানেই তো ছিলে।' বাড়িটার দিকে চেয়ে থাকল সে কিছুক্ষণ আনমনে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। পালিয়ে যাবে কতদূর? দেখব তোমাদের দৌড়।'

চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল মঙ। 'চলো, মেজর! আর তুমি এখানেই থাকো,' ওয়াচার লোকটাকে বলল সে। 'সন্দেহজনক কিছু দেখলে সাথে সাথে জানাবে আমাকে। আমি অফিসেই আছি।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল জাহেদ আর্মি রেইডের খবর শুনে। 'বলেন কি? কি করে টের পেল ওরা?'

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, ক্যাপ্টেন।' সম্পূর্ণ ধীর, স্থির রয়েছে জিনিয়া। 'কর্নেল মঙকে ভুলেও কখনও আন্ডারএস্টিমেট করেননি চিতা। যার জন্যে আজও মুক্ত আছি আমরা, ধরা পড়িনি। ওই বাড়িটা আমাদের এক ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধুর, চাচা ডাকি আমি তাঁকে। তিনি অবশ্য দেশে নেই এখন। ব্যাপারটা জানে কর্নেলও, তাই ওই বাড়ির ওপর নজর ছিল তার। বিদেশ থেকে ফিরে এবার ওই বাড়িতেই উঠেছিলাম আমি। কিন্তু সামরিক জান্তার কোপদৃষ্টি পড়েছে তাঁর ওপর, টের পাওয়ামাত্র সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন চিতা। তখনই আমাকে সরে পড়তে বলেছিলেন। সেই থেকে গত এক সপ্তা ধরে এই বাড়িতে নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রেখেছি আমি। চিতা আত্মগোপন করেছেন, ব্যাপারটা টের পাওয়ামাত্র আমার খোঁজে ওই বাড়িতে হানা দেবে কর্নেল মঙ, বুঝতে পেরে আগেই আমাকে গা ঢাকা দিতে বলেছিলেন তিনি। আমাকে কব্জা করতে পারলেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবেন চিতা, কর্নেল তা ভালই জানে। আপনার জন্যে একটা খবর আছে, আপনার বসের সাথে আজ লেফটেন্যান্ট রাশেদের যে কথা হয়েছে টেলিফোনে, তা সম্ভবত বিশ্বাস করেনি কর্নেল। অবশ্য বিশ্বাস করবে, তা আশাও করিনি আমরা। সে যাক্, এয়ারপোর্টে একজন ওয়াচার পাঠিয়েছিল সে।'

ভুরু কুঁচকে গেল জাহেদের। 'জানলেন কি করে?'

'মঙের সম্ভাব্য ওয়াচারকে মার্ক করার জন্যে আমরাও দুজন কাউন্টার ওয়াচার পাঠিয়েছিলাম,' হাসল জিনিয়া। 'একটু আগে ফিরে এসেছে তারা।

বলেছে, লোকটাকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসা হয়েছে ওখানে।'

'কপালে দেখছি ভালই খারাবি আছে,' গম্ভীর হয়ে গেল ক্যাপ্টেন জাহেদ।

পর পর দুকাপ কফি খেয়ে নিজেকে বেশ চাঙ্গা মনে হচ্ছে মাসুদ রানার। অন্ধকারে চুপচাপ সিগারেট টানছে ও। পাশেই গোরা বসে আছে। জসিমকে একটু আগে রাশেদ এসে ডেকে নিয়ে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গেছে রাশেদ। রানা কারণ জানতে চাওয়ায় বলেছে, 'ঝামেলার আশঙ্কা করছি আমরা।'

'কিসের?'

'আর্মি ঘুরঘুর করছে। মনে হয় আপনাদের অনুপ্রবেশের ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছে ওরা কোনভাবে। অবশ্য ঘাবড়াবার কিছু নেই। তেমন কিছু হলে নির্বিঘ্নে সরে পড়তে পারব আমরা।'

গরিলার নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। লোকটাকে ওর বডিগার্ড করা হয়েছে নাকি? আঠার মত সারাক্ষণ সেঁটে রয়েছে ব্যাটা গায়ের সাথে। মুচকে হাসল রানা। সিগারেটের মাথার আগুনের দিকে চেয়ে আছে আনমনে—ভাবছে। গরিলাকে কাবু করা কোন ব্যাপারই নয়। ওয়ালথারটা বেহাত হয়নি এখনও, আছে ওটা জায়গামতই। ইচ্ছে করলেই ওটা দেখিয়ে ব্যাটার পিলে খাঁচাছাড়া করে দিতে পারে রানা, হাত-পা বেঁধে ওকে ফেলে রেখে বেরিয়ে যেতে পারে কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই।

এইখানটায় চিন্তায় ছেদ পড়ল ওর। জাহেদ ওকে সার্চ করেনি, করার কথা চিন্তাও করেনি হয়তো। তার মানে লোকটা ধরেই নিয়েছে রানা তার মিশনের সদস্য। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, আরও একজনের সত্যি সত্যি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল দলে, শেষ সময়ে। এমন কেউ, যাকে কখনও সামনাসামনি দেখেনি ক্যাপ্টেন, হয়তো লোকটার চেহারা আর দৈহিক বর্ণনা ছাড়া জানেই না আর কিছু।

যে কোন কারণেই হোক, শেষ পর্যন্ত আসেনি সেই লোক। ফ্লাইট মিস্ করেছে। এবং ভুল করে জাহেদ রানাকেই সেই লোক ভেবে নিয়েছে। কেন? সেই লোকের সাথে চেহারা-সুরত আর দৈহিক দিক থেকে মিল আছে মাসুদ রানার? এবং তার নামও হাসান? মাথা ঝাঁকাল রানা। মোদ্দা কথা দাঁড়াল, বস্তাপচা ঢাকাই ছবির অসহায় দর্শকের মত পরপর এতগুলো দৈব-সংযোগ হজম করতে হবে ওকে। হায় খোদা! এমন বিপদেও পড়ে মানুষ!

কিন্তু ব্যাপারটা যে সেরকমই ঘটেছে, এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ রইল না ওর মনে। নইলে বারবার করে ভুলটা ধরিয়ে দেয়ার পরও কেন বুঝতে চেষ্টা করছে না জাহেদ? কেন একটা কথাও কানে তুলছে না?

নাকি কোন ব্লাইন্ড অপারেশন এটা? অকুস্থলে না পৌছানো পর্যন্ত বোঝা যাবে না রানার সাথে এদের কোন সংশ্রব আছে কি না? কিন্তু তাই যদি হয়,

তাহলে আরেকজনের নেতৃত্বে কেন? মাসুদ রানা কি ফুরিয়ে গেছে? নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা কি শেষ হয়ে গেছে ওর যে সে থাকতে আরেকজনকে দেয়া হবে মিশনের দায়িত্ব? নাহ্, হচ্ছে না। মনের মধ্যে কি কেন কিন্তু ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন, হাজারো সন্দেহ। হিসেব কিছুই মিলছে না।

ধুত্তোর! চিন্তার লাগাম টেনে ধরল রানা, এভাবে হবে না। তবে গড়বড় যে একটা হয়ে গেছে কোথাও, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং সেটা হয়েছে ক্যাপ্টেন জাহেদের তরফ থেকে, ওর তরফ থেকে নয়। ওদের এই যোগাযোগ দৈব-সংযোগ না হয়েই যায় না। যাক্‌গে, যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন আর ও নিয়ে মাথা গরম করে লাভ নেই। এখন বরং খুঁজেপেতে একটা পথ বের করতে হবে, কি করে এদের হাত থেকে উদ্ধার করা যায় নিজেকে। কি করে পৌঁছানো যায় দূতাবাসে।

প্রথম কাজ গোরাকে কাবু করে বেরিয়ে যাওয়া। কিন্তু তারপর? তারপর কিভাবে দূতাবাসে পৌঁছবে ও? প্রথম সমস্যা, এ শহরের পথঘাট চেনে না রানা। এদের ভাষাও জানে না যে জিজ্ঞেস করে পথের হদিস বের করে নেবে। দ্বিতীয় সমস্যা, প্রশাসন যদি সত্যিই টের পেয়ে গিয়ে থাকে যে বিদেশীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে রেঙ্গুনে, তাহলে নিশ্চয়ই বহুগুণ সতর্ক হয়ে আছে। রাত বিরেতে বিদেশ বিভূঁইয়ে তাদের হাতে ধরা পড়াটা মোটেই প্রীতিকর হবে না।

তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা, ওর পাসপোর্ট-টিকেট দুটোই হারিয়ে গেছে। এখন নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে থানায় ডাইরি করতে হবে ওকে, তারপর বিকল্প ট্রাভেল ডকুমেন্টের জন্যে যেতে হবে নিজেদের দূতাবাসে। কিন্তু পরেরটা সম্ভব হলেও প্রথমটা এ পরিস্থিতিতে মোটেই সম্ভব নয়। তা করতে গেলে ধরা খেতে হবে নির্ঘাত। এদেশে ঢুকলে কি করে—এই প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারবে না কর্তৃপক্ষকে।

আবার সেই অনুভূতিটা ফিরে এল, কি একটা যেন মনে পড়ব পড়ব করছে, অথচ মনে পড়ছে না শেষ সময়ে। কি সেটা? কি?

দরজা খুলে কামরায় ঢুকল কেউ। ঘুরে তাকাল রানা। পরমুহূর্তে জ্বলে উঠল ভেতরের উজ্জ্বল বাতি। হালকা কিছু নাশতা আর কফি নিয়ে এসেছে সোলায়মান।

'ওরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ক্যাপ্টেন জাহেদ?'

ট্রে ওর সামনের টেবিলের ওপর রাখল লোকটা। বলল, 'বাইরে গেছে।'

'কখন আসবে?'

'আমাকে বলে যায়নি।'

'আমরা এখন কি করব তাহলে? বসেই কাটাব রাতটা?'

'তাও বলতে পারি না,' দুহাত তুলে প্রায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল তালগাছ।

'ক্যাপ্টেন কিছুই বলে যায়নি?' সোজা হয়ে বসল রানা।

'হ্যাঁ, আপনার সাথে গল্প গুজব করতে বলে গেছে আমাকে।'

'আর কে কে গেছে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে?'
'লেফটেন্যান্ট, জসিম আর আমাদের দুজন লোক।'
'লেফটেন্যান্ট! সে আবার কে?'
'মিস্টার রাশেদ।'
জিনিয়া এসে ঢুকল এ সময় ঘরে। রানা লক্ষ করল, এখন আর চপ্পল নেই ওর পায়ে, একজোড়া স্পোর্টস কেড্‌স পরেছে। রানার মুখোমুখি বসে পড়ল জিনিয়া। পায়ের ওপর পা তুলে দিল।
'এসব কি হচ্ছে এখানে, জানতে পারি?' বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'ধরে এনে আমাকে বসিয়ে রেখে কোথায় গেল ক্যাপ্টেন জাহেদ?'
থুতনি দিয়ে ট্রে দেখাল ওকে জিনিয়া। 'আগে কফিটা খেয়ে নিন। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। সোলায়মান, তুমি বাইরে যাও। খেয়াল রাখো চারদিক।'
বেরিয়ে গেল লোকটা ওকে কুর্নিশ করে। রানার দিকে ফিরল জিনিয়া, 'কই, নিলেন না কফি? আপনিও নিন, মিস্টার গোরা।'
রানা শুধু কফির কাপটা তুলে নিল। গরিলা ঝাঁপিয়ে পড়ল নাশতার প্লেটের ওপর।
'ক্যাপ্টেন জাহেদ রওনা হয়ে গেছেন। আমরাও যাব একটু পর,' বলল মেয়েটা।
'কোথায় গেছে?'
'থারাওয়াদ্দি।'
এ ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করল না রানা। বুঝতে পেরেছে, যে কাজে এদেশে আসা এই মিশনের, শুরু হয়ে গেছে সেটা। জানা আছে ওর থারাওয়াদ্দি ছোট্ট একটা শহর, রেঙ্গুনের উত্তরে।
একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?'
'কেন?' সুন্দর চিকন ভুরুজোড়া ভাঁজ খেয়ে সামান্য ওপরে উঠে গেল জিনিয়ার। 'জাহেদ বলেননি আপনাকে?'
'নাহ্।'
ইতস্তত করতে লাগল মেয়েটা। 'তাহলে...তাহলে বরং ও প্রসঙ্গ এখন থাক, মিস্টার হাসান। এসেছেন যখন, সবই জানতে পারবেন আস্তে-ধীরে।'
'কি ঘটতে চলেছে, কিসের জন্যে আমরা এখানে এলাম, কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমি।'
'সে কি!' এবার সত্যি সত্যি আশ্চর্য হলো জিনিয়া। 'কেন রেঙ্গুন এসেছেন, তা-ও জানেন না আপনি?'
'তা জানি,' ঝাঁঝের সাথে বলল রানা। 'আমি জানি আমি কেন এসেছি। কিন্তু ক্যাপ্টেন জাহেদ কি কাজে এসেছে, তা জানি না।'
'আপনি সিরিয়াস, মিস্টার হাসান?' দু চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে মেয়েটার। 'ক্যাপ্টেনের মিশন সম্পর্কে কিছুই জানেন না আপনি?'
'ড্যাম সিরিয়াস, জানি না। প্লেন থেকে জোর করে নামিয়ে এনেছে এরা আমাকে। বলছে, আমি নাকি এদের মিশনের সদস্য। অথচ এদের কাউকেই

আমি চিনি না, জীবনে দেখিওনি কোনদিন।'

'এক মিনিট। বলছেন, আপনি কেন এসেছেন এদেশে, তা আপনি জানেন। আবার বলছেন, এদের মিশন সম্পর্কে আপনার কোন ধারণাই নেই?'

'ঠিক তাই। আমি এসেছি আমার কাজে। এরা এদের কাজে। জাহেদ আসলে জানে না, আমি কেন এসেছি রেঙ্গুনে। অথচ দাবি করছে জানে। লোকটাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না বাংলাদেশ থেকে আমরা এসেছি ঠিকই, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। শুনলই না সে। জোর করে ধরে এনেছে আমাকে। এই দেখুন, এই গরিলাটাকে রেখে গেছে আমাকে পাহারা দেয়ার জন্যে।'

কথা ভুলে গেছে জিনিয়া। প্রায় হাঁ করে চেয়ে আছে রানার মুখের দিকে। ওদিকে রানার ইংরেজি সবটা বুঝতে না পারলেও 'গরিলা' ও 'গার্ড' শব্দ দুটো ঠিকই বুঝল গোরা। মুখ খুলল সে, 'কিন্তু ক্যাপ্টেন...'

'গুলি মারো তোমরা ক্যাপ্টেনের,' থামিয়ে দিল রানা ওকে। 'সবাইকে একসাথে ডোবানোর ব্যবস্থা করেছে লোকটা। আমার সব প্ল্যান...' আচমকা থেমে গেল ও। খেয়াল হলো এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঢাকায় খবর হয়ে গেছে যে রোটর নিয়ে মাসুদ রানা পৌঁছায়নি রেঙ্গুন। হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন রাহাত খান, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন ভেতরে ভেতরে। ও যে প্লেনে উঠেছে, ঢাকা এয়ারপোর্টে খোঁজ নিলেই জানা যাবে। ওর গাড়িটাও আছে লাউঞ্জের সামনে। গিলটি মিয়া এসে নিয়ে যাবে।

ওর সঙ্গে অত্যাধুনিক ক্রিপটোসাইফার মেশিনের একটা পার্ট রয়েছে, ওটা নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারে না রানা। হয়তো হুলস্থুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে ঢাকায় এই নিয়ে। রাহাত খান, সোহেল হয়তো...। আর ভাবতে পারছে না রানা। ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথার ভেতরটা।

কি মনে হতে উঠে দাঁড়াল জিনিয়া। 'আপনারা বসুন, আমি একটু আসছি,' বেরিয়ে গেল সে কামরা ছেড়ে।

ওর ভিড়িয়ে রেখে যাওয়া দরজার দিকে চেয়ে আছে রানা আনমনে। দূতাবাসে যদি একটা টেলিফোনও অন্তত করা যেত...টেলিফোন! তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা, এতক্ষণ মনে পড়েনি কেন কথাটা, ভেবে নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠল। 'আমি একটা টেলিফোন করে আসি।'

'মানে!' চোখ পিটপিট করল গরিলা। 'কোথায়?'

'দূতাবাসে।'

'উঁহুঁ। সম্ভব না।'

পাত্তাই দিল না রানা লোকটাকে। বাঁ হাতে ব্যাগটা ঝুলিয়ে পা বাড়াল বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল গোরা, একলাফে দরজার সামনে গিয়ে ওর পথ আগলে দাঁড়াল। মুখে চাপা হাসি, যেন দেখতে চাইছে কি করে বেরোয় ও।

দৃঢ়, মাপা পায়ে লোকটার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'পথ ছাড়ো।'

মাথা নাড়ল গরিলা। 'বললাম না, ফোন করা যাবে না?'

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন রানার দেহে, ডান হাতটা পুরো খোলা রেখে চড়াৎ করে প্রচণ্ড এক চড় কষাল ও লোকটার গালে। ঠকাশ করে মাথাটা ঠুকে গেল গোরার দরজার চৌকাঠে। অবাক হলো রানা লোকটার সহ্য শক্তি দেখে। চড়ের চোটে পানি এসে গেছে চোখে, অথচ নিজেকে সামলে নিয়েছে সে মুহূর্তে। পিছিয়ে গেল রানা।

'ঘোঁৎ' করে একটা শব্দ করল গোরা মুখ দিয়ে, ইচ্ছে করে কি আপনাআপনি বেরুল শব্দটা বোঝা গেল না। মাথা নিচু করে বুলডোজারের মত ছুটে এল সে রানার দিকে। এত দ্রুত রি-অ্যাক্ট করবে ও, বুঝতে পারেনি রানা, হাজার চেষ্টা করেও লোকটার সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলো ও।

ছুটে এসে দড়াম করে গুঁতো মারল গোরা রানার তলপেটের নিচের অংশের বোন জয়েন্টে। নিজের অজান্তেই একটা আর্ত গোঙানি বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে, ব্যাগ ছুটে গেছে হাত থেকে, উড়ে গিয়ে ওপাশের সোফার ওপর পড়ল ওটা। রানাকে ছাড়ল না গোরা, অ্যারিনার মধ্যে ম্যাটাডরকে বাগে পেয়েছে যেন হিংস্র আন্দালুসিয়ান ষাঁড়, দুহাতে ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরে গুঁতো মারতে মারতে পিছনদিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। সেই সাথে বুনো জন্তুর মত আওয়াজ করছে গলা দিয়ে।

পাঁচ ছ'পা পিছিয়েই কার্পেটে পা বেধে গেল রানার, দড়াম করে আছড়ে পড়ল ও চিত হয়ে। গোরা পড়ল ওর ওপর। কার্পেট থাকলেও মাথাটা ভীষণ জোরে মেঝেতে ঠুকে গেল রানার। প্রচণ্ড ব্যথায় আঁধার হয়ে এল সবকিছু। ওদিকে একটা হাত ঝট্ করে মুক্ত করে নিয়েছে গোরা ওর দেহের নিচ থেকে, পরমুহূর্তে ওর চড়টা ফিরিয়ে দিল সে রানাকে। একই ভঙ্গিতে, প্রচণ্ড শক্তিতে মারল গোরা। ঠোঁট কেটে গেল রানার, দরদর করে রক্ত বেরুচ্ছে।

অন্ধের মত বাঁ হাতটা তুলল রানা, খপ্ করে গোরার থুতনি আঁকড়ে ধরল কাঁকড়ার মত। ঠ্যালা দিয়ে মুখটা সামান্য ওপরে তুলেই ডানহাতের আঙুলগুলো খাড়া রেখে ঝটাং করে মেরে বসল গরিলার নাকের নিচের নরম হাড়ে।

বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠেই দু হাতে মুখ ঢাকল গোরা। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে টকটকে লাল রক্ত। ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে বুকের ওপর থেকে নামিয়ে দিল রানা, গড়িয়ে সরে যেতে চাইল নিরাপদ দূরত্বে। কিন্তু কাৎ হয়ে পড়েই বিদ্যুৎবেগে বাঁ পা চালাল গোরা ওই অবস্থাতেই, ভারী আর্মি বুটের হিল ঠাস্ করে আছড়ে পড়ল এসে রানার কপালের পাশে। পরমুহূর্তে বাঁ কানের ওপর গোরার ওজনদার এক ঘুসি খেল রানা।

চোখের সামনে ঘরদোর সব দুলছে, তবু হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল রানা বহুকষ্টে। ঘন ঘন মাথা ঝাড়া দিয়ে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে নিল। ওদিকে গোরাও উঠে পড়েছে। দেহ কোমরের কাছে সামান্য ভাঁজ করে রানার দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়েছে সে—দুহাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে কারাতে এক্সপার্টের

মত। ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে তার, রক্তে ভেসে যাচ্ছে থুত্‌নি, বুক। দু চোখ ছোট হয়ে এসেছে তার, এখন আর আগের মত অবজ্ঞা নেই চাউনিতে। কোপটা খেয়ে বুঝে গেছে, প্রতিপক্ষও যা-তা লোক নয়, একটু অসাবধান হলেই খারাবি আছে কপালে।

গোল হয়ে রানার চারপাশে ঘুরল কিছুক্ষণ লোকটা। এতে সুবিধেই হলো ওর, নিজেকে পুরোপুরি তৈরি করে নিল রানা এই সুযোগে। চট্‌ করে বাঁ পা ঝাড়িয়ে একটা ফলস স্টেপ নিল ও, এবং বিদ্যুৎবেগে পিছিয়ে এল সাথে সাথে। এতটা মোটেই আশা করেনি গরিলা, ওকে এগোতে দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে সামনে, কিন্তু রানা ততক্ষণে ফিরে গেছে আগের অবস্থানে।

বাঁ হাতে দাও চালাবার মত করে কোপ ছুঁড়েছিল গোরা ওর ডান কাঁধ লক্ষ্য করে, কিন্তু অল্প কয়েক ইঞ্চির জন্যে মিস্‌ হয়ে গেল ভয়ঙ্কর মারটা, ফলে ভারসাম্য হারিয়ে এক পা বেশি এগিয়ে এল সে। গায়ের ঝাল মিটিয়ে মারল এবার রানা, দেহের সব শক্তি এক করে দড়াম করে নক্‌ আউট পাঞ্চ কষল লোকটার উন্মুক্ত বাঁ চোয়ালে। গুঙিয়ে উঠল গোরা, এলোমেলো পদক্ষেপে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। ওকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ দিল না রানা, এক পা এগিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল ও, বাঁ পা সোজা রেখে ভয়ঙ্কর একটা কারাতে সাইড কিক্‌ মেরে বসল তার ভাঙা নাকের ওপর।

উড়ে গিয়ে পিছনের দেয়ালে আছড়ে পড়ল গরিলা, মাথার পিছনটা ঠকাশ্‌ করে বাড়ি খেল দেয়ালের গায়ে। মনে হলো পুরো বাড়িটা থর থর করে কেঁপে উঠল যেন। বসে পড়ল গোরা। বাঁ হাতে চেপে ধরে আছে নাকমুখ। চেহারায় পরিষ্কার আতঙ্ক।

আবারও এগোতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় বিস্ফোরিত হলো ভিড়িয়ে রাখা দরজাটা। ঘরে ঢুকেছে কেউ। ফিরে চাইল রানা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তালগাছ। চোখ কপালে তুলে চেয়ে আছে ওদের দিকে। তার হাতে একটা অ্যাস্ট্রা দেখতে পেল রানা, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ধরে আছে। রানাকে নড়ে উঠতে দেখে বাজখাঁই গলায় বলে উঠল সে, 'ডোন্ট মুভ!'

শুনেও শুনল না রানা। ঘুরে দাঁড়াল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওর চাঁদির ওপর আছড়ে পড়ল গোরার ওয়েবলি অ্যান্ড স্কটের ভারী বাঁট। চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘরটা, জ্ঞান হারিয়ে ধড়াস করে আছড়ে পড়ল মাসুদ রানা।

ঘণ্টাখানেক আগের ঘটনা।

টেলিফোনে কথা বলছে কর্নেল উ ক মঙ। কপাল ভুরু কুঁচকে কদাকার হয়ে আছে চেহারাটা। 'মারা গেছে?' বলল সে। 'কোথায়, বুকে লেগেছে গুলি? আচ্ছা…কজন? চার পাঁচজন? ট্রাকটার নাম্বার দেখতে পেয়েছে ও? গুড, নাম্বারটা বলুন।'

সামনের ডেস্ক ক্যালেন্ডারে খস খস করে লিখল সে নাম্বারটা। 'ঠিক আছে, দেখছি আমি। কি?…না, ব্যাপারটা একদম চেপে যান। সেলাই করে

ফেলুন মুখ। যা করার আমি করছি এদিকে। কোন্‌দিকে চলেছে ওরা, আন্দাজ করতে পারছি আমি। অ্যাঁ?… সে আমি বুঝব। আর কোন প্রয়োজন যদি হয়, সাথে সাথে ফোন করবেন আমাকে। অফিসেই আছি আমি।'

দড়াম করে রিসিভার নামিয়ে রাখল কর্নেল। সামনের দেয়ালে ঝোলানো সিটিজেন কোয়ার্টজ্‌ ঘড়িটার সেকেন্ডের কাঁটার দিকে চেয়ে থাকল আনমনে। লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে ওটা, সেই সাথে তার চোখের মণিও লাফাচ্ছে। ঝাড়া দু মিনিট অনড় বসে থাকল লোকটা, তারপর নড়ল। বাঘের মত থাবা দিয়ে তুলে নিল রিসিভারটা। ফাইভ ডিজিটের একটা নাম্বার ঘুরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল অধৈর্য চিত্তে।

ওপাশ থেকে সাড়া পেতেই উত্তেজিত গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'মেজর?'

'ইয়েস, কর্নেল।'

'শোনো…'

প্রায় জনশূন্য সড়ক দিয়ে নিক্ষিপ্ত তীরের মত ছুটে চলেছে একটা বর্মী সামরিক জীপ, ল্যান্ড রোভার। চালাচ্ছে আবদুর রহমান। তার টিউনিক বলছে সে একজন সার্জেন্ট। পাশে গম্ভীর মুখে বসা লেফটেন্যান্ট রাশেদ। অবশ্য এ মুহূর্তে মেজর সে—মেজর থান্ট।

পিছনের আসনে বসেছে ক্যাপ্টেন জাহেদ আর জসিম। এরা দুজনই লেফটেন্যান্ট। জসিমের পায়ের কাছে সেই রাকস্যাকটা দেখা যাচ্ছে। হু হু বাতাসে দু চোখ আপনাআপনি বুজে আসছে পিছনের দুজনের। কিন্তু রাশেদ বসে আছে শিরদাঁড়া খাড়া করে। পলকহীন চোখে চেয়ে আছে সামনের দিকে।

আরও দু মাইলের মত এগিয়ে বাঁয়ে ঘুরল ল্যান্ড রোভার, উঠে এল রেঙ্গুন-থারাওয়াদ্দি হাইওয়েতে। প্রায় সাথে সাথে গতি কমাতে হলো আবদুর রহমানকে, সামনে রাস্তার পাশে কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো ফাইভ হানড্রেড সি সি প্রকাণ্ড মোটর সাইকেল। তার সামনে চারজন খাকি পোশাক—পুলিস!

'গাড়ি রাখো,' চাপা গলায় আবদুর রহমানকে বলল রাশেদ। 'ক্যাপ্টেন,' মুখটা সামান্য ডানে ঘুরিয়ে পিছনের আরোহীদের উদ্দেশে বলল, 'ক্যাপ টেনে নামিয়ে দিন যতটা পারেন। ঘুমের ভান করুন।'

হাত তুলল একজন পুলিস অফিসার। ঠিক তার সামনেই ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল রহমান। এগিয়ে এল অফিসার। একটু ঝুঁকে রাশেদের মুখটা দেখল ভাল করে, পরক্ষণেই সোজা হয়ে গেল তার কাঁধের ব্যাজের ওপর চোখ যেতে। খটাশ্‌ করে স্যালুট করল লোকটা। তার দেখাদেখি অন্যরাও।

'কি ব্যাপার, আপনারা?' জানালা দিয়ে মুখ বের করে কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল লেফটেন্যান্ট।

'জ্বি, মেজর,' আমতা আমতা করতে লাগল অফিসার। 'গোপন সূত্রে

খবর পেয়েছি কিছু চোরাই মাল পাচার হবে আজ রেঙ্গুন থেকে। এই পথেই যায় কি না, ব্যাপারটা চেক করার জন্যে···'

'এই গাড়িটা কি চোরাই মাল পাচারের কাজে ব্যবহার হতে পারে বলে ভাবছেন?'

'না না,' যেন লজ্জা পেয়েছে লোকটা, এমনভাবে মাথা চুলকাতে লাগল। 'কি যে বলেন, স্যার। হেঁ হেঁ!'

'তো!'

'এমনিই, স্যার, মানে রুটিন চেক আর কি!'

ওরা যখন কথা বলছে, সেই ফাঁকে গাড়িটার পিছনে রাস্তার ধারের একটা ঝোপ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি। গাড়িটার কাছে এসে বসল, হাত বাড়িয়ে কি যেন একটু করল। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপর যেমন এসেছিল, তেমনিভাবে পিছিয়ে গিয়ে আগের জায়গায় গা ঢাকা দিল ছায়ামূর্তি।

'আমার গাড়ি চেক করবেন?' রাশেদের গলায় প্রচ্ছন্ন হুমকি।

জিভ কাটল অফিসার। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেয়েছে পিছিয়ে যাচ্ছে ছায়ামূর্তিটা। 'কেন লজ্জা দিচ্ছেন, স্যার! তা স্যার, আপনার নামটা যদি···।'

'থান্ট, মেজর থান্ট। আর্মি ইন্টেলিজেন্স।'

আবার স্যালুট করল সবাই। 'কিছু মনে করবেন না, মেজর। আপনি যেতে পারেন।'

পাশ ফিরল রাশেদ। 'চালাও, সার্জেন্ট।'

একরাশ ধুলো উড়িয়ে ভোঁ করে ছুট লাগাল ল্যান্ড রোভার।

নিজের অফিস কামরায় পায়চারি করছে কর্নেল মঙ। দু হাত পিছনে বাঁধা, বারবার মুঠো করছে আর খুলছে। থমথমে হয়ে আছে মুখটা। বেশ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে তাকে। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার দিকের দেয়ালজোড়া খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে কখনও, ঝুঁকে পড়ে নজর বোলাচ্ছে নিচের মসৃণ প্রশস্ত সুলে প্যাগোডা রোডের এ মাথা ও মাথা। রাত বাড়ছে। ক্রমেই কমে আসছে যানবাহনের আনাগোনা।

দড়াম করে খুলে গেল কামরার দরজাটা। ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল। এক লোক এসে দাঁড়াল ভেতরে—বেশ উত্তেজিত, মুখটা হাসি হাসি।

'কি,' ভুরু নাচাল কর্নেল। 'শুরু হয়ে গেছে?'

'জি, কর্নেল,' দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'এত স্পষ্ট "ব্লিপ" দিচ্ছে, কি বলব! এ জিনিসের তুলনাই হয় না কোনও।'

বুকের ওপর থেকে ভারী একটা পাথর যেন সরে গেল কর্নেলের। লম্বা করে দম নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। এসব জিনিস তৈরিতে আমেরিকানদের চাইতে রাশিয়ানরাই বেশি ওস্তাদ। আর কোন খবর?'

'একটা হাইওয়ে পেট্রল জানিয়েছে পাঁচ মিনিট আগে ওদের ক্রস করেছে ল্যান্ড রোভারটা। থারাওয়াদ্দির দিকে যাচ্ছে।'

'যাক,' বিড়বিড় করে বলল কর্নেল। 'আমি তো ভাবছিলাম, গেল বুঝি এবারও হাত ফসকে বেরিয়ে।'

'জ্বি, স্যার?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

তার চোখে চোখ রাখল কর্নেল। ধীরে ধীরে প্রসারিত হলো টায়ারজোড়া। কেন কে জানে, হাসছে সে। 'না, কিছু না,' বলল সে। 'ও তুমি বুঝবে না।'

অজ্ঞান রানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে রক্তাক্ত গোরা। নিঃশ্বাস পড়ছে তার ঝড়ের বেগে। রুমাল দিয়ে রক্ত ঘাম যথাসম্ভব মুছে নিয়ে কিছুক্ষণ রানার দিকে চেয়ে থাকল সে পলকহীন চোখে। চিন্তিত। এ লোক যে আর দশজনের মত সাধারণ নয়, তা সে আগেই টের পেয়েছিল এয়ারপোর্টে এর ক্যাপ্টেনের কলার ধরা দেখে। এখন দেখা যাচ্ছে ভুল নেই ওর ধারণায়।

সোলায়মানের দিকে তাকাল গোরা, দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে লোকটা। দরজাটা টেনে বাইরে থেকে লাগিয়ে দিয়ে ধুপধাপ পা ফেলে ছুটল সে। আবার রানার দিকে নজর দিল গোরা। সুদর্শন মুখটায় কোমলতা আর কাঠিন্য পাশাপাশি বিরাজ করছে, সব মিলিয়ে চেহারাটা কেমন যেন, নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর লাগে। নাহ্, সত্যি কিছু একটা আছে এর মধ্যে। এর হাঁটা-চলা, আচার-আচরণ সবই যেন কেমন আলাদা, ওদের থেকে স্বতন্ত্র। আর রয়েছে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, প্রথম থেকেই লক্ষ করে আসছে সে। তাছাড়া…নিজের ভাঙা নাকে আলতো করে হাত বোলাল, এই মার কোথায় শিখেছে এ লোক? বক্সিং আর কারাতে, দুটোতেই সমান ওস্তাদ! কি ভেবে রানাকে সার্চ করতে শুরু করল গোরা। কিন্তু কাজটা শুরু করতে না করতেই থামতে হলো ওকে। কোটটা সরে যেতে বেরিয়ে পড়ল রানার শোল্ডার হোলস্টার। হাঁ করে ওটার দিকে চেয়ে থাকল গোরা ঝাড়া দশ সেকেন্ড। তারপর সচকিত হলো, টান মেরে ওয়ালথারটা বের করে এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। মুখটা হাঁ হয়েই আছে, ভুলে গেছে বন্ধ করার কথা।

নিজের বুকের কাছের একটা বোতাম খুলে ওটা তাড়াতাড়ি ভেতরে ছেড়ে দিল সে। এবার রানার কোটের ভেতরের পকেটে হাত ঢোকাল। দুটো কি যেন বের হলো, দুটো সুদৃশ্য পলিথিনের প্যাকেটে ভরা, গোল—বেশ ভারী। প্যাকেটের মুখ সীল করা। উল্টেপাল্টে দেখল গোরা ও দুটো। কোন সীল ছাপ্পড় কিচ্ছু নেই গায়ে।

জিনিসটা যা-ই হোক, খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, ভাবল সে। রেখে দিল আবার আরেক জায়গায়। এই সময় রানার পাশেই কার্পেটের ওপর পড়ে থাকা কি যেন একটা চিক্ চিক্ করে উঠল। জিনিসটা তুলে নিল গোরা। দু মাথা ভোঁতা, পিনের মত, স্টেইনলেস স্টীলের। চোখ কুঁচকে জিনিসটার দিকে চেয়ে থাকল সে, কি হতে পারে, বুঝতে পারছে না। নাড়াচাড়া করতে করতে আঙুলের ফাঁক গলে পড়ে গেল পিনটা। ওটা খোঁজার কোন গরজ অনুভব করল না গোরা। অন্য পকেটগুলো হাতড়াতে লাগল রানার।

সবশেষে ওর হিপ্ পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করল গোরা। ওটা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। এত টাকা কারও পকেটে থাকতে পারে, কল্পনাই করেনি ও। বেশিরভাগই ডলার। এছাড়া কিছু বাংলাদেশী টাকা আর বার্মিজ 'কায়াত', সব মিলিয়ে বিরাট এক অঙ্ক।

এই সময় হঠাৎ পায়ের আওয়াজ উঠল বাইরে। তাড়াতাড়ি মানিব্যাগটা রানার হিপ পকেটে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল গোরা। আরেকবার মুছে নিল নাকমুখ। দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল জিনিয়া। রানাকে পড়ে থাকতে দেখে আঁতকে উঠল। 'এ কি! কি হয়েছে?' দ্রুত ওর পাশে এসে বসে পড়ল সে। পিছন পিছন সোলায়মানও এসে দাঁড়িয়েছে দোরগোড়ায়।

গুঙিয়ে উঠে পাশ ফিরল রানা। নাকে মিষ্টি একটা গন্ধ ঢুকতে চোখ মেলে চাইল। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে উদ্বিগ্ন জিনিয়া। তার বাড়ানো হাত ধরে ধীরে ধীরে উঠে বসল রানা। মাথা ঝাড়া দিল কয়েকবার, সাথে সাথে চোখমুখ কুঁচকে উঠল যন্ত্রণায়। গোরার দিকে ফিরল এবার জিনিয়া। 'মারামারি করেছেন আপনারা?'

'ফোন করতে যাচ্ছিলাম আমি,' বলল রানা। 'ও বাধা দিতে...'

'কোথায় ফোন করতে যাচ্ছিলেন?'

'আমাদের এমব্যাসিতে।'

'কেন!' চোখ কপালে উঠল মেয়েটার।

'আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

'ও মাই গড! ভাগ্য ভাল...আপনি জানেন না, মিস্টার হাসান, কি সাঙ্ঘাতিক কাজ করতে যাচ্ছিলেন আপনি।'

'মানে?'

'সমস্ত কল ট্যাপ করা হয় এদেশে। টেলিফোন নাম্বারের সূত্র ধরে দশ মিনিটে এসে হাজির হত আর্মি।'

চুপ করে থাকল রানা। কি মনে হতে চট্ করে হাত দিল হোলস্টারে—শূন্য। ঠাণ্ডা চোখে গোরার দিকে তাকাল ও।

'যাক্‌গে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এবার উঠুন,' হাত উল্টে ঘড়ির ওপর চোখ বোলাল জিনিয়া। 'প্রায় সাড়ে বারো বাজে। তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া দরকার। অন্ধকার থাকতে থাকতে জায়গামত পৌঁছুতে হবে আমাদের।'

ছয়

চট্টগ্রাম। ঘড়ি অনুযায়ী এখনও এক ঘণ্টার মত বাকি সন্ধে নামতে। অথচ আকাশের ঘন কালো মেঘের নিশ্ছিদ্র পর্দাটা অসময়েই রাত নামিয়ে ছেড়েছে আজ কর্মব্যস্ত বন্দরনগরীতে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত টানা বৃষ্টি হয়েছে। মাঝে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে আবার কাঁদতে বসেছে আকাশ, থামার কোন

লক্ষণ নেই। মেঘ বরং ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে আরও।

ডবল মুরিঙে বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রকাণ্ড ভবনটার পাশেই স্টার ফিশিং লিমিটেডের অফিস। শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আফতাবুজ্জামান চৌধুরী এর মালিক। বিরাট মাছের ব্যবসা ভদ্রলোকের। ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় শ' খানেক ট্রলারের মালিক। কাজ ছাড়া কিছুই বোঝেন না ভদ্রলোক। কিন্তু মেজাজটা আজ খিঁচড়ে আছে তাঁর। এই বৃষ্টির জন্যে অনেকগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল হয়ে গেছে।

কর্মচারীরা প্রায় সবাই চলে গেছে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই। অথচ এখন মাছের মৌসুম চলছে। রাত নটা-দশটা পর্যন্ত কাজ হয় এ সময় একনাগাড়ে। কিন্তু কি আর করা! ঘড়ি দেখলেন চৌধুরী—সাতটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। নাহ্, এবার উঠতে হয়। বরং চট্টগ্রাম ক্লাবের দিকে যাওয়া যাক। গত সপ্তাহে তাঁকে স্নুকারে হারিয়ে দিয়েছিলেন জাঁদরেল ব্যাংকার মুস্তাফিজুর রহমান। দেখা যাক আজ প্রতিশোধ নেয়া যায় কি না। টেবিলের ওপর ঢেকে রাখা পানিটুকু দুঢোকে খেয়ে নিয়ে পিওনের উদ্দেশে বেল বাজালেন আফতাবুজ্জামান।

টেলিফোনটাও বেজে উঠল ওই সাথে।

'হ্যালো।'

'চৌধুরী সাহেব আছেন?'

'জ্বি, বলছি।'

'স্লামালেকুম। আমি ক্যান্টনমেন্ট থেকে বলছি, মেজর আনোয়ারুল ইসলাম কথা বলবেন আপনার সাথে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। দিন ওনাকে।' মেজরের চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল চৌধুরীর। দু'বছর আগে পরিচয়। কয়েকজন বন্ধু নিয়ে একদিন হঠাৎ করেই তাঁর একটা ট্রলার ভাড়া করতে এসেছিল লোকটা। যদিও তার উদ্দেশ্য কি ছিল আজও জানেন না চৌধুরী, জিজ্ঞেস করায় পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল মেজর। তবে প্রত্যাশার চাইতে অনেক বেশি টাকাই পেয়েছিলেন তিনি সেবার। আজও কি…?

'স্লামালেকুম।'

'ওয়ালাইকুম আসসালাম। অ্যাদ্দিন পর গরীবের কথা মনে পড়ল বুঝি?'

মেজরের হাসি শোনা গেল। 'কি যে বলেন, ভাই! তারপর? আছেন কেমন? ভাবী, ছেলেমেয়েরা সব ভাল তো?'

'আল্লার রহমত, ভাল। তা কি মনে করে, ভাই?'

'আপনি আরও কিছুক্ষণ অফিসে থাকুন। আমি আসছি।'

'আসবেন?'

'হ্যাঁ। ধরে নিন, রওনা হয়ে গেছি।'

'ঠিক আছে, চলে আসুন।' টাকার গন্ধ ঠিকই নাকে গেছে বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর। সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা পিওনের হাতে একশো টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ড্রাইভারকে নিয়ে সার্কিট হাউসে যাও, জলদি।

গরম গরম কাবাব নিয়ে এসো। দৌড় দৌড়।'

ঠিক সাতটা বিশে অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল একটা জলপাই রঙের টয়োটা জীপ। পিছনে হুড ফেলা পাঁচ টনি বেডফোর্ড ট্রাকও আছে একটা। মনে মনে সামান্য বিস্মিত হলেন চৌধুরী ট্রাকটা দেখে। উঠে গিয়ে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি মেজরকে। সাদা পোশাকে রয়েছে মেজর, বাঁ হাতে একটা ব্রীফকেস।

'আসুন, আসুন! কি ব্যাপার, একেবারে সৈন্য সামন্ত নিয়ে মনে হচ্ছে?'

শেষেরটুকু শুনতে পায়নি হয়তো মেজর। শুনলেও পাত্তা দিল না। 'বেশিক্ষণ বসার উপায় নেই, ভাই। জরুরী।'

'তা তো বটেই। আপনি কি আর জরুরী আলাপ ছাড়া এসেছেন?' হাত ইশারায় একটা চেয়ার দেখালেন তিনি মেজরকে, 'বসুন।'

'ধন্যবাদ।' ব্রীফকেসটা টেবিলের ওপর রেখে বসল অফিসার।

'বলুন, স্যার, কি করতে পারি আপনার জন্যে।'

সরাসরি কাজের কথা পাড়ল মেজর। 'দুটো বড় ধরনের ট্রলার দরকার হয়ে পড়েছে হঠাৎ করে।'

'দুটো? কখন দরকার?'

'আজই, এই মুহূর্তে।'

'সে কি, সাহেব!' বলেই নিজেকে সামলে নিলেন চৌধুরী। 'অবশ্য আপনি বলতে না চাইলে কিছু জিজ্ঞেস করছি না আমি। তা, ভয়েজ কি লম্বা?'

'একেবারে কমও নয়। একটা ধরুন, সাতশো সাতশো চোদ্দশো মাইল রান করবে। অন্যটা প্রায় নয়শো মাইল। তবে কন্ডিশন ভাল হওয়া চাই।'

'নো প্রবলেম। এই সেদিনই দুটো তৈরি করিয়েছি। একেবারে নতুন। কাজে লাগানো হয়নি এখনও। খুব ফাস্ট, গতি প্রায় বিশ নট্। তবে একটা একটু ছোট, ষাট বাই বিশ। অন্যটা আশি বাই তিরিশ। চলবে না?'

'খুব চলবে।'

'কিন্তু, মেজর, আকাশের অবস্থা তো ভাল মনে হচ্ছে না। সিগন্যাল-টিগন্যাল আছে কিনা...'

'আছে। চার নম্বর। কিন্তু উপায় নেই, এরই মধ্যে যেতে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন চৌধুরী। 'আমার কোন আপত্তি নেই। আমি বলছি আপনাদের কথা ভেবে।'

ব্রীফকেস খুলল মেজর আনোয়ারুল ইসলাম। পাঁচশো টাকার নোটের কড়কড়ে দুটো বান্ডিল বের করে এগিয়ে দিল, 'নিন। অ্যাডভান্স। বাকিটা কাল পেয়ে যাবেন। এক ঘন্টার মধ্যে রেডি করে দিতে পারবেন না ট্রলার দুটো?'

একেই বলে ভাগ্য, ভাবছেন মৎস্য ব্যবসায়ী। কথা নেই বার্তা নেই এক লাখ টাকা এসে হাজির। 'অবশ্যই। শুধু সাফিশিয়েন্ট ডিজেল লোড করলেই রওনা হতে পারেন আপনি। একটু বসুন, আমি ওদুটোর সারেঙকে খবর পাঠাচ্ছি।'

'ওদের এটাও জানিয়ে দেবেন, আমরা যখন যা বলব, মুখ বুজে শুধু ফলো

করে যাবে। আগেরবারের মত আর কি।'

'অবশ্যই। বলে দেব।'

'আর...'

'কি?'

'বলছিলাম, ট্রলার দুটোয় যদি হেভি কোন লোড চাপানো যেত, সুবিধে হত। লাফালাফি কম করত। কি রকম ঢেউ দিচ্ছে সাগর, কে জানে।'

'বলেন তো পোর্ট অথরিটির হেভি ক্রেন শক্তিমানকে তুলে দিই। মোটেও দুলবে না ট্রলার,' বলেই গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন চৌধুরী হা হা করে। মন্তব্য শুনে হেসে ফেলল মেজরও।

'তা মন্দ হয় না।'

'চলুন। আমিও যাচ্ছি ঘাটে। দেখি, কি ভাবে কি করা যায়।' বান্ডিল দুটো স্টীলের আলমারিতে তুলে রাখলেন আফতাবুজ্জামান। পিওনটা এসে ঢুকল এই সময়। প্লেটে করে গরম কাবাব সাজিয়ে দিল দুজনের সামনে।

মৃদু আপত্তি জানাল মেজর, 'আহা, এসব আবার করতে গেলেন কেন এখন!'

'আরে খেয়ে নিন, ভাই। এক ঘণ্টা সময় তো আছেই হাতে।' পিওনের দিকে ফিরলেন চৌধুরী। 'এক দৌড়ে ঘাটে যাও। জননী আর ওসমানীকে ছাড়ার জন্যে তৈরি হতে বলো গিয়ে। আর গোডাউন খুলে যত নষ্ট এনজিন, স্ক্র্যাপ যা যা আছে সব জড়ো করো ঘাটে। আমি আসছি এখনই। যত লোক লাগে, লাগাও।'

ঠিক এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পর ডবল মুরিঙের সোজাসুজি ওপার থেকে রওনা হলো আনকোরা দুটো নতুন ফিশিং ট্রলার। রেডিওতে তখন পাঁচ নম্বর সিগন্যাল ঘোষণা করা হচ্ছে, সমস্ত ছোট নৌযানকে বারবার করে উপকূলের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়ালই নেই এ দুটোর।

ঢেউয়ের মাথায় চড়ে নাচতে নাচতে পূর্ণ গতিতে ছুটছে তারা খোলা সাগরের উদ্দেশে। দূর থেকে আরেকটা বড় নৌযান অনুসরণ করে চলেছে ট্রলার দুটোকে। বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর একটা অত্যাধুনিক ডেস্ট্রয়ার ওটা, বি এন এস শাহজালাল। কিন্তু কোন আইডেন্টিফিকেশন মার্ক নেই ওটায় এ মুহূর্তে। নেই, মানে আছে, ঢেকে রাখা হয়েছে মাস্কিং টেপ দিয়ে। তার ওপর স্প্রে করা হয়েছে রঙ, জাহাজের রঙের সাথে মিলিয়ে।

রাত বারোটার দিকে পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল ট্রলার দুটো। ছোটটা, এফ.বি. জননী, কোর্স ঘুরিয়ে ছুটল দক্ষিণ পুবে। এফ.বি. ওসমানী আগের কোর্সেই থাকল। চলেছে সোজা দক্ষিণে, গভীর সমুদ্রের দিকে। মেজর আনোয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনা ও নৌ বাহিনীর ষোলোজনের চৌকস, অকুতোভয় একদল কমান্ডো রয়েছে ওটায়।

বি এন এস শাহজালালও বদলায়নি কোর্স। ওসমানীর পিছন পিছন ছুটছে

সে।

পিছনের দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। জিনিয়া আর সোলায়মান আগে। ওদের পিছনে রানা আর গোরা। সবার পিছনে স্টেনধারী দুই যুবক। এদেরকে এই প্রথম দেখছে রানা। জানে না, একটু আগে এই দুজনই ছিল মিঙ্গালাদন ক্যাফেটেরিয়ায়।

বাদামী রঙের প্রায় নতুন একটা মিটসুবিশি ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তায়। পিছনটা ত্রিপলের হুড দিয়ে ঢাকা। দুই যুবক উঠে পড়ল পিছনে। ড্রাইভারের উল্টোদিকের ক্যাবডোরের দিকে এগোতে গিয়েও কি মনে করে দাঁড়াল জিনিয়া। রানার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি পিছনে উঠুন।'

'সামনে বসতে চাই আমি,' বলল ও। 'কথা বলা দরকার আপনার সাথে।'

'এখন নয়। শহর ছেড়ে বেরিয়ে নিই আগে, তারপর। কেমন?'

'বেশ।' ঘুরে দাঁড়াল রানা। এক লাফে উঠে পড়ল ক্যারিয়ারে। গোরাও উঠল ওর পিছন পিছন। আগেই ড্রাইভিং সীটে উঠে বসেছে সোলায়মান। স্টার্ট দিল সে। চলতে শুরু করল ট্রাক ধীরগতিতে। সামনে কতগুলো ভাঁজ করা কম্বল দেখতে পেয়ে দুটো তুলে নিল রানা। একটার ওপর আরেকটা রেখে বসার জন্যে একটা গদি তৈরি করল। এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল ক্যাবের দেয়ালে পিঠ দিয়ে।

অলিগলি পার হয়ে বড় রাস্তায় উঠে এল ট্রাকটা। উঠেই ছুটল তীরবেগে। ক্যানভাসের ঢাকনা সামান্য ফাঁক করে পিছনদিকে চেয়ে আছে অস্ত্রধারী দুই যুবক। গোরা বসেছে রানার দিকে মুখ করে। তার মুখটা আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে দ্রুত অপসৃয়মাণ রাস্তার আলোয়। গাড়ির দুলুনিতে বসতে পারছে না স্থির হয়ে, ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে বিশাল দেহটা। ওর প্রতি আগের সেই অবজ্ঞার ভাব এখন আর নেই লোকটার। মারামারি হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত যতবার চোখাচোখি হয়েছে, খেয়াল করেছে রানা, কেমন এক অন্যরকম দৃষ্টিতে লক্ষ করছে যেন ওকে গরিলা। যেন কি এক ভাবনায় ডুবে আছে। ওর থেকে একটা সশ্রদ্ধ দূরত্ব বজায় রেখে চলছে।

সিগারেটের ধোঁয়া নাকে যেতে সচকিত হলো মাসুদ রানা। টেইল বোর্ডে বসা অস্ত্রধারী দুই যুবক সিগারেট ধরিয়েছে। ও নিজেও ধরাল একটা সিলভার কাট। প্যাকেটটা চোখের সামনে তুলে ধরে গুনে দেখল আরও বারোটা সিগারেট আছে। আজ সকালে সোহেল দিয়েছিল ওকে প্যাকেটটা। বেচারা! এতকিছুর মধ্যেও হাসি পেল রানার। কখনও পুরো প্যাকেট ওর সামনে বের করে না সোহেল। আজ কি মনে করে দিল কে জানে! মনে হয়, জান বাঁচানো ফরজ ভেবে তাড়াতাড়ি ধরে দিয়েছে সামনে, অন্যান্যবারের মত সময় পায়নি আগেভাগে প্যাকেট খালি করার।

আগে যেখানে দূরে দূরে হলেও এক আধটা বাতি ছিল রাস্তায়, এখন তা-ও নেই। রাস্তাটাও সরু হয়ে এসেছে অনেক, বেড়ে গেছে ট্রাকের লাফঝাঁপ।

প্রতি মিনিটে একটু একটু করে রেঙ্গুন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা।

পিস্তলটা নেই, ভাবছে রানা, হোলস্টার থেকে বের করে নিয়েছে গরিলা। দুটো ছোট পলিথিনের প্যাকেট ছিল পকেটে। ও দুটো স্পর্শ করেনি বোধহয় লোকটা, যেখানে ছিল সেখানেই আছে। ক্যাপ্টেন জাহেদের কথা ভাবল রানা, যখন ভুল ভাঙবে, কি হবে ওর মানসিক অবস্থা? কতটা ক্ষতি হবে মিশনের? নাকি ভণ্ডুল হয়ে যাবে পুরোপুরি? এ ব্যাপারে জাহেদকে যে রকম ডেসপারেট মনে হচ্ছে, সত্যিই যদি শেষ পর্যন্ত মিশন ক্লোজ করার মত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, কি হবে তখন?

কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে দুই যুবক। এরই মধ্যে নাক ডাকতে শুরু করেছে দুজনেই। কিন্তু গোরার মধ্যে কোনরকম ক্লান্তির আভাস পর্যন্ত নেই, বসে আছে তেমনি, শিরদাঁড়া টানটান করে। চলতে চলতে আচমকা একটা 'ইউ' টার্ন নিল ট্রাক, সেই সাথে শুরু হলো উন্মত্ত লাফালাফি। পাকা রাস্তা ছেড়ে একটা মেঠো পথে নেমে পড়েছে ওটা। অল্পক্ষণের মধ্যেই ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সবকিছু। ফ্ল্যাপের ফাঁক দিয়ে ভেতরেও ঢুকেছে প্রবলবেগে। নাকে রুমাল চাপা দিতে বাধ্য হলো রানা।

দু-দুটো কম্বল ভাঁজ করে তৈরি করা গদিতেও কাজ হচ্ছে না এখন, নিতম্ব ব্যথা হয়ে গেল অল্পক্ষণের মধ্যেই। ঝাঁকিতে ফ্ল্যাপ সরে গেলে তারার আলোয় আবছাভাবে উঁচু নিচু একটা রেখা দেখতে পাচ্ছে রানা আকাশের গায়ে। পাহাড় সারি।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলল লাফালাফি। আবার পাকা রাস্তায় উঠে এল ট্রাক। মোটামুটি ধারণা করল রানা, উত্তর পশ্চিম দিকে চলেছে গাড়ি। কখন যেন একটু ঢুলুনিমত এসে গেল, ক্লান্তিতে আপনাআপনি বুজে এল দুচোখ।

হঠাৎ কেটে গেল ঘোর। থেমে পড়েছে ট্রাক। চোখ মেলল রানা। ঘুরে ক্যাবের পিছনে কাঁচের দেয়ালের ওপাশে তাকাল। ছোট্ট একটা পেট্রল পাম্পে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। পাম্পের অফিসরুমের কপালে হলদেটে, বড় বড় করে লেখা ESSO। রোদ আর ঝড় বৃষ্টিতে আবছা হয়ে গেছে লেখা। কিন্তু জায়গাটার নাম লেখা দেখল না ও কোথাও।

তেল নিয়ে ট্রাক রওনা হওয়ার আগে পিছনে চলে এল জিনিয়া। রানার পাশে এসে বসল সে। 'এখানে বসতে নিশ্চই কষ্ট হচ্ছে?'

'হচ্ছে,' সোজাসাপ্টা উত্তর দিল রানা।

'আমি দুঃখিত। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই কোন। আপনাকে সামনে বসানোর ঝুঁকি নিতে পারি না আমি, কারও চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

উত্তর দিল না রানা। আরেকটা সিগারেট ধরাল। টানতে লাগল চুপচাপ। ও কিছু বলছে না দেখে খানিক উসখুস করল জিনিয়া, তারপর বলল, 'ক্যাপ্টেন জাহেদের মিশনের ব্যাপারে সত্যিই কি কিছুই জানেন না আপনি?'

'না। জানি না।'

অন্ধকারে রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল মেয়েটা কিছুক্ষণ। ঠোঁট মুড়ে

কপাল কুঁচকে ভাবছে কি যেন। 'বলছেন, ক্যাপ্টেন কিছুই জানায়নি আপনাকে?'

পাল্টা প্রশ্ন করল ও, 'কোথায় চলেছি আমরা?'

'নাম বললেও জায়গা চিনবেন না আপনি। ছোট্ট একটা গ্রাম, পাহাড়ের ওপর। ক্যাপ্টেন জাহেদ আছেন ওখানে।'

'আলাদা আলাদা হয়ে যাওয়া কেন?'

'নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিশেষ একটা কাজ সারতে হবে তাঁকে ওখানে গিয়ে। আগে রওনা না হলে দেরি হয়ে যেত ক্যাপ্টেনের। তাছাড়া সাবধানতার ব্যাপারও আছে।'

'দেরি হয়ে যেত, কিসের?'

'মিশন পৌঁছে গেছে, খবরটা তাঁকে জানাতে হবে তাঁর প্রিন্সিপ্যাল কন্ট্যাক্টকে।'

'অয়্যারলেসে?'

'হ্যাঁ,' বলেই চুপ মেরে গেল জিনিয়া। বোঝা গেল এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলতে রাজি নয়।

'এরা কারা?' স্টেনধারী দুই যুবককে দেখাল রানা।

'আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমাদের সংগঠনের নীতি-আদর্শে নিবেদিত যোদ্ধা এরা প্রত্যেকে।'

'এতসব কিসের জন্যে, ক্যাপ্টেন জাহেদ এখানে কেন, বলবেন না নিশ্চই?'

আমতা আমতা করল কিছুক্ষণ জিনিয়া। বলল, 'মিস্টার হাসান, আপনি নিজে এই মিশনের একজন সদস্য···' রানা মুখ খুলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল। '···অন্তত আমাকে তাই বলা হয়েছে। সত্যি কি মিথ্যে পরে প্রমাণ হবে। কিন্তু আমার কাছে ওটাই সত্যি এ মুহূর্তে। ক্যাপ্টেন নিজে যখন এ ব্যাপারে জানাননি আপনাকে, আমার মনে হয়, আমারও কিছু বলতে যাওয়া ঠিক হবে না। আমার সমস্যাটা···'

'আচ্ছা, বেশ,' থামিয়ে দিল ওকে রানা। 'আপনার সংগঠনটা কিসের, কি এর উদ্দেশ্য, তাও বলা যাবে না?'

'তা বলা যাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি নিজেও জানি না খুব একটা। বিদেশে লেখাপড়া করি আমি। ছুটিতে দেশে বেড়াতে এসেই জড়িয়ে গেছি ভয়ঙ্কর এক চক্রান্তের জালে। আটকে গেছি। তবু যেটুকু জানি, বলছি। এরা এদেশের জনগণের ঘাড়ে সিন্দবাদের ভূতের মত চেপে বসে থাকা সামরিক জান্তার দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এক একটি জ্বলন্ত প্রতিবাদ। প্রত্যেকেই সামরিক বাহিনীতে ছিল, কিন্তু প্রশাসনের একচোখা নীতি আর চরম অবক্ষয় সহ্য করতে না পেরে চাকরি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, গড়ে তুলেছে এই সংগঠন। সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সামরিক জান্তাকে একদিন না একদিন ক্ষমতা ছেড়ে সরে যেতে বাধ্য করবে এরা। এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য এই সংগঠনের।'

'খুব চমৎকার ইংরেজি বলেন আপনি,' প্রসঙ্গ পাল্টাল মাসুদ রানা।

'কোথায় পড়াশুনা করছেন?'

'ধন্যবাদ। কেমব্রিজে। আগে কিছুদিন বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতেও ছিলাম,' হাই তুলল জিনিয়া।

'ঘুম পায়?'

'এরকম নাইট জার্নি করিনি কখনও। টায়ার্ড লাগছে খুব।'

একটা কম্বল তুলে ওর পিঠের নিচে গুঁজে দিল রানা। 'চোখ বুজে রেস্ট নিন, ভাল লাগবে।'

'ধন্যবাদ,' পা লম্বা করে বসল জিনিয়া ক্যাবের সাথে হেলান দিয়ে। প্রায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘণ্টায় গড়ে প্রায় একশো কিলোমিটার বেগে ছুটছে ট্রাক। এর মধ্যে কোন গার্ড পোস্টের মুখোমুখি হতে হয়নি, এগিয়ে চলেছে নির্বিঘ্নে। ঘড়ি দেখল রানা, তিনটে দশ। একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করে চলেছে ও। অনবরত ঝাঁকি খেতে খেতে গরিলাও বোধহয় কাহিল হয়ে পড়েছে। সামান্য পিছিয়ে গিয়ে ক্যারিয়ার বোর্ডের সাথে কাত হয়ে হেলান দিয়ে বসল সে। ঝিমুতে শুরু করল।

ঘুমের ভেতর রানার দিকে হেলে পড়েছে জিনিয়া। মাথাটা ঠেকে আছে ওর কাঁধে। ওর মধ্যেই পা ভাঁজ করে গুটিসুটি মেরে শুলো সে বাচ্চা মেয়ের মত, দুহাত ভরে দিয়েছে দুই উরুর মাঝখানে। কিন্তু গাড়ির ঝাঁকিতে বারবার ওর মাথাটা নেমে আসছে। বাধ্য হয়ে বাঁ হাত তার ঘাড়ের পিছন দিয়ে ঘুরিয়ে ওপাশে নিয়ে মাথাটা আলতো করে ধরে রাখল রানা। ওর গালের সাথে ঠেকে আছে এখন মেয়েটার মসৃণ কপাল। তার চুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছে রানা।

অন্ধকার কেটে যেতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। একটু একটু করে ফুটতে শুরু করেছে দিনের আলো। রেঙ্গুন থেকে কম করেও একশো আশি মাইল উত্তর পশ্চিমে সরে এসেছে ওরা, আন্দাজ করল রানা। চারদিকে কেবল পাহাড় আর জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ছুটছে তো ছুটছেই। পাকা রাস্তা ছেড়ে আবার মেঠো রাস্তায় নেমে পড়ল ট্রাক।

চারদিক আরও খানিকটা ফর্সা হতে চোখ মেলল জিনিয়া। পিটপিট করে চাইল প্রথমে। সামনেই গিজগিজে দাড়িভর্তি রানার থুত্‌নি দেখে তড়াক করে সিধে হয়ে বসল, বড় বড় হয়ে উঠেছে দু চোখ।

'আমি···আমি দুঃখিত,' প্রায় অচেনা-অজানা এক যুবকের কাঁধে মাথা রেখে এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল ভেবে আরক্ত হয়ে উঠল জিনিয়া। 'সত্যি···।'

মুচকে হাসল রানা। 'কিছুই মনে করিনি আমি, বিলিভ মি।'

আঙুল দিয়ে চিরুনি বোলানোর মত করে টেনে টেনে চুলগুলো মোটামুটি ঠিক করে নিল মেয়েটা। হাত তুলে ঘড়ি দেখল। 'বাবা! এতক্ষণ ঘুমিয়েছি?'

পুব আকাশে, অনেক উঁচুতে স্থির হয়ে আছে কিছু ছোপ ছোপ মেঘ। রঙ লেগেছে তার গায়ে—সূর্য উঠবে কিছুক্ষণের মধ্যে। ঘুম ভেঙে গেছে এক যুবকের। উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙল সে। ফ্ল্যাপ সরিয়ে উঁকি দিল বাইরে।

সাথে সাথে ঘুম ঘুম আলস্য ভাব উধাও হয়ে গেল তার চেহারা থেকে। পিছন ফিরে জিনিয়ার উদ্দেশে কি যেন বলল যুবক।

'এসে পড়েছি নাকি?' আন্দাজে জিজ্ঞেস করল মাসুদ রানা।

হাসি ফুটেছে জিনিয়ার মুখে। 'হ্যাঁ।'

পাঁচ মিনিট পর সামনে একটা গ্রাম চোখে পড়ল। ছোট ছোট ঘর-বাড়ি। কঠোর দারিদ্র্যের ছাপ ফুটে আছে প্রতিটির গায়ে। দূর থেকে অনেকটা পথ ঘুরে গ্রামটাকে পাশ কাটাল সোলায়মান। আরও মাইল খানেক এগিয়ে একটা বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চারদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় প্রাচীন গাছ। ওর ফাঁক ফোকর দিয়ে ডানে-বাঁয়ে এঁকেবেঁকে চলছে ট্রাক। বন ছাড়িয়ে একসময় বেরিয়ে এল অন্য প্রান্ত দিয়ে। দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝটাং করে টেইলগেট নামিয়ে দিল যুবক।

'চলুন, নামি,' বলল জিনিয়া।

রানা নামল আগে। ব্যাগটা নামিয়ে রেখে হাত বাড়াল। দুহাতে মেয়েটার ক্ষীণ কটি ধরে আলতো করে নামিয়ে আনল।

'ধন্যবাদ।' আবারও আরক্ত হয়ে উঠল তার দুগাল। রানাকে এক পলক দেখে দ্রুত আরেকদিকে তাকাল।

বেশ উঁচু ছাতওয়ালা খামারবাড়ি দেখা যাচ্ছে একটা। ওটার জীর্ণদশা দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, পরিত্যক্ত। একদিকে অনেকটা কাত হয়ে আছে। মোটা মোটা দুটো গাছ দিয়ে কোনরকমে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে পতনটা। ওটার দুপাশে আরও তিন-চারটে ছোট ছোট ঘর। সবগুলোরই এক অবস্থা। বহু কষ্টে খাড়া রেখেছে নিজেদেরকে। সামনের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা ল্যান্ড রোভার। বার্মিজ আর্মির ছাপ মারা। গাড়ির আওয়াজে খামারবাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন জাহেদ, আর রাশেদ। দুজনের কাঁধেই ঝুলছে একটা করে স্টেন। রানার দিকে একপলক তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল জাহেদ, জিনিয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'পথে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'নাহ্।'

'যাক।'

খামারবাড়ির দরজায় দেখা গেল জসিমকে। রানার সাথে চোখাচোখি হতে মৃদু হাসল লোকটা। পাল্টা একটু মুচকি হাসল রানা। একটু এপাশে সরে এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি। 'আপনার সাথে আমার কিছু জরুরী আলাপ আছে,' বলল ও। চোখ ইশারায় খামারবাড়িটা দেখাল, 'ভেতরে চলুন।'

'কি ব্যাপারে?' রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বোলাল জাহেদ। কেমন একটু খটকা লাগল মনে, ঠিক অনুরোধ নয়, মনে হলো ওকে যেন নির্দেশ করল লোকটা। চোখমুখের ভাবও যেন কেমন কঠোর লাগছে।

'এখানে নয়,' একই ভঙ্গিতে বলল রানা। 'ভেতরে চলুন।' পা বাড়াল খামারবাড়ির দিকে। ওর পথের ওপর বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে

ক্যাপ্টেন। রানাকে এগোতে দেখেও নড়ল না একচুল। দিক বদলাল না রানাও। ভাবল, পথ ছাড়বে না বোধহয় জাহেদ। কিন্তু ধাক্কাটা লাগার ঠিক আগমুহূর্তে, কি ভেবে চট্ করে সরে দাঁড়াল সে ওর পথ থেকে। পাশ কাটিয়ে মাপা, দৃঢ় পায়ে চলে গেল রানা। পিছন থেকে চোখ কুঁচকে ওর দিকে চেয়ে থাকল জাহেদ। বলল, 'যান। আসছি।'

জসিমের পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতরে পা রাখল রানা। চাপা গলায় সতর্ক করল ওকে জসিম। 'ক্যাপ্টেন খুব বদ্‌রাগী, মিস্টার হাসান। রেগে গেলে বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। লোকটাকে না চটানোই ভাল।'

উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় সামনের জিনিসটার ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল রানা। ওপাশের কাঠের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে নড়বড়ে একটা টেবিল। তার ওপর খোলা অবস্থায় আছে জসিমের প্রকাণ্ড রাকস্যাক। ভেতরে কোন ডাক্তারি যন্ত্রপাতি বা ওষুধপত্র কিছু নেই, ওটা আসলে একটা পোর্টেবল রেডিও স্টেশন। দেখামাত্রই চিনেছে রানা, জার্মানির তৈরি অত্যাধুনিক নেভি শোর রিকনাইস্যান্স রিগ ওটা, অত্যন্ত শক্তিশালী—রেঞ্জ হবে কম করেও সাড়ে চারশো মাইল। হ্যান্ডসেট আছে দুটো। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ওটা দিয়ে কথা বলা যায় দুনিয়ার যে কোন প্রান্তের সাথে।

কিছুটা আশ্বস্ত হলো ও জিনিসটা দেখে। এটার সাহায্যে খুব সহজেই যোগাযোগ করা যাবে রেঙ্গুনে। নিজের অপ্রত্যাশিতভাবে গায়েব হয়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে ও কমিউনিকেশন অফিসারকে, সেই সঙ্গে ক্যাপ্টেন জাহেদের মিশনের জটিলতা নিয়েও আলোচনা করা যাবে প্রয়োজনে। ঘুরে জসিমের মুখোমুখি হলো মাসুদ রানা, 'হোয়াট ইজ ইওর রেটিং, সেইলর?'

'তার মানে?' চোখ পিটপিট করল লোকটা কয়েকবার, 'কিসের রেটিং?'

অভিনয়টা একেবারেই কাঁচা। হাসি পেল রানার। 'কামন, জসিম। কোন ন্যাভাল শিপের চীফ রেডিওম্যান ছাড়া এ জিনিস যার-তার কাছে থাকার কথা নয়। ব্যাগের পিছনে রেডক্রিসেন্ট প্রতীক সাঁটা দেখে আমি তো ধরে নিয়েছিলাম আপনি বুঝি মেডিক।'

'নিজেকে কখনও মেডিক বলে দাবি করেছি আমি?'

'না, তা করেননি।'

'হাসান!' বাইরে থেকে হেঁড়ে গলায় ডেকে উঠল জাহেদ, 'বাইরে আসুন, জলদি!'

সাত

বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। সামনের আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছে এখনও জাহেদ। গোরাকে দেখা গেল তার সামনে। কিছু একটা যেন ক্যাপ্টেনকে বোঝাবার

চেষ্টা করছে লোকটা। কিন্তু রানাকে বেরিয়ে আসতে দেখে হাতের ঝাপটা মেরে তাকে থামিয়ে দিল সে। চাপা গলায় ধমকে উঠল, 'থামো!'

আশপাশে তাকিয়ে জিনিয়া বা রাশেদকে চোখে পড়ল না কোথাও। গেছে কোথায় সবাই? ক্যাপ্টেনের সামনে এসে দাঁড়াল রানা।

'আমার সাথে আসুন,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল জাহেদ। ওপাশের একটা ছোট্ট ঘরে গিয়ে ঢুকল মাথা নিচু করে। পিছন পিছন রানা আর গোরাও এসে দাঁড়াল ভেতরে। যা-তা অবস্থা ঘরটার। দুপাশে খড়ের স্তূপ। কেমন ভেজা ভেজা একটা গন্ধ ভাসছে বাতাসে। টিনের দেয়াল, অসংখ্য ফুটো তাতে। সূর্যের আলো টর্চের ফোকাসের মত ভেতরে ঢুকছে ফুটো দিয়ে।

রানার দিকে কিছুক্ষণ একভাবে চেয়ে থাকল জাহেদ। মুখ দেখে মনে হলো ভাবছে কিছু একটা। হঠাৎ সচকিত হলো সে। ইশারায় পাশেই পড়ে থাকা একটা বড় কাঠের বাক্স দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

বসল না রানা। 'আগে বলুন, আমি...'

বাতাসে বাড়ি মারল জাহেদ। 'পরে। আগে আমার কথা শেষ হোক। কাজে নামার আগে আপনার সাথে বোঝাপড়াটা শেষ করে নিই।'

'দেখুন...'

'অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি,' খেঁকিয়ে উঠল জাহেদ। 'এবার আমার কথা শুনতে হবে আপনাকে। আমার বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুখ খুলবেন না, সাবধান করে দিচ্ছি। নইলে, যাতে শুনতে বাধ্য হন, সে ব্যবস্থা করবে গোরা, গোরা!'

'স্যার,' আড়চোখে রানার দিকে তাকাল গোরা এক পলক, এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওর পিছনে।

এরপর আর তর্ক চলে না। পরিস্থিতি অনুধাবন করতে দেরি হলো না রানার। নিজেকে সামলাল ও, বলল, 'অলরাইট, গো অ্যাহেড।'

'কাল রাতে গোরার গায়ে হাত তুলেছিলেন আপনি, কেন?' ঠিক প্রশ্ন নয়, অনেকটা অভিযোগের সুরে বলল ক্যাপ্টেন।

'কারণ আমাকে ফোন করতে যেতে বাধা দিয়েছিল ও।'

'ওর ওপর সেরকমই নির্দেশ ছিল আমার। ওর গায়ে হাত তুলে আপনি পরোক্ষে আমার অর্ডারই ভায়োলেট করেছেন। তার মানে সরাসরি আমার নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার স্পর্ধা দেখিয়েছেন। এ পর্যন্ত অনেক ঝামেলা করেছেন আপনি, হাসান। প্লেনে ওঠার পর থেকেই আপনার উল্টোপাল্টা ভাবচক্কর লক্ষ করে আসছি আমি। কেন এসব করছেন, আপনিই জানেন। কিন্তু এই শেষবারের মত হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি আপনাকে, সময় আছে, সতর্ক হয়ে যান এখনও। আর্মি পারসন হলে এতক্ষণে কোর্ট মার্শাল করতাম আপনার, বেঁচে গেলেন সিভিলিয়ান বলে। তাই বলে ভাববেন না পার পেয়ে যাবেন, ওটা ছাড়াও আপনাকে শায়েস্তা করার অন্য হাজারও রাস্তা জানা আছে আমার,' আঙুল তুলে শাসাল সে রানাকে। 'এই মুহূর্ত থেকে, আমার হুকুম ছাড়া একটা পা-ও ফেলবেন না আপনি। দ্যাট'স অ্যান অর্ডার, ক্লীয়ার?'

'পা' ফেক্টলি,' বলল বটে। কিন্তু মনে মনে ঠিক উল্টোটা ভাবছে রানা।
'গুড,' পকেটে হাত ভরে রানার ওয়ালথারটা বের করে আনল জাহেদ। 'এবার বলুন, এটা কার?'
'আমার।'
'কেন?'
'কি কেন?'
জাহেদের দাঁতে দাঁত কাটার কড়মড় আওয়াজ উঠল। 'জানতে চাইছি এই জিনিস আপনার কাছে কেন? এই পিস্তল কি কাজে লাগতে পারে একজন ডাক্তারের?'
'কি বললেন?' প্রায় চমকে উঠল রানা। 'কে বলেছে আমি ডাক্তার?' এটাই! ঠিক এই ব্যাপারটাই কাল থেকে মনে পড়ব পড়ব করছিল ওর। এই রোটরকেসটাই যত নষ্টের মূল। ডাক্তারের ব্যাগ ভেবেই বারবার এটার দিকে চাইছিল জাহেদ অমন করে—তার মানে একজন ডাক্তারের আসার কথা ছিল এদের সাথে।
'কি! আপনি ডাক্তার না?' এক পা এগিয়ে এল জাহেদ ওর দিকে। চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এমন সময় বাধা পড়ল। রেডিওম্যান এসে দাঁড়িয়েছে দোরগোড়ায়।
'সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন, স্যার। লোটাস ডাকছে আপনাকে,' বলল সে।
'আসছি,' রানার দিকে কিছুক্ষণ আগুন ঝরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ক্যাপ্টেন। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমি না আসা পর্যন্ত এ ঘর থেকে বেরুবেন না। গোরা, থাকো এখানে,' ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে।
বোকার মত তার পিঠের দিকে চেয়ে থাকল রানা। কেন কে জানে, হঠাৎ করেই চোখের সামনে ভেসে উঠল গতরাতের দুর্ঘটনার দৃশ্যটা। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, ছায়াছবির মত এই মুহূর্তেই যেন চোখের সামনে একের পর এক ডিগবাজি খাচ্ছে পাজেরো জীপটা। ডাক্তারের গাড়ি ছিল ওটা, ওই ডাক্তারই কি…চিন্তায় বাধা পড়ল ওর।
'আপনি ডাক্তার না?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল গোরা। বেকুব হয়ে গেছে সে-ও। 'চিতা রেসকিউ মিশনের…'
'গোরা!' খামারবাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে হাঁক ছাড়ল ক্যাপ্টেন জাহেদ। দূর থেকে এ ঘরের দোরগোড়ায় রানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে গেল একটু। দু চোখে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি। মনে হলো ওর দিকে চেয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না রানাকে। যেন কোন ঘোরের মধ্যে রয়েছে, বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে আসছে এদিকে। রানার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল গোরা।
এমন সময় ওপাশের একটা ঘর থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এল লেফটেন্যান্ট রাশেদ। তার পিছনেই রয়েছে এক বর্মী যুবক। একে আগে দেখেনি রানা। জাহেদকে হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গেল রাশেদ, নিচু গলায় কি যেন

বলতে লাগল হড়বড় করে, সেই সাথে বারবার করে সদ্য আসা যুবককে দেখাচ্ছে আঙুল তুলে।

প্রথমে কয়েকবার মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন জাহেদ। তারপর হঠাৎ করেই যেন সংবিৎ ফিরল তার। রানার মনে হলো রাশেদ তাকে এমন কিছু একটা খবর দিয়েছে যে চমকেই উঠল জাহেদ। চঞ্চল হয়ে উঠল হঠাৎ করে। ব্যস্ত পায়ে ল্যান্ড রোভারটার দিকে দু পা এগিয়ে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল আবার।

মুখ তুলে রানাকে নির্দেশ করে কিছু একটা বলল রাশেদকে। দূর থেকে কিছুই বুঝতে পারছে না রানা, তবে মনে হলো ওকে ঘিরেই হয়তো ঘনিয়ে এসেছে কিছু একটা।

হঠাৎ ক প্টেনের চাপা ধমক কানে এল। 'ডু, হোয়াট আই সে!' রাশেদের উদ্দেশে বলল সে।

এক পা পিছিয়ে এল রাশেদ, তালগাছের কানে কানে বলল কিছু একটা। মাথা দোলাল লোকটা। পরমুহূর্তে লাফিয়ে জীপে উঠে বসল জাহেদ। পিছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল রাশেদ, গোরা আর সদ্য আসা যুবক। আবদুর রহমান বসল ড্রাইভিং সীটে। ছোট্ট একটা গর্জন ছেড়ে সামনের দিকে লাফ দিল ল্যান্ড রোভার।

ভুরু কুঁচকে ওটার গমন পথের দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। চিতা? ভাবছে ও, চিতা কে? আচ্ছা!···বিদ্যুৎচমকের মত সম্ভাবনাটা খেলে গেল মাথায়, মেজর জেনারেল ইবরাহিম নন তো? যাঁর কথা বলেছিলেন রাহাত খান? জাহেদ কি তাঁকেই রেসকিউ করতে এসেছে?

ঠিক তাই। ও মাই গড! জেনারেলের মাথার ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসছে হয়তো, ক্রিপটোসাইফার মেশিনের অসম্পূর্ণ ডিকোডেড মেসেজ দেখে অনুমান করেছিলেন বৃদ্ধ। আরও আগেই কেন এই সম্ভাবনাটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি ও, ভেবে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। আর কিছু না হোক, এখানে এসে এ পর্যন্ত যতজনের সাথে আলাপ হয়েছে, বর্মী হলেও তারা সবাই মুসলমান-রোহিঙ্গা, অন্তত এ থেকেও তো ব্যাপারটা আঁচ করতে পারা উচিত ছিল ওর। ইশ!

যেভাবেই হোক, বাংলাদেশ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের কাছে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন মেজর জেনারেল, অনুমান করল রানা। যার জন্যে এদেশে আসা এই রেসকিউ মিশনের। কিন্তু···এর মধ্যে ডাক্তারের কি প্রয়োজন ছিল? ভদ্রলোক কি অসুস্থ? তাই যদি হয়, সমূহ বিপদ।

কিন্তু আর্মি ইন্টেলিজেন্স খবর পেল, অথচ বিসিআই কিছু জানল না, কেন? পেয়েছে নিশ্চয়ই, ভাবল রানা, তবে হয়তো একটু দেরিতে। সময়মত দূতাবাসে পৌঁছুতে পারলে এতক্ষণে ঠিকই জেনে যেত ও। কে জানে, রাহাত খান ওর খোঁজে দূতাবাসের সাথে এ পর্যন্ত কতবার যোগাযোগ করেছেন।

জিনিয়ার ওপর চোখ পড়ল রানার। আঙিনায় দাঁড়িয়ে কিছু আলোচনা করছে সোলায়মানের সাথে।

ভুরু কুঁচকে দক্ষিণ-পুব দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে মেজর আনোয়ারুল ইসলাম। রাত তিনটের দিকে হঠাৎ করেই থেমে গেছে ঝড়। আকাশে এ মুহূর্তে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। কড়া সূর্যের আলোয় কাঁচের মত ঝকঝক করছে বঙ্গোপসাগরের সীমাহীন নীলচে পানি। মসৃণ গতিতে তরতর করে এগিয়ে চলেছে এফ. বি. ওসমানী। ঘড়ি দেখল মেজর—প্রায় নটা।

ঘুরে পিছন দিকে চাইল সে কি মনে হতে। জানে, দিগন্ত রেখার ঠিক ওপাশেই কোথাও রয়েছে বিএনএস শাহজালাল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। ওসমানীর সাথে একই গতিতে আসছে ওটা। চট্টগ্রাম থেকে এর মধ্যে প্রায় দুশো ত্রিশ মাইল দক্ষিণ দক্ষিণ পুবে এসে পড়েছে ওসমানী—অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে বলা চলে। আজ মাঝরাতের কিছু পর পৌঁছুবে গন্তব্যে। অবশ্য তার আগেই আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা ছাড়িয়ে বর্মার জলসীমানায় নাক ঢোকাবে ওসমানী।

কিন্তু ও নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয় মেজর আনোয়ার। সে ভাবছে একটু আগে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, সেখান থেকে বিএনএস শাহজালাল হয়ে আসা মেসেজটার কথা। তাতে বলা হয়েছে, ফ্যালকন মিশনের চার সদস্যই জায়গামত পৌঁছে গেছে জেনে ঢাকা চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। কারণ, মিশনের অন্যতম সদস্য, ডাক্তার, গতরাতে ঢাকাতেই এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। কাজেই, এ মুহূর্তে ফ্যালকনের সদস্য সংখ্যা চার নয়, তিন হওয়ার কথা।

শেষে মিশন লীডারের উদ্দেশে ঢাকার পরিষ্কার নির্দেশ—বর্তমান ডাক্তার ভুয়া। বিষয়টা তদন্ত করে এ ব্যাপারে যে কোন পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

খুব ভোরে মিশনের পৌঁছুনোর খবর মেজর আনোয়ারই, লোটাস বেজ, রিসিভ করেছিল। সাথে সাথে বি এন এস শাহজালালকে তা জানিয়ে দেয় আনোয়ার। সেখান থেকে চট্টগ্রাম ঘুরে ঢাকা পৌঁছেছে মেসেজ। তার পরপরই এই খবর। কেবল ট্রান্সমিশন শেষ করেছে মেজর। কথা হয়েছে ফ্যালকনের টীম লীডারের সাথে। কে জানে, কি চলছে ওখানে এখন। শেষ পর্যন্ত কি ব্যর্থই হয়ে যাবে মিশন?

কলা, পাঁউরুটি দিয়ে নাশ্তা সারল রানা ও জিনিয়া। এরপর টোল পড়া দুটো অ্যালুমিনিয়ামের মগে করে কফি দিয়ে গেল তালগাছ। রানা জানে, বেরিয়ে যাওয়ার আগে অয়্যারলেসে লোটাস নামে কারও সাথে কথা হয়েছে জাহেদের। কিন্তু কি কথা, তা জানা হয়নি। জানে না, সোলায়মানের ওপর নির্দেশ আছে, ওর ওপর কড়া নজর রাখার। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে দেয়া চলবে না। স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে হাসানের সাথে। জিনিয়া অবশ্য এর কিছুই জানে না।

'ওরা সবাই ব্যস্ত হয়ে গেল কোথায়?' কফি শেষ করে সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'আশেপাশেই,' বলল জিনিয়া।
'মেজর জেনারেলকে রিসিভ করতে?'
একভাবে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকল মেয়েটা। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনি নাকি কিছু জানেন না এ ব্যাপারে?'
'সত্যিই জানি না। তবে অনুমান করছি এখন একটু একটু।'
'অনুমানের সূত্রটা কি জানতে পারি?'
'একটু আগে গোরার মুখে চিতা কথাটা শুনেছি।'
'তাতেই বুঝে ফেললেন চিতা মানে...'
'না, তা নয়। মেজর জেনারেলের নাম শুনেছি আমি আগেই। তিনি বিপদে পড়তে যাচ্ছেন, তা-ও জানি মোটামুটি। তাছাড়া...আপনারাও সবাই মুসলমান, এ থেকেই অনুমান করে নিয়েছি।'
'আচ্ছা।'
'সত্যিই তাহলে ওঁর পিছনে লেগেছে বর্মী জান্তা?'
'আপনি মেজর জেনারেল সম্পর্কে এসব গোপন তথ্য কিভাবে জানলেন?'
'আমাদের ফরেন মিনিস্ট্রির এক হাই অফিশিয়ালের কাছ থেকে।'
'ও,' একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল জিনিয়া। 'শুধু পিছু লাগা নয়, ধরতে পারলেই কোর্ট মার্শাল হবে তাঁর। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, ফায়ারিং স্কোয়াডে।'
'কি অপরাধে?'
'রোহিঙ্গাদের ওপর সরকারের নিপীড়নের প্রতিবাদ করার অপরাধে। আপনি জানেন নিশ্চই, বিশেষ করে মুসলমানদের ওপর কি দমনমূলক নির্যাতন চালানো হচ্ছে এদেশে?'
'জানি, কিছু কিছু। খবরের কাগজে দেখি।'
'মুসলমানদের ওপর সও মঙ সরকারের রাগটা কেন যেন একটু বেশিই। অহেতুক ধরপাকড়, নিত্য লুটপাট, অগ্নিসংযোগ আর নারী নির্যাতন, এই নিয়েই আছি আমরা এ দেশে। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে আজ এই দশা মেজর জেনারেলের।'
'এর জন্যে একেবারে মৃত্যুদণ্ড?'
'না, ভেতরে আরও ব্যাপার আছে। আকিয়াবের জঙ্গলে রোহিঙ্গাদের গোপন এক সামরিক ঘাঁটি আছে। খুবই শক্ত ঘাঁটি, লেটেস্ট মডেলের সব সমরাস্ত্র আছে ওখানে। পর পর কয়েকবার ওই ঘাঁটি আক্রমণ করতে গিয়ে বর্মী সেনাবাহিনীকে চরম ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, পাল্টা মার খেয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে। এসব কৃতিত্বের দাবিদার এই মেজর জেনারেলই। আর্মি রেইড হওয়ার আগে প্রতিবারই গোপনে সংবাদ পাঠাতেন তিনি আকিয়াবে। ফলে পুরো প্রস্তুতি নিয়ে থাকত রোহিঙ্গা যোদ্ধারা। গেলেই মার খেত সেনাবাহিনী।'
'তিনি কি করে বুঝতেন ওখানে হামলা চালাতে যাচ্ছে সরকার? উনি মুসলমান, মেজর জেনারেলই হোন, আর যা-ই হোন, নিশ্চই খবরটা গোপন রাখা হত তাঁর কাছে?'

'আর্টিলারি চীফ ছিলেন মেজর জেনারেল। যখনই বড় ধরনের কোন আর্টিলারি ডেসপ্যাচের নির্দেশ আসত, তখনই সতর্ক হয়ে যেতেন তিনি, খবর পাঠাতেন ওখানে। তবে, প্রত্যেকবারই মুসলমানদের ঘাঁটিতেই যে হামলা করত ওরা, তা-ও নয়। কখনও কখনও খৃষ্টান কারেনদের ওপরও চড়াও হয়েছে। কিন্তু ডেসপ্যাচ অর্ডার পাওয়া মাত্র সংবাদটা আকিয়াবে পাঠাতে দেরি করতেন না তিনি কখনও। তিন সপ্তা আগে ব্যাপারটা বর্মী আর্মি ইন্টেলিজেন্সের চীফ, উ ক মঙ টের পেয়ে যায় কিভাবে যেন। সে যে জেনে গেছে, চিতাও তা বুঝে ফেলেছিলেন। সাথে সাথে গা ঢাকা দেন তিনি। অবশ্য ব্যাপারটা এখনও গোপন রেখেছে সরকার, ফাঁস হয়ে গেলে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়তে হতে পারে রেঙ্গুনকে। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই এখন তাঁর।'

হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল রানা, 'কিন্তু আপনি এসবের মধ্যে কেন? মেজর জেনারেল…'

'আমার বাবা।'

'তাই বলুন।' কী যেন ভাবল একটু রানা, আনমনে টং টং টোকা মারছে মগের গায়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। চোখ ঝলসে গেল কড়া রোদে। গত তিন দিন সূর্যের মুখ দেখা যায়নি ঢাকায়। হঠাৎ করে আজ খুব কড়া লাগছে তাই রোদের তেজ। 'আপনার বাবা কি অসুস্থ?'

'হ্যাঁ। প্রেশার আছে, হাই। দুবার স্ট্রোক হয়েছে আগে। দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে প্রেশার আরও বেড়ে গেছে।'

'দেশ ছেড়ে পালানোর কি দরকার আপনার বাবার? আকিয়াবের ঘাঁটিতে চলে গেলেই তো পারেন।'

'সম্ভব নয়। অনেকদূরের পথ। নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবেন। চারদিকে ঘুরঘুর করছে কর্নেল মঙের চর।'

'আপনার আর কে কে আছে?'

'দুই ভাই আছে, বড়। দুজনেই লন্ডনে। বিয়ে করে সংসারী হয়েছে ওদেশে।'

'মা?'

'নেই। দুবছর হতে চলল মারা গেছেন।'

'কর্নেল মঙ যদি আপনাদের এসব তৎপরতা টের পেয়ে যায় কোনভাবে…'

'যদি নয়। পেয়ে গেছে অলরেডি।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'কি করে বুঝলেন?'

'একটু আগে এক যুবক এসেছিল, দেখেছেন তাকে?'

'দেখেছি।'

'ও আমাদের ইনফরমার। এসে বলল, সাত-আট মাইল উত্তরের একটা গ্রামে নাকি সাদা পোশাকধারী কয়েকজনকে দেখা গেছে। আচরণ সন্দেহজনক, এদিকেই নাকি আসছে। ব্যাপারটা যাচাই করে দেখতে গেছে

ওরা সবাই। তবে···ঠিক এদিকেই কেন আসছে ব্যাটারা, বুঝতে পারছি না।' একটু দ্বিধান্বিত মনে হলো জিনিয়াকে।

'আপনার সঙ্গীরা কতটা বিশ্বাসী?'

'এদের সবাইকে আমি চিনিও না। তবে লেফটেন্যান্ট রাশেদ যখন এদেরকে সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করেছে, তখন এদের সততা নিয়ে কোন সন্দেহই নেই আমার।'

'মানব চরিত্র বড় জটিল···,' থেমে গেল মাসুদ রানা। চিন্তিত। 'আচ্ছা, কাল রাশেদ বলছিল, কোথায় নাকি আর্মি ঘুর ঘুর করছিল। ব্যাপারটা কি?'

'এয়ারপোর্ট থেকে এসে প্রথমে যে বাড়িতে ঢুকেছিলেন আপনারা, ওই বাড়িতে আর্মি রেইড হয়েছিল। বাবার এক বন্ধুর বাড়ি ওটা, ভদ্রলোক ক্রিশ্চান। তাঁর মেয়ে আর আমি একই সাথে কেমব্রিজে পড়ি। দেশে এলে ক্যান্টনমেন্টেই উঠতে হয় আমাকে বাবার কোয়ার্টারে। কিন্তু মুশকিল হলো অতবড় বাড়িতে কারও সঙ্গে যে কথা বলে দুদণ্ড সময় কাটাব, তেমন কেউই নেই। বাবাকে তো প্রায় সারাদিনই ব্যস্ত থাকতে হয় অফিসের কাজে। এবার তাই বাবার বুদ্ধিতে ওই বাড়িতেই উঠেছিলাম কয়েকদিনের জন্যে।

'উনি অবশ্য এবার দেশে আসতেই বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন ইংল্যান্ডে ভাইদের ওখানে ছুটি কাটাতে। কিন্তু পর পর দুটো ভ্যাকেশনে দেশে আসিনি, ছুটি কাটিয়েছি ভাই-ভাবীদের সাথে। এবার আর যেতে মন চাইল না। তাছাড়া বাবাকে কতদিন দেখি না, খুব ইচ্ছে করছিল দেখতে। তাই কোন নিষেধ শুনিনি, চলে এসেছি প্রায় জেদ করেই। আসলে···এখন বুঝি, কেন আসতে নিষেধ করেছিলেন বাবা। উনি চাননি ওনার সাথে আমিও বিপদে পড়ি।'

'ও বাড়িতে যারা ছিল, ধরে নিয়ে গেছে তাদের?'

'ছিল না কেউ। বাবার পরামর্শে গত সপ্তায় নেপাল গেছে ওরা হিমালয় দেখতে।'

'তারপর?'

'আমি দেশে আসার তিন কি চারদিন পর, হঠাৎ করে দুপুরের দিকে অফিস থেকে চলে আসেন বাবা। সঙ্গে লেফটেন্যান্ট রাশেদ, সোলায়মান আর আবদুর রহমান। বললেন, সন্ধের পর পরই ওই বাড়ি ছাড়তে হবে আমাকে। অন্য কোথাও বাসা ভাড়া করছে রাশেদ, সেখানে গিয়ে থাকতে হবে আপাতত কিছুদিন। এরপর বন্ধুর সাথে কি আলাপ হয় বাবার, জানি না। পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়েন বাবা, গা ঢাকা দেন। দশ বারো দিন হয়ে গেল, কোথায় কেমন আছেন তিনি, জানি না।'

কেঁদে ফেলল জিনিয়া। ধরা গলায় বলল, 'বুড়ো মানুষ, তার ওপর হার্টের রোগী। এত উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা নিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে কত কষ্ট হচ্ছে বেচারার। ঠিকমত খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই···,'

জিনিয়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকল রানা। দিনের পর দিন হিংস্র হায়েনার তাড়া খেয়ে ফেরা বৃদ্ধ অসুস্থ পিতার কষ্টের কথা ভেবে কাঁদছে অসহায় মেয়ে,

কি বলে ওকে প্রবোধ দেবে সে? তারচে' বরং কাঁদুক কিছুক্ষণ, মনটা শান্ত হবে তাতে। একসময় নিজেকে সামলে নিল মেয়েটা। চোখ মুছে নিয়ে নড়েচড়ে বসল।

'কোথায় আছেন এখন আপনার বাবা?'

'আমি জানি না। লেফটেন্যান্ট জানেন। তবে আজ রাতে এখানে এসে পৌঁছুবার কথা আছে তাঁর।'

'সঙ্গে লোকজন আছে তো?'

'আছে, সাত আটজন। আরও কিছু আছে, এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে তারা।'

'ঢাকায় সাহায্য চেয়ে পাঠালেন কিভাবে?'

'টেলিফোনে।'

'অ্যাঁ?'

'বাংলাদেশ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের চীফ, ব্রিগেডিয়ার খলিল বাবার বন্ধু। বাধ্য হয়ে ওনার কাছেই সাহায্যের আবেদন পাঠিয়েছেন উনি।'

'ওপেন লাইনে?'

'হ্যাঁ।'

'সব্বোনাশ! এমন কাজ…'

'কেন?'

'ওপেন লাইনে কথা বলেছেন…যদি ট্যাপ করা হয়ে থাকে?'

'অবশ্যই ট্যাপ করা হয়েছে। হবে জেনেই তো করা।'

'বুঝলাম না।'

'দুটো প্ল্যান ছিল বাবার। প্রথমটা টেলিফোন করা, যাতে কর্নেল মঙ জানতে পারে উনি কি করতে চাইছেন। কারণ, ওই লোকটার ভয়ে এক জায়গায় বসে থাকতে হচ্ছে এখন বাবাকে, বাইরে বেরুতে পারছেন না। চারদিকে হন্যে হয়ে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে মঙের লেলিয়ে দেয়া চরেরা। পুরো দেশ ছেয়ে গেছে ওয়াচারে। তাই লোকটার নজর ডাইভার্ট করার জন্যেই করা হয়েছে কাজটা। বাবা চেয়েছেন ফোন ট্যাপ করুক মঙ। জানুক, আগামী তিন তারিখে আকিয়াব হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতে যাচ্ছেন তিনি। এবং তা বিশ্বাস করে বসে থাকুক সে ওখানে গিয়ে। কিন্তু ওই পথে কোনকালেই যাবেন না আসলে তিনি। যাবেন সাগরপথে এবং তিন তারিখের অনেক আগেই। ভেতরের ব্যাপার যখন টের পাবে মঙ, বাবা তখন থাকবেন ওর নাগালের বাইরে।'

'চমৎকার!'

'তবে আমার ধারণা, খুব একটা কাজ হয়নি এসবে।'

'কেন?'

'কাল আপনাদের প্লেনের ওপর নজর রাখার জন্যে এয়ারপোর্টে ওয়াচার পাঠিয়েছিল মঙ। বাবার লোকও ছিল অবশ্য, ওর ব্যবস্থা করে রেখে এসেছে। আজ সন্ধে পর্যন্ত ঘুমুবে ব্যাটা। বাবাকে একদম দেখতে পারে না মঙ

হারামজাদা। বাবার ট্যালেন্টকে সহ্য করতে পারে না।'

'কি রকম?'

'একবার গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের মাদক সম্রাটদের পোষা বাহিনীর বিরুদ্ধে বড় রকম একটা অভিযান চালানোর প্ল্যান করেছিল লোকটা। ক্ষমতা দখল করার পর সও মঙই দিয়েছিল এ নির্দেশ। জনগণকে আসলে বোঝাতে চাইছিল, আমি ভাল মানুষ। কিন্তু প্ল্যানে দুটো বড়রকম ট্যাকটিক্যাল ভুল ছিল মঙের। ভুল দুটো ধরিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। যদিও মুসলমান হিসেবে পাত্তা পাননি, তাছাড়া সও মঙের কাজিন হয় উ ক মঙ, প্রভাব খাটিয়ে ওই প্ল্যান মাফিকই হামলা চালায় সে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলে। এবং ওই দুটো ভুলের জন্যেই চরম মার খেয়ে ফিরে আসতে হয় সেবার সেনাবাহিনীকে। ওই থেকে একেবারে মহা খাপ্পা লোকটা বাবার ওপর। এইবার উঠেপড়ে লেগেছে সুযোগ পেয়ে।'

চুপ করে থাকল রানা। ভাবছে, কি করে মেজর জেনারেলকে বের করে নিয়ে যাবে জাহেদ। কোন্খান দিয়ে সীমানা পেরুবে। হঠাৎ গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। একটু পরই সামনের আঙিনায় এসে থামল ল্যান্ড রোভারটা। গাড়ি থেকে নেমে হন হন করে খামারবাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল ক্যাপ্টেন।

'চিতা কি, কোন খেতাব?'

'হ্যাঁ, সরকার দিয়েছিল বাবাকে।'

আট

আগের রাতের ঘটনা। প্রায় দু ঘণ্টার অক্লান্ত পরিশ্রম শেষে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আবার চালু করা সম্ভব হয়েছে মিঙ্গালাদনে। গোলমালটা কোথায় ছিল, কেন বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটল, এখনও ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছে না ডিউটিরত ইলেকট্রিক্যাল এনজিনিয়ার।

ওদিকে বিদ্যুৎ চালু হবার পর পরই ক্যাফেটেরিয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে উইনের অজ্ঞান দেহ। এয়ারপোর্টের ডাক্তার তাকে চেক করে রায় দিয়েছে, খুব কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ ইনজেক্ট করা হয়েছে দেহে। ব্যাপারটা কেমন সন্দেহজনক মনে হলো কর্তৃপক্ষের। বিমান বাংলাদেশের ফ্লাইটটা অবতরণ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই পর পর কয়েকটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে গেছে। অথচ এসব ঘটার পিছনে কোন সঙ্গত কারণ নেই। এই জন্যেই কি কর্নেল মঙ সতর্ক করে দিয়েছিল আগে থেকে?

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ব্যাপারটা একেবারেই অস্বাভাবিক। মিঙ্গালাদনের ইতিহাসে এটাই এ ধরনের প্রথম ঘটনা। এরপর অজ্ঞান লোকটার ব্যাপারটা, কাউকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে রেখে কার কি লাভ? তার কাছ থেকে কেউ কি কিছু গোপন করতে চেয়েছিল? কিন্তু এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ

ব্যাপার হচ্ছে বিমানের প্যাসেঞ্জার লিস্টের গড়বড়টা। রেঙ্গুনে নামার কথা আঠারোজন যাত্রীর, অথচ নেমেছে সতেরোজন। হাসান নামের এক যাত্রীর পাত্তা নেই, অথচ তার নামের পাশে টিক্ মার্ক করা আছে। লোকটা ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টধারী। গেল কোথায় লোকটা? নাকি আসেনি? কিন্তু টিক্ মার্ক কেন তাহলে? নাকি বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সুযোগে হাওয়া হয়ে গেছে?

কর্নেল মঙের সাবধানবাণীর কথা মনে আছে কর্মকর্তাদের, বিশেষ করে ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টধারী কেউ থাকলে তার ওপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ ছিল তার। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়নি তাদের। বিজি ০৭৬-এর ফ্লাইট পারমিশন স্থগিত রেখে কর্নেল মঙকে টেলিফোন করা হয়েছে। অজ্ঞান উইনকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে হাসপাতালে।

একটা চল্লিশে মিঙ্গালাদন পৌঁছল কর্নেল। প্রথমে কাস্টমস অফিসারদের সাথে কথা বলল সে। এরপর পড়ল ইলেক্ট্রিক্যাল এনজিনিয়ারকে নিয়ে, ধমক ধামক মেরে ট্রাউজার গরম করে ছাড়ল সে লোকটার।

'ডিউটির সময় ঘুমানো হয় পড়ে পড়ে, না? এতবড় একটা কাণ্ড কি করে ঘটে গেল তুমি উপস্থিত থাকতে?'

কোন উত্তর দিল না এনজিনিয়ার। অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে কর্নেলের থুত্নির নড়াচড়া দেখতে লাগল।

'রাখো, ব্যবস্থা করছি তোমার। যাও, অপেক্ষা করো বাইরে গিয়ে।'

এরপর ডাক পড়ল বিমানের পাইলট তরিকুল ইসলামের। বেচারা আগেই ঘাবড়ে গিয়েছিল ব্যাপার টের পেয়ে। লিস্টটা জমা দেয়ার আগে যদি একটিবার চোখ বুলিয়ে নিত, তাহলে এ ঝামেলায় পড়তে হত না এখন। দেখা যাচ্ছে, সত্যিই গণ্ডগোল আছে ওটায়। লিস্টেড একজন যাত্রীর খবর নেই কোন, অথচ এমনটা হওয়ার কোন কারণই নেই—তাও মানুষটা ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট হোল্ডার।

তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, নিখোঁজ এই যাত্রীটির পাসপোর্ট কিন্তু এ মুহূর্তে তারই পকেটে রয়েছে। টিকেটটাও আছে ওর মধ্যে। তাড়াহুড়ো করে নেমে যাওয়ার সময় ওটা ফেলে গেছে হয়তো ভদ্রলোক, টেরটিও পায়নি কখন পড়ে গেছে পকেট থেকে। ভাগ্যিস গ্যাঙওয়ের মাথায় ওদুটো কুড়িয়ে পেয়েছে এক বিমানবালা, নইলে এদের কারও হাতে পড়লেই হয়েছিল। কিন্তু পাসপোর্ট-টিকেট যার প্লেনে পড়ে থাকল, তার উধাও হয়ে যাওয়ার পিছনে কি এমন কারণ থাকতে পারে, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না তরিকুল ইসলাম। রহস্যটা কি? সত্যি সত্যি হারালে এতক্ষণে কি খোঁজ পড়া উচিত ছিল না জিনিস দুটোর?

বাঘের নজরে তরিকুল ইসলামের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল কর্নেল মঙ। সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

বসল সে। মনে মনে ধন্যবাদ জানাল লোকটাকে। তার বিকট চেহারা দেখে কাঁপুনি উঠে গিয়েছিল হাঁটুতে।

'আপনার সাবমিট করা লিস্ট অনুযায়ী আঠারোজন যাত্রী নামার কথা

রেঙ্গুনে, অথচ নেমেছে সতেরোজন, আরেকজন গেল কোথায়?'

'বলতে পারব না,' গলাটা সামান্য কেঁপে গেল পাইলটের।

'কেন?' সামনে থেকে লিস্ট তুলে নিয়ে তার নাকের সামনে দোলাল কর্নেল। 'এটা ঢাকা এয়ারপোর্টের তৈরি লিস্ট, আপনারও সই আছে এর নিচে।'

'সইটা আসলে একটা প্রসিডিওর আছে বলে করা হয়। কিন্তু পাইলট কখনও যাত্রী গুনে দেখে না।'

'ওইসব আমি বুঝি না। লিস্টে এই হাসান নামটার পাশে টিক্ মার্ক করা আছে, অথচ তার ব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না, এটা কোন কথা হলো? তাও আবার একজন ডিপ্লোম্যাটিক প্যাসেঞ্জার, সাধারণ নয়।'

'হতে পারে, ঢাকা অথরিটি হয়তো ভুল করে টিক্ মার্ক দিয়ে ফেলেছে। পরে হয়তো চেক করে দেখেনি লোকটা সত্যিই উঠল কি না। তবে আমার মনে হয় সে আসেনি। এলে যাবে কোথায়? যারা নামার, তারা সবাই দশ মিনিটের মধ্যেই নেমে গেছে।'

'আপনি জানেন, এই লোক আমার দেশের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যকলাপ ঘটাতে পারে বলে গোপনসূত্রে খবর পেয়েছি আমি?'

'আপনার গোপনসূত্রের খবর আমি কি করে জানব, বলুন?'

'কি?' হুঙ্কার ছাড়ল জলহস্তী। 'ইয়ার্কি হচ্ছে? কার সামনে বসে মুখ নাড়ছেন আপনি, জানেন?'

'আপনি শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করছেন, স্যার। আপনার যদি এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে, আমাদের রাষ্ট্রদূতকে জানাতে পারেন আপনি। অথবা সরাসরি আমাদের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকেও জানাতে পারেন। আমি একজন পাইলট, স্যার। প্লেন চালাই। ভেতরের প্যাঁচ-ঘোঁচ বুঝি না। বিলিভ মি, স্যার, কিছুই জানি না আমি এ ব্যাপারে।'

রেগে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল কর্নেল। ব্যাপারটা নিয়ে আরেকটু ভাবল, হয়তো ঠিকই বলছে ক্যাপ্টেন লোকটা। লিস্ট অনুযায়ী একজন যাত্রীর খবর নেই, আবার ওদিকে ওয়াচার বলছে, ফোক্সওয়াগেন থেকে সাতজনকে ঢুকতে দেখেছে সে বাড়িটার মধ্যে। আর হাইওয়ে গার্ডপোস্ট বলছে চারজন ছিল ল্যান্ড রোভারে। এর মানেটা কি দাঁড়াল তাহলে? সত্যি সত্যি কতজন এসেছে? দুজন, তিনজন, না চারজন?

লিস্টের ব্যাপারটা তাহলে ভুলই হবে, কাউকে বয়ে নিয়ে গেল আরেক দেশে, অথচ হিসেব মেলাতে পারল না, এমন গাধামী কোন আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা করবে না নিশ্চয়ই। তবে গণ্ডগোল একটা কিছু যে আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নইলে এয়ারপোর্টের কারেন্টও যেত না, আর উইনের…

যদিও ব্যাপারটা প্রমাণ করা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে। এই যা একটু অসুবিধে। যাকগে, যতজনই থাকুক দলে, কোন সমস্যা হবে না ওটা। সময়মত জাল ফেলবে সে, তুলে আনবে ডাঙায় ছোট-বড় সবগুলো মাছ। 'ঠিক আছে,' চোখ তুলল মঙ। 'যেতে পারেন আপনি।'

'আমাকে কি ফ্লাই করার অনুমতি দেয়া হলো?'

'হ্যাঁ, যান।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। নির্ধারিত সময়ের ঠিক আড়াই ঘণ্টা পর, দুটো পাঁচে মিঙ্গালাদন ত্যাগ করল বিজি ০৭৬।

সকালে অফিসে আসামাত্র মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের কামরায় ডাক পড়ল সোহেলের। বৃদ্ধের চেহারা দেখেই টের পেল ও, কোথাও কোন গোলমাল হয়ে গেছে। তাঁর কপালের পাশে তিরতির করে কাঁপছে একটা শিরা। ঘন ঘন টান দিয়ে চলেছেন পাইপে, অথচ ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। অর্থাৎ ওটা ধরানোর কথা বেমালুম ভুলে বসে আছেন।

দুজনের আলোচনাটা খুবই সংক্ষিপ্ত হলো। সবশেষে সোহেলকে নির্দেশ দিলেন রাহাত খান, 'এখুনি একবার এয়ারপোর্টে যাও তুমি। প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখবে আগে, মাইগ্রেট করেছে কিনা রানা। তারপর অফিশিয়ালদের সাথে কথা বলবে। আমি আরেকবার রেঙ্গুনের সাথে কথা বলে দেখি। যাও।'

'জ্বি, স্যার,' তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সোহেল। প্রায় ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে। কোটের একটা হাত দুলছে ওর হাঁটার ছন্দে। অন্যটা স্থির হয়ে আছে—একটা হাত নেই সোহেলের।

'আর কোন মেসেজ দিয়েছে লোটাস?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রেডিওম্যান। 'না, ক্যাপ্টেন।'

'হুঁম!' কপাল কুঁচকে জুতোর ডগার দিকে চেয়ে থাকল জাহেদ কিছুক্ষণ। কি এক দুশ্চিন্তায় চোখমুখ শুকিয়ে গেছে। বাইরে থেকে ফিরেছে সে এইমাত্র। আট মাইল উত্তরের এক পাহাড়ী গ্রামে কিছু সন্দেহজনক লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে, রাশেদের এক ওয়াচারের মুখে এই খবর পেয়ে সদলবলে ছুটে গিয়েছিল সে ওখানে। চারজন ছিল তারা—জেরা করার জন্যে ধরে এনেছে লোকগুলোকে লেফটেন্যান্ট রাশেদ।

ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। রাশেদের উদ্দেশে বলল, 'এখনই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাই আমি। একসাথে ঘরের-বাইরের এত ঝামেলা সামলানো সম্ভব নয়।'

'আপনি যা ভাল বোঝেন, ক্যাপ্টেন,' বলল রাশেদ। 'তবে আরেকটু দেরি করে যদি...'

'ঢাকার মেসেজ তো শুনলেন, এরপর আর দেরি করা সম্ভব নয়। চলুন, ওর মুখ থেকেই শুনব এখন,' দরজার দিকে পা বাড়াল জাহেদ।

ওদের ফিরে আসতে দেখে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে মাসুদ রানা। জানে, সময় উপস্থিত। বাইরে বেরুবার আগে জাহেদ জেনে গেছে যে ও আসলে ডাক্তার নয়। এখন দেখা যাক, কি প্রতিক্রিয়া হয়। বাক্সটার গায়ে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও; ঘুরে জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠিটা দরজা দিয়ে

বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েও থেমে গেল। দু কোমরে হাত রেখে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন, সেই অসহিষ্ণু, উদ্ধত ভঙ্গি। দু চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে যেন। তার পিছনে রাশেদ, গোরা, সোলায়মানসহ আরও কে কে যেন আছে। ক্যাপ্টেনের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে রানাকে।

'কে তুমি?' হিস্ হিস্ করে উঠল ক্যাপ্টেন।

চোখেমুখে একটা ড্যাম কেয়ার ভাব রানার। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'যাক, ভুলটা ভেঙেছে তাহলে!'

'অনর্থক সময় নষ্ট করছ আমার। এখনও ভালভাবে জানতে চাইছি, উত্তর দাও।'

লম্বা করে দম নিল রানা, উঠে জাহেদের মুখোমুখি হলো। তার ঠিক পিছনেই জিনিয়ার সুন্দর মুখটার ওপর চোখ পড়ল, চাউনি আগের মত নেই মেয়েটার, পাল্টে গেছে কেমন যেন। 'সময়ের কথা যদি ওঠে, তো আমি নই, বরং তুমিই আমার সময় নষ্ট করেছ, জাহেদ।'

থমকে গেল জাহেদ, চট্ করে ভুরু কুঁচকে উঠল। বোঝা গেল রানার মুখ থেকে তুমি শুনতে হবে, এটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না একেবারেই। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সে, সেই সাথে শুধরে নিল সম্বোধনটাও। 'সোজাসুজি উত্তর দিন, কেন মিথ্যে ডাক্তার সেজে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করলেন?'

'ওটা আপনার বোঝার ভুল। আমি বরং বারবার সতর্ক করেছি আপনাকে।'

'বাজে কথা বলে পার পাবেন না। আপনি বলেছেন, আপনি হাসান, বলেননি?'

'হ্যাঁ, বলেছি। এখনও বলছি আমি হাসান।'

'মানে হচ্ছে, আপনি মাহমুদুল হাসান, অথচ ডাক্তার নন, এই তো?'

'হ্যাঁ, তাই। আমি ডাক্তার নই, এবং মাহমুদুল হাসানও নই।'

'কি!' এক পা এগিয়ে এল জাহেদ। 'কি বললেন?'

'আমি মাহবুবুল হাসান,' বলেই বুঝল, একটু আগের সেই আত্মবিশ্বাসী ভাবটা পলকে উধাও হয়ে গেছে ক্যাপ্টেনের। 'এবং আমি ডাক্তার নই। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, আপনার সেই ডাক্তার কেন ফ্লাইট মিস করেছে, আমি জানি।'

চোখ ছোট হয়ে এল ক্যাপ্টেনের। প্রশ্নটা অজান্তেই বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে, 'কেন?'

'এয়ারপোর্টে আসার পথে একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে সে।'

'কি করে জানলেন আপনি?'

পাজেরো জীপটার দুর্ঘটনায় পড়ার আগে-পরের ঘটনা সংক্ষেপে বলল রানা। সেই সাথে যোগ করল, 'পিছন থেকে হর্ন না বাজালে হয়তো ফিরে চাইতাম না আমি, সেক্ষেত্রে ওটার উইন্ডশীল্ডের রেড ক্রিসেন্ট প্রতীকটাও দেখতে পেতাম না। ভেজা রাস্তায় ওটার দ্রুত ছোটা দেখে ভেবেছিলাম

হয়তো কোন সিরিয়াস রোগী দেখতে যাচ্ছে ডাক্তার। কিন্তু পরে বুঝলাম, আসলে প্লেন মিস্ করার আশঙ্কাতেই...'

'পরে বুঝলেন মানে? কখন বুঝলেন?'

'আপনি বাইরে যাওয়ার একটু আগে, যখন বললেন একজন ডাক্তারের পিস্তলের কি প্রয়োজন, তখন। তার আগ পর্যন্ত আপনার রেডিওম্যানকেই ডাক্তার বলে জানতাম।'

কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকল ক্যাপ্টেন। মাথাটা সামান্য কাত করে নিষ্পলক চেয়ে থাকল ওর দিকে। 'মানলাম, না হয় আমার ভুলই হয়েছে। কিন্তু আপনি যে নিজেকে মাহবুবুল হাসান বলে দাবি করছেন, প্রমাণ করতে পারবেন তা?'

'কি করে? পাসপোর্ট টিকেট থাকলে তো! তাছাড়া আপনি যাকে আশা করছিলেন, আমি সে নই, এটুকুই তো আপনার জন্যে যথেষ্ট।'

'তাই ভাবছেন বুঝি?' টিটকিরির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জাহেদ, 'তাতেই সব সমাধান হয়ে গেল?'

'কি! বুঝলাম না।'

'টিকেট পাসপোর্ট হারানোর ব্যাপারটা আদৌ সত্যি কি না, আমি জানি? আপনি বলেছেন, শুনেছি। ভেতরে কি আছে কে জানে?'

'কি থাকতে পারে বলে ভাবছেন আপনি?' সিগারেটের অবশিষ্টাংশ মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল রানা। কপাল কুঁচকে চেয়ে আছে ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে।

'কেন এসেছেন এদেশে?'

'কি?'

'এদেশে কেন এসেছেন? মৃত ডাক্তারের ব্যাগটা আপনার হাতে কেন? কিভাবে হাতালেন ওটা?'

চরম বিরক্তিতে রানার চোখমুখ কুঁচকে উঠল। 'মর জ্বালা! স্ক্রু সবগুলো ঠিক আছে তো আপনার আপার চেম্বারে?'

কিন্তু জাহেদ মোটেই রাগল না। আগের মতই একঘেয়ে সুরে বলল, 'ডাক্তার ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করে না ওই ব্যাগ।'

'করে না বলে যে কখনও করা যাবে না, এমন কোন নিষেধাজ্ঞাও তো নেই।'

'ঠিক ওই ধরনেরই ব্যাগ ব্যবহারের কি এমন প্রয়োজন পড়ল আপনার? কি আছে ওতে?'

'ওর মধ্যে...,' রাশেদের ওপর নজর যেতে থেমে গেল রানা।

'হ্যাঁ, কি আছে ওর মধ্যে?'

'একটা বিশেষ আইটেম।'

'আমিও তাই জানতে চাইছি, আইটেমটা কি?'

'আমাদের রেঙ্গুন এমব্যাসির কমিউনিকেশন সেকশনের একটা মেশিনের পার্ট। হাইলি ক্লাসিফায়েড।'

'বিশ্বাস করলাম না।'

'বেশ তো। সঙ্গে যখন অয়্যারলেস সেট আছেই, ওদের সাথে যোগাযোগ করলেই জানতে পারবেন সত্যি কি মিথ্যে।'

'জানা হয়ে গেছে,' ক্রূর এক চিলতে হাসি ফুটল জাহেদের ঠোঁটের কোণে।

'মানে?'

'আপনার দাবি যদি সত্যিই হত, প্লেনে বসেই পাসপোর্টটা কেন দেখালেন না? কেন তখনই ভুলটা ভাঙিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেননি আমার?'

'অনেকবার চেষ্টা করেছি, কোন কথাই কানে তোলেননি আপনি,' এক পা এগোল রানা। 'চলুন, আমি নিজে যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি আপনাকে এমব্যাসির সাথে।'

'দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হবেন না,' সন্দেহের মেঘ আরও ঘনীভূত হলো ক্যাপ্টেনের মুখে। 'অয়্যারলেসে কিভাবে কথা বলতে হয় জানেন আপনি?'

রাগে দাঁতে দাঁত ঘষল রানা, ক্যাপ্টেনের সবজান্তা ভাব দেখে পিত্তি জ্বলে গেল। 'আপনি নিজেই অহেতুক সময় নষ্ট করছেন। কথা না পেঁচিয়ে যান, কথা বলুন রেঙ্গুনের সাথে। বলবেন, আমি হাসান, স্পেশাল কুরিয়ার, ক্যারিইং রোটর প্লেট ফর ক্রিপটোসাইফার মেশিন।'

'ক্রিপটোসাইফার!' ভুরু নাচাল জাহেদ, 'সেটা কি?'

'আপনি চিনবেন না। নামও শোনেননি কোনদিন।'

'ভেরি স্মার্ট,' বিড়বিড় করে বলল ক্যাপ্টেন। পিছন ফিরে হাঁক ছাড়ল, 'জসিম!'

দরজার বাইরেই ছিল লোকটা। 'জ্বি, ক্যাপ্টেন।'

'রেঙ্গুনের সাথে কথা বলুন।'

'কিন্তু...স্যার...'

'জানি, রেডিও সাইলেন্স পিরিয়ড চলছে। কিন্তু উপায় নেই, কথা বলতেই হবে। ইমারজেন্সি ফ্রিকোয়েন্সিতে কথা বলুন। লাগলে র‍্যামরড রিমোটও ব্যবহার করতে পারেন। জিজ্ঞেস করবেন, হাসান নামে কারও ঢাকা থেকে আসার কথা ছিল কিনা একটা মেশিনের পার্ট নিয়ে।'

'রাইট, ক্যাপ্টেন,' ছুটল জসিম।

ঠিক দু মিনিটের মাথায় ফিরে এল লোকটা। দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে।

'ওয়েল,' তার দিকে চেয়ে আছে জাহেদ। 'কথা হলো?'

শূন্য দৃষ্টিতে রানার মাথার ওপর দিয়ে পিছনের দেয়াল দেখছে রেডিওম্যান। 'জ্বি।'

'কি বলে?'

'বলে এ ব্যাপারে তাদের কিছু জানা নেই।'

তাজ্জব হয়ে গেল রানা উত্তর শুনে। বলে কি! জানা নেই মানে? রাহাত খান খবর দেননি ওদের? জিজ্ঞেস করল ও, 'কার সাথে কথা বলেছেন? কমিউনিকেশন অফিসারকে জিজ্ঞেস করুন।'

'ওনাকে পাইনি। ওনার সহকারীর সাথে কথা হয়েছে।'

'সে হয়তো জানে না,' বলল বটে রানা, কিন্তু আগের মত জোর পেল না গলায়।

আচমকা বিস্ফোরিত হলো ক্যাপ্টেন। 'ইউ ডার্টি লায়ার! তোমার তাই মনে হচ্ছে, না? ভেবেছিলে ডাক্তারকে খুন করে নকল ডাক্তার সেজে আমার মিশন স্যাবোটাজ করবে? ভণ্ডুল করে দেবে সব?' ঝট্ করে পুলিস স্পেশালটা বের করল সে।

'থামুন!' শান্ত গলায় বলল রানা। 'পাগলের প্রলাপ বকছেন আপনি। ব্রিগেডিয়ার জলিল কি দেখে আপনার ওপর এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা মিশনের ভার দিল, বুঝতে পারছি না।'

'আচ্ছা! ব্রিগেডিয়ারের নামও জানেন দেখছি, বাহ্!'

'হ্যাঁ, জানি। তিনিও খুব ভালই চেনেন আমাকে। যান, এবার তাঁর সাথেই কথা বলুন গিয়ে। বলবেন, আহাম্মকের মত একটা কাজ করেছেন আপনি। বিসিআইয়ের এজেন্ট...'

আর সহ্য করতে পারল না জাহেদ, অস্ত্র উল্টো করে ধরে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর। ধাঁই করে নামিয়ে আনল ওটা রানার কপাল লক্ষ্য করে। এ ধরনের একটা কিছুর জন্যে মনে মনে তৈরিই ছিল রানা, বাঁ হাত তুলে আঘাতটা ঠেকিয়ে দিল মাঝপথে, সেই সাথে ডান পা ভাঁজ হয়ে বিদ্যুৎগতিতে উঠে গেল ওপরদিকে।

'হুঁক্' করে অপার্থিব একটা গোঙানি বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেনের গলা দিয়ে, অস্ত্র ফেলে দুহাতে দুই উরুর মাঝখানটা চেপে ধরে দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে। পাগলের মত রানার পায়ের সামনের মাটি শুঁকতে লাগল। ব্যথায় নীল হয়ে গেছে মুখ, গলার দুপাশের রগ ফুলে উঠেছে। হাঁ করে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে।

আর সবাই যেন বজ্রাহত হয়েছে। নড়ছে না কেউ একচুল, সম্মোহিতের মত চেয়ে আছে ক্যাপ্টেনের দিকে। প্রচুর সময় লাগল তার আঘাতটা সামলে নিতে। ব্যথার তীব্রতা কমে আসতে ধীরে ধীরে বাক্সটার ওপর উঠে বসল সে হাঁপাতে হাঁপাতে। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে। রুমাল বের করে মুখ মুছে নিল জাহেদ। একবারও তাকাচ্ছে না রানার দিকে, ভাব করছে যেন কিছুই হয়নি।

দরজার দিকে ফিরে নরম গলায় ডাকল সে, 'জসিম!'

'জ্বি, স্যার?' ভয়ে ভয়ে এক পা এগোল রেডিওম্যান।

'লোটাসের সাথে যোগাযোগ করুন,' রানার দিকে ফিরল। 'কি বললে চিনবেন চীফ? কোড নম্বর কত?'

'এম আর নাইন, মাসুদ রানা।'

'মাসুদ রানা!' চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া হলো না ক্যাপ্টেনের। 'মাহবুবুল হাসান নয়?'

উত্তর দিল না রানা। অপলক চেয়ে আছে লোকটার দিকে।

'ঠিক আছে,' জসিমকে বলল সে। 'বিগ ব্রাদারকে নামটা কনফার্ম করার

রিকোয়েস্ট করবেন। তাড়াতাড়ি!'

'জ্বি।' সামনে থেকে পালাতে পেরে বেঁচে গেল যেন লোকটা।

ঝুঁকে পায়ের কাছে পড়ে থাকা পুলিস স্পেশালটা তুলে নিল জাহেদ। রুমাল দিয়ে ওটার গায়ে লেগে থাকা ধুলো মুছে নিয়ে বলল, 'জসিমের ফিরতে সময় লাগবে। ততক্ষণ বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। ব্যাগটা খুলুন, কি আছে ওতে দেখব আমি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'সম্ভব নয়।'

'কি!'

'ব্যাগটায় সেলফ ডেস্ট্রাক্টিভ বোমা ফিট করা আছে। খুলতে হলে হ্যান্ডেলের দুই জয়েন্টের কাছের দুটো ছিদ্রে দুটো সেফটিপিন ইনসার্ট করতে হয় বোমা ডিজআর্ম করার জন্যে। পিন দুটো খুঁজে পাচ্ছি না। ঢাকায় নেয়া ছাড়া খোলার কোন উপায় নেই ওটা।'

'গোরা!'

ভেতরে ঢুকে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল গরিলা। 'স্যার!'

'ধরো হারামজাদাকে!'

নড়ল না গোরা। আমতা আমতা করতে লাগল। 'স্যার, যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা বলতাম, ক্যাপ্টেন।'

রক্তচক্ষু মেলে ওর দিকে চাইল জাহেদ। 'কি কথা?'

'জিনিয়া ম্যাডামের ওখানে ছোট একটা পিন পড়ে থাকতে দেখেছিলাম আমি কার্পেটের ওপর। হাসান সাহেবের অজ্ঞান দেহের পাশেই পড়ে ছিল। পিনের ব্যাপারটা আমার মনে হয় সত্যি হতেও পারে।'

ঘরের চাল উড়ে যাওয়ার জোগাড় হলো ক্যাপ্টেনের তীক্ষ্ণ ধমকে। 'শাট আপ, ইউ ব্লাডি সোয়াইন! আই সে, গ্র্যাব হিম!'

কেঁপে উঠল গোরা, এক লাফে রানার পিছনে এসে দাঁড়াল। দুই বিশাল থাবা দিয়ে চেপে ধরল রানার দুই বাহু। থাবা দিয়ে রোটরকেস তুলে নিয়েছে ততক্ষণে জাহেদ। বাক্সের ওপর ওটা রেখে ঝুঁকে পড়ল তার ওপর। নিজেকে ছাড়াবার জন্যে উন্মত্তের মত টানা-হেঁচড়া শুরু করল রানা, কিন্তু লাভ হলো না। এক চুলও শিথিল হলো না তাতে গরিলার বজ্রমুষ্টি।

'দাঁড়ান!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'খবরদার খুলবেন না ব্যাগ! প্রাণে বাঁচবেন না...।'

পাত্তা দিল না জাহেদ। পকেট থেকে একটা কমান্ডো ছুরি বের করে বাঁ দিকের ল্যাচের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে জোরে চাড় দিল সে, মট্ করে ভেঙে গেল তালাটা।

'এখনও বলছি ওটা খুলবেন না, জাহেদ!' আতঙ্কে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে রানার। ওর ভেতরের বোমাটা কতখানি শক্তিশালী, জানে না ও। ওটা বিস্ফোরিত হলে আশপাশের সবাই মরবে কি না, কে জানে। 'ওর ভেতর কিছু নেই, খালি।'

দ্বিতীয় ল্যাচের ভেতর ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছে ততক্ষণে জাহেদ। থেমে গেল

কথাটা শুনে। 'কিছু নেই মানে?'

'এখন খালি ওটা, তবে সত্যিই রোটর ছিল ভেতরে। এই যে, আমার এই পকেটে আছে ওগুলো।'

ওর কোটের ভেতরের পকেট থেকে দুটো পলিথিনের ছোট্ট প্যাকেট বের করে আনল জাহেদ। খানিক উল্টেপাল্টে দেখল প্যাকেট দুটো। 'এগুলো রোটর?'

'হ্যাঁ।'

'কেস থাকতে আপনার পকেটে কেন এগুলো?'

'প্লেনে ওঠার পর আমার সঙ্গে আপনার গায়েপড়া আচরণ দেখে সন্দেহ হয়েছিল আমার। বারবার ব্যাগটার দিকে চাইছিলেন আপনি, তাই বের করে পকেটে রেখেছিলাম।'

জাহেদের চেহারা দেখে মনে হলো হাসবে কি কাঁদবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। 'সন্দেহ করেছিলেন? আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, মানলাম। এখন তাহলে কিছুই নেই এর মধ্যে?'

'না।'

ব্যাগটা উঁচু করে দোলাল ক্যাপ্টেন, 'এত ভারী কেন?'

'কিছু খবরের কাগজ…'

'তাই, না?' রানার চোখে চোখ রেখে ধাঁই করে বাঁ হাতের কিনারা দিয়ে ছুরির বাঁটে মারল জাহেদ। আবার 'মট্' শব্দ উঠল। কিন্তু কোন বিস্ফোরণ ঘটল না। এতক্ষণ ধোঁকা দেয়া হচ্ছিল বুঝতে পেরে বিজয়ীর হাসি ফুটল তার মুখে। রানার চোখ সেঁটে আছে ব্যাগটার ওপর, ভাল মানুষের মত দাঁড়িয়ে আছে ওটা চুপচাপ। কি বলল তাহলে সোহেল? নিজেকে বোকা বোকা লাগল ওর। নিরাপত্তার কথা ভেবে এতক্ষণ খামকাই চেঁচিয়েছে তাহলে ষাঁড়ের মত!

এই সময় ওঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল রেডিওম্যান। দৌড়ে আসছে চেঁচাতে চেঁচাতে, 'স্যার, লোটাস বলছে উনি সত্যিই মাসুদ রানা, বিগ…' মুখের কথা শেষ করতে পারল না লোকটা। দু হাতে টান দিয়ে ব্যাগ খুলে ফেলেছে তখন ক্যাপ্টেন, সাথে সাথে ভেতরে হালকা একটা 'ক্লিক' শব্দ হলো—সার্কিট পুরো হলো ট্রিগারিং মেকানিজমের, পরমুহূর্তেই ঘটল বিস্ফোরণ।

অত্যুজ্জ্বল সাদা একটা আলো, বিকট 'হুপ' শব্দে লাফিয়ে উঠে এল ভেতর থেকে, ধাঁধিয়ে দিল সবার চোখ, একই সাথে ছোট ঘরটার মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল অসহ্য চামড়াপোড়া এক তাপপ্রবাহ। ঘর ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন জাহেদ, দুহাতে মুখ চেপে ধরে আছড়ে পড়ল কাত হয়ে। বাক্সটার কোনায় ঠাস্ করে লাগল মাথার একটা পাশ, কিন্তু কোনরকম ব্যথা সে অনুভব করতে পেরেছে বলে মনে হলো না।

ওদিকে, আলোর ঝলকানি চোখে পড়ামাত্র রানাকে ছেড়ে একলাফে

পিছিয়ে গেল গোরা। গুলি খাওয়া বাঘের মত খোলা দরজা লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে লেফটেন্যান্ট রাশেদ, দোরগোড়ায় দাঁড়ানো তিন চারজনকে নিয়ে হুড়মুড় করে আঙিনায় পড়ল গিয়ে সে।

উপুড় হয়ে পড়ে অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে জাহেদ, প্রচণ্ড আক্ষেপে ক্ষণে ক্ষণে আপাদমস্তক ঝাঁকি খাচ্ছে তার ব্যায়ামপুষ্ট সুঠাম দেহ। টলতে টলতে এগোল রানা, প্রথমেই এক লাথিতে দরজা দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিল জ্বলন্ত ব্যাগটা। আশপাশের খড়কুটোয় যেটুকু আগুন লেগেছিল, পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে ফেলল তা। কিন্তু ব্যাগের আগুন নিভল না, বরং বাড়তে লাগল ক্রমেই। থারমাইট প্লাস্টিক জোড়া পলিউরেথিন কেসটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল দেখতে দেখতে, সেই সাথে ভেতরের কিছু খবরের কাগজও।

ঘুরে জাহেদের দিকে তাকাল ও। মুখ থেকে নিয়ে গলা বুক পুড়ে কালো হয়ে গেছে। চুল ভুরু সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন আর জোরে চ্যাঁচাতেও পারছে না লোকটা, ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছে গলার স্বর। শুধুমাত্র জেদের বশে এভাবে নিজের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ডেকে আনল নির্বোধ লোকটা, ভাবল রানা। বিনা চিকিৎসায় সবার অসহায় দৃষ্টির সামনে ধুঁকে ধুঁকে মরতে চলেছে জাহেদ, অথচ করার কিছুই নেই।

নয়

দু হাত এক করে মুঠি পাকিয়ে তার ওপর আলতো করে থুত্নি রেখে বসে আছেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। মুখোমুখি বসে আছে সোহেল।

'বুঝলাম,' বললেন বৃদ্ধ। 'কিন্তু তোমার এরকম সন্দেহের কারণ কি?'

ওই দিনের ঢাকার এক ইংরেজি দৈনিক, 'সানলাইট' পত্রিকা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল সোহেল। প্রথম পাতায় বড় করে একটা সড়ক দুর্ঘটনার সচিত্র খবর ছাপা হয়েছে। খবরটা পড়লেন মেজর জেনারেল। বলা হয়েছে: গতকাল রাত আনুমানিক পৌনে নটার সময় তেজগাঁও বিজি প্রেস চতুর্থ শ্রেণী স্টাফ কোয়ার্টারের কাছে এক মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ মাহমুদুল হাসান (৩৬) এবং তাঁর গাড়ির ড্রাইভার ঘটনাস্থলেই নিহত হন ইত্যাদি ইত্যাদি।

চোখ তুললেন বৃদ্ধ। 'তারপর?'

'এয়ারপোর্টে গিয়ে যতদূর সম্ভব জানার চেষ্টা করেছি, কিন্তু রাতের শিফটের কোন সিনিয়র অফিশিয়াল না থাকায় বেশ ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে। পরে একজন অফিসারের বাসার ঠিকানা নিয়ে তার সাথে গিয়ে দেখা করি। জিজ্ঞেস করি, কাল রাতের বিজি ০৭৬ ফ্লাইট ঠিকমতই ফ্লাই করেছিল কি না। প্রশ্নটা শুনেই কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা। ব্যাপার রহস্যজনক মনে হতে নিজের পরিচয় দিয়ে চেপে ধরলাম তাকে। শেষে

স্বীকার গেল সে, ফ্লাইট কাল সময়মতই টেক অফ করেছে, তবে তার আগে ওটাকে ঘিরে বেশ কিছু রহস্যময় ব্যাপার-স্যাপার ঘটে গেছে।'

'আচ্ছা!'

'জ্বি। কিন্তু আর কিছু জানাতে কিছুতেই রাজি করানো গেল না লোকটাকে। বলল, এ প্রসঙ্গে মুখ খুললে চাকরি চলে যাবে। আমাকে সে বিমানের জি এম অপারেশনের সাথে কথা বলার পরামর্শ দিল। এলাম মতিঝিল। ওখানেও একই ঢাক ঢাক গুড় গুড় অবস্থা। ভদ্রলোকের পরিষ্কার কথা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ছাড়া জানানো যাবে না কিছুই। পরে ওখান থেকে ফোন করলাম মিনিস্ট্রিতে, মন্ত্রী নিজে তাকে ঘটনা খুলে বলার নির্দেশ দিতে তবে জানলাম ব্যাপারটা। ঘটনা হচ্ছে, বিনা টিকেটে বিনা পাসপোর্টে চারজন যাত্রী যাওয়ার কথা ছিল কাল রেঙ্গুনে, ওই ফ্লাইটে। তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিমানের কাছে গোপন নির্দেশ আসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের।

'প্রথমে তাদের তিনজন এসে পৌঁছায় এয়ারপোর্টে। অন্যজন পৌঁছায় বিমান ছাড়ার ঠিক দু মিনিট আগে। হাতে একটা ব্রীফকেস আর একটা ব্যাগ ছিল লোকটার। ওই ব্যাগের জন্যে সবাই তাকে ডাক্তার বলে ধরে নেয়। ওখানে কারও কোন বর্ণনা না পেয়ে আবার গেলাম সেই অফিসারের বাসায়। জি এম কে দিয়ে আগেই টেলিফোন করিয়েছিলাম তার বাসায়, যাতে কোন তথ্য আর গোপন না করে লোকটা। শেষের এই লোকের যে বর্ণনা দিল সে, তাতে বুঝলাম এ রানা। ঠিক নটায় প্লেনে উঠেছে রানা। আর···প্রথম তিনজনের মধ্যে একজনের যে বর্ণনা পেয়েছি, তাতে আমি শিওর, লোকটার নাম গোরা, আর্মি ইন্টেলিজেন্সের কমান্ডো গ্রুপের সদস্য। ছোটখাট একটা গরিলা বলা যায় লোকটাকে, স্যার।'

'বুঝলাম,' পাইপটা ধরালেন রাহাত খান। 'কিন্তু রানার নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ কি? আর এর সাথে এই রিপোর্টেরই বা কি সম্পর্ক?'

'নিহত এই ডাক্তারের নাম মাহমুদুল হাসান, আর রানার ছদ্মনাম ছিল মাহবুবুল হাসান, এই গেল এক পয়েন্ট। দু নম্বর, খুব দ্রুতগতিতে ছুটছিল ডাক্তারের জীপ গাড়ি। তিনদিনের বৃষ্টিভেজা পিচ্ছিল রাস্তায় এত জোরে গাড়ি ছুটিয়ে কোথায় যাচ্ছিল সে? এত কিসের ব্যস্ততা ছিল তার? দুর্ঘটনার সময়টার কথাও এখানে ভেবে দেখতে হবে, স্যার, রাত তখন পোনে নয়টা। আমার ধারণা ওই চার বিনা টিকেটের যাত্রীর শেষজন ছিল এই ডাক্তার। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। প্লেন মিস হতে পারে, এই ভয়েই অমন বিপজ্জনক গতিতে ছুটছিল তার গাড়ি। সম্ভবত, কোন বিশেষ মিশন নিয়ে রেঙ্গুন গেছে ওরা। এমন এক মিশন, যাতে একজন হার্ট স্পেশালিস্টকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এদিকে, প্রথমে তিনজন আগেই পৌঁছেছিল বিমানবন্দরে, অপেক্ষা করছিল তারা বাকি একজনের জন্যে। কিন্তু সময়মত যায়নি সে, তার বদলে গেছে মাসুদ রানা। এইখানটাই ভেবে দেখার মত, ডাক্তার একজন যাওয়ার কথা ছিল মিশনের সাথে, হয়তো তাকে চিনত না অন্য তিনজন, দেখেনি কখনও সামনাসামনি। তাই রানা বিমানে উঠতে ভুল করে ওকেই সেই ডাক্তার বলে ধরে নেয় ওরা।

রানাই ছিল শেষ যাত্রী। অন্যদের মত...,'

একটা হাত তুলে সোহেলকে বাধা দিলেন রাহাত খান। ভুরু কুঁচকে ভাবছেন কিছু একটা। আচমকা প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। 'গুড গড! ওটা আর্মি ইন্টেলিজেন্সেরই মিশন, মেজর জেনারেল ইবরাহিমকে রেসকিউ করতে গেছে ওরা। মনে পড়েছে, ইবরাহিম হার্টের রোগী...অনেকদিন থেকে...জলদি ফোন করো ব্রিগেডিয়ার জলিলকে,' নিজের লাল রঙের বিশেষ টেলিফোন সেটটা এগিয়ে দিলেন বৃদ্ধ সোহেলের দিকে।

দ্রুত ছয়টা পুশ বাটন টিপে রিসিভার ধরে বসে থাকল ও। শাহীনবাগের কথিত সেই শিল্প অধিদফতরের সচিবের টেলিফোন বেজে উঠল ঝন্‌ঝন্‌ করে। দুবার রিঙ হতে রিসিভার তোলা হলো। একটা পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'হ্যালো!'

'দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে,' গম্ভীর গলায় আইডেন্টিফিকেশন কোড আওড়াল সোহেল। 'এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করতে চাই। বিগ ব্রাদারকে দিন।'

'কে বলছেন, স্যার?'

'সোহেল আহমেদ, ন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানি থেকে।'

'একটু ধরুন, প্লীজ,' লাইনে পর পর দুটো 'খুট্' আওয়াজ উঠল। তারপরই ভেসে এল ব্রিগেডিয়ার জলিল ওরফে বিগ্ ব্রাদারের কণ্ঠ, 'হ্যাল্লো, মাই ডিয়ার!'

'স্লামালেকুম। আর কে-র সাথে কথা বলুন।'

রিসিভার সোহেলের হাত থেকে নিয়ে কানে লাগালেন বৃদ্ধ। 'হ্যালো!'

'স্লামালেকুম, স্যার! কেমন আছেন?' ব্রিগেডিয়ারের উল্লসিত গলা শোনা গেল।

'আগে কাজের কথা সেরে নিই, জলিল। কাল রাত নটার ট্রেনে মাহবুবুল হাসান নামে এক ডাক্তারকে আমার দেশের বাড়ি পাঠিয়েছিলাম, আমার বড় ভাইকে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। ভাই হার্টের রোগী। আজ খবর নিয়ে জানলাম পৌঁছায়নি সেখানে ডাক্তার। শুনেছি ওই ট্রেনে তোমার নাকি চার কম্পাউন্ডারের যাওয়ার কথা ছিল, অথচ গেছে তিনজন। মনে হয় ভেতরে কোন প্যাঁচ লেগে গেছে।'

একটু থামলেন রাহাত খান। কিছু বলছেন না ব্রিগেডিয়ার। কেবল তাঁর ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের আওয়াজ পাচ্ছেন তিনি। 'বুঝতে পারছ, কি বলতে চাইছি আমি?'

ও প্রান্তে গায়ের জোরে রিসিভারটা কানের সাথে ঠেসে ধরে আছেন ব্রিগেডিয়ার। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না তাঁর। কারণ একটু আগেই জাহেদকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি, ওই ডাক্তার ভুয়া।

'জলিল?'

'জ্বি, জ্বি, স্যার! বুঝেছি,' সচকিত হলেন ব্রিগেডিয়ার, 'স্যার, আপনার ওই ডাক্তারের এনলিস্টমেন্ট নাম্বার কত?'

'এম আর নাইন।'

'ওম্ মারে মা, মইচ্ছি!' আতঙ্কে মুখ দিয়ে খাস মাতৃভাষা বেরিয়ে এল ভদ্রলোকের। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি, 'আপনি ফোন রাখেন, স্যার। আমি নিজেই করব একটু পর···এই মিনিট দশেক পর, কেমন? আমার লোকদের সাথে একটু কথা বলতে হবে। রাখলাম, স্যার,' দড়াম করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন আর্মি ইন্টেলিজেন্স চীফ।

অয়্যারলেস সেটের সামনে মূর্তির মত বসে আছে মেজর আনোয়ারুল ইসলাম। নজর সেঁটে আছে বাস্কহেডের গায়ে। পলক নেই চোখে। এ কী ভেল্‌কি! ভাবছে সে, একবার বলে ডাক্তার লোকটা ভুয়া, যে কোন ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে তার ব্যাপারে। পরমুহূর্তেই বলছে ওই লোক খুবই গুরুত্বপূর্ণ—ঢাকার এক বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নাকি সে, নাম মাসুদ রানা।

সবে ট্রান্সমিশন শেষ করেছে মেজর, ঢাকার বার্তা ফ্যালকনকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। অনেকক্ষণ পর ধ্যানভঙ্গ হলো মেজরের। দেখা যাক, একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবল, আবার কোন্ তেলেসমাতি বার্তা আসে।

ওদিকে 'জননী' আরও আগেই ঢুকে পড়েছে বর্মী জলসীমায়। আকিয়াবের কাছাকাছি অবৈধ মাছ ধরায় ব্যস্ত এখন সে।

এর একটু পর, সাড়ে এগারোটার দিকে রেঙ্গুনের এক হাসপাতালে ঘুম ভাঙল উ উইনের। নানারকম ওষুধ ইনজেক্ট করে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই ঘুম ভাঙানো হলো তার। এবং এর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গতরাতে মিঙ্গালাদনে ঠিক কি ঘটেছিল, জানা হয়ে গেল কর্নেল মঙের।

গায়ের ওপর থেকে আবদুর রহমানকে ঠেলে ফেলে দিয়ে একদৌড়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল জিনিয়া। 'ইশ্‌শ্!' সভয়ে দুহাতে চোখ ঢাকল জাহেদের মুখের দিকে তাকিয়ে। তার বুক গলা আর মুখমণ্ডলের এক পরতা চামড়া উঠে গেছে পুরোপুরি—চেহারাটা ভয়ঙ্কর লাগছে।

রানা ঝুঁকে বসে আছে তাকে আঁকড়ে ধরে। পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল ও। 'ফার্স্ট এইড···ফার্স্ট এইড কিট্ আছে?'

'আছে, ট্রাকে,' পিছন ফিরে চেঁচিয়ে কাউকে আনতে বলল সে ওটা। তারপর এগিয়ে এসে হাঁটু মুড়ে বসল রানার পাশে, 'কি অবস্থা···'

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল আবদুর রহমান। হাঁপাচ্ছে ফোঁস ফোঁস। দু হাতে ছোট একটা কাঠের বাক্স। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়েই চোখ কপালে উঠল তার, ঝট্‌পট্ বাক্সটা খুলে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল জাহেদের সামনে। ভীষণভাবে মোচড় খাচ্ছে তার দেহটা, একনাগাড়ে গোঙাচ্ছে। সামাল দিতে পারছে না রানা।

বাক্সের ভেতর থেকে বড় এক শিশি বের করল আবদুর রহমান। মেটে রঙের ঘন তরল পদার্থ দেখা যাচ্ছে ভেতরে। ডান হাতের তালুতে তার অনেকখানি ঢেলে নিয়ে প্রথমে জাহেদের সারামুখে তেলের মত ডলে ডলে

মাখিয়ে দিল সে।

'কি ওটা?' জানতে চাইল রানা।

লোকটাকে জিজ্ঞেস করে জিনিয়া জেনে নিল প্রথমে, তারপর বলল, 'বুনো লতাপাতার রস দিয়ে তৈরি একটা পেস্ট। কাটা, ছেঁড়া আর পোড়া ঘা-র জন্যে খুব উপকারী।'

সারা বুক আর গলায় পুরু করে মাখিয়ে দেয়া হলো পেস্টটা। এরপর তুলো গজ বের করে তিনজনে মিলে তার গলা আর সারামাথা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল অদক্ষ হাতে। শুধু দু চোখ আর ঠোঁট উন্মুক্ত থাকল। সবশেষে বুক। প্রচুর সময় লাগল কাজটা সারতে। বাক্সটার মধ্যে হাতড়াল রানা মরফিনের আশায়। কিন্তু নেই ও জিনিস। থাকলে বড় ভাল হত। লোকটাকে এ অসহ্য যন্ত্রণা থেকে খানিকটা হলেও মুক্তি দেয়া যেত।

হঠাৎ নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল জাহেদের। চিত হয়ে চোখ মেলে চেয়ে আছে। ডান হাত তুলে দু চোখ ডলল সে। ওদের চমকে দিয়ে কর্কশ, ফ্যাসফেঁসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এত ধোঁয়া কেন ঘরের মধ্যে? যাচ্ছে না কেন ধোঁয়া!'

রানার দিকে ফিরল জিনিয়া। বুঝতে পেরেছে, চোখ দুটো তো গেছেই, ভোকাল কর্ডও গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। এখন আর বিন্দুমাত্র রাগ নেই ওর জাহেদের ওপর, উল্টে বরং মনটা খারাপ হয়ে গেছে। ভাবল, সত্যি সত্যি যদি ডাক্তার হত ও, চেষ্টা করে দেখত বাঁচানো যায় কি না ক্যাপ্টেনকে।

'কি করা যায় বলুন তো?' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে উঠল রাশেদ। 'ধারেকাছে কোন হাসপাতাল বা তেমন আধুনিক ক্লিনিক, কিছুই নেই। কি করে চিকিৎসা করানো যায়?'

পিছন ফিরল রানা। 'হাসপাতাল কত দূরে?'

'পঞ্চাশ মাইলের কম নয়,' বলল সে। 'ইরাবতির ওপারে।'

'এতদূর! পথে কোন বিপদ আপদ যদি না-ও হয়, রাস্তার যা অবস্থা, গাড়ির ঝাঁকিতেই তো...নাহ্‌, সম্ভব না।' কি একটু ভাবল রানা। তারপর রাশেদের পাশে দাঁড়ানো রেডিওম্যানের দিকে তাকাল। 'আপনার অপারেশন মনিটরের সঙ্গে কথা বলুন এখনই। ক্যাপ্টেনের অবস্থা খুলে জানান। ইমিডিয়েট হেল্‌প্‌ পাঠাতে বলবেন।'

'কিন্তু, আমার মনে হয়...'

কড়া এক ধমক মেরে লোকটাকে থামিয়ে দিল রানা। ভরাট, কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে বলল, 'আপনার কি মনে হয় তা জানতে চাইনি আমি। আপনাদের টীম লীডার মারা যেতে বসেছে, তার জন্যে সাহায্য দরকার। যান, যা বলছি করুন গিয়ে।'

চোখ নামিয়ে অনবরত গোঙাতে থাকা ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল লোকটা। তারপর ধীরপায়ে হেঁটে চলে গেল।

লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরল রানা। 'কি করবেন এখন? আমার মনে হয়

না মিশন চালানো সম্ভব হবে, আপনিও তা বুঝতে পারছেন।' জিনিয়ার উদ্দেশে বলল, 'আপনার কি মনে হয়?'

'বুঝতে পারছি না,' বিড়বিড় করে বলল মেয়েটা। 'বাবাও এসে পড়বেন আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। এদিকে...'

গোঙানি থেমে গেল জাহেদের। কথাগুলো শুনতে পেয়েছে সে। শূন্যে একটা হাত তুলে কিছু ধরতে চাইল, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মিশন...মিশন চলবে। চলতেই হবে!'

ওর হাতটা ধরল রানা। 'কথা বলবেন না।'

কিন্তু থামল না জাহেদ। শুনতে পায়নি, এমন ভাব করে বলল, 'যে ভাবেই হোক...উদ্ধার করতেই হবে...চিতাকে।'

'খেয়াল রাখুন এর দিকে,' জিনিয়াকে বলল রানা। 'আমি দেখি, কি করছে জসিম।'

খামারবাড়িতে এসে ঢুকল ও। কানে এয়ারফোন লাগিয়ে রেডিও কনসোলের ওপর প্রায় উবু হয়ে আছে লোকটা, টেলিগ্রাফ কী-র ওপর আঙুল। একটা পুশবাটন মাইক্রোফোন 'অন' করে সামনে রাখা। রানা পাশে এসে দাঁড়াতে সোজা হলো সে, এক কানের ইয়ারফোন সরিয়ে বলল, 'লোটাসের কোন সাড়া পাচ্ছি না। দেখি...চেষ্টা করে যাচ্ছি। যতটা সম্ভব কম যোগাযোগ করার নির্দেশ আছে তো!' কথার সাথে আঙুল নেচে বেড়াচ্ছে তার কী-র ওপর। কোড ট্যাপ করছে।

'এটা ইমার্জেন্সি, চীফ,' বলল রানা। 'এক-আধটু অনিয়ম হলেও দোষ দেবে না কেউ আপনাকে।'

'বুঝতে পারছি, স্যার। ওই সমস্যার কথা ভাবছি না আমি। ভাবছি এত ঘন ঘন ট্রান্সমিট করতে হচ্ছে, ধরা না পড়ি আবার। কেউ চাইলে খুব সহজেই স্পট্ করতে পারবে আমাদের, যে কোন সাধারণ ট্রানজিস্টর রিসিভারের সাহায্যেই।'

'বুঝি।' রানার কান এড়াল না জসিমের 'স্যার' সম্বোধনটা। 'রেঙ্গুনের সাথে কথা বলেছিলেন তখন আপনি, না?'

'জ্বি। আমার ওপর রাগ করেননি নিশ্চয়ই?'

'নাহ্। কমিউনিকেশন অফিসারকে পেলে এই ঝামেলায় পড়তে হত না। ঢাকা কি বলল, আমার নাম কনফার্ম...'

হাসল রেডিওম্যান। 'তারচে'ও বেশি করেছে, স্যার। আপনার মিশনের ব্যাপারে প্রয়োজনে সবরকম সহযোগিতা দিতে বলেছে আমাদের। কিন্তু...তার তো বারোটা বেজেই গেছে অলরেডি,' পিছন ফিরে ওঘরের খোলা দরজার দিকে চাইল সে। গলা নামিয়ে বলল, 'ভীষণ বদ্‌রাগী ক্যাপ্টেন লোকটা, তেমনি জেদী। অনর্থক জেদ করে নিজেও মরল, মাঝখান থেকে ফাঁসিয়ে গেল আমাদের।'

'ওটা এখন আর কোন ব্যাপার নয়।'

'তবে হ্যাঁ, এরকম দেশপ্রেমিক মানুষ জীবনে খুব কমই দেখেছি আমি,

স্যার। আর···,' হঠাৎ একটা হাত তুলল জসিম। চুপ থাকতে বলছে। অন্য হাত থেমে গেছে কী-র ওপর। 'লোটাস লাইনে আসছে। আপনি কথা বলবেন, স্যার?' মাইক্রোফোনটা এগিয়ে ধরল সে।

মাথা নাড়ল রানা, 'না। আপনিই বলুন। তবে কিভাবে কি ঘটেছে, ডিটেল বলার দরকার নেই। শুধু জাহেদের অবস্থা জানান। আর মেডিকেল সাহায্য পাঠানো সম্ভব কি না জানুন। মিশনের কি হবে, তাও জিজ্ঞেস করবেন।'

'জ্বি,' সরিয়ে রাখা ইয়ারফোনটা জায়গামত বসিয়ে নিল জসিম।

'আপনার এই লোটাস বেজটা কোথায়?'

'সাগরে, স্যার। বঙ্গোপসাগরে।'

'কোন্ ধরনের শিপ? ন্যাভাল?'

'একটা ডেস্ট্রয়ার, আর দুটো ট্রলার। মাছ ধরার।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'এত!'

'একটা ট্রলার ডিকয়। অন্য দুটো···' আবার হাত তুলল সে, 'এসেছে!'

'কথা বলুন।'

মেজর জেনারেলকে উদ্ধারের অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই করেছেন ব্রিগেডিয়ার জলিল, ভাবল রানা। হয়তো ওই জাহাজেই রয়েছে আর একটা স্ট্যান্ড বাই কনটিনজেন্ট, জাহেদের মিশন কোনও কারণে ব্যর্থ হলে তারা দায়িত্ব নেবে। কিন্তু, যদি না থাকে?

ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এল রানা। আঙিনা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেন? চট্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। রাশেদ সোলায়মান আবদুর রহমান কেউ নেই আশপাশে। ওঘরে শুধু জাহেদ আর জিনিয়াকে দেখা যাচ্ছে। চারদিকে চাইল রানা, এইমাত্র সবাইকে দেখে গেছে ও। গেল কোথায়?

ল্যান্ড রোভারের পিছনের দরজা খোলা দেখা যাচ্ছে। ব্যাপার কি! পায়ে পায়ে ওটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। পিছনে মৃদু খসমস আওয়াজ উঠতে ঘুরে তাকাল। গোরা এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে।

'আর সবাই গেল কোথায়?'

হাত তুলে খামারবাড়ির পিছনের অপেক্ষাকৃত ঘন জঙ্গল দেখাল লোকটা। বলল, 'ওদিকে। যে চার স্পাই ধরে আনা হয়েছে, তাদের জেরা করতে নিয়ে গেছেন লেফটেন্যান্ট রাশেদ।'

'ও।'

ক্যাপ্টেনকে উঠে বাক্সটার গায়ে হেলান দিয়ে বসতে দেখে এগোল রানা। পানি খাওয়াচ্ছে ওকে জিনিয়া। কিন্তু ব্যান্ডেজের জন্যে ঠিকমত খেতে পারছে না সে, বেশিরভাগ পানিই পড়ে যাচ্ছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে ব্যান্ডেজ।

'কি বলল লোটাস?' জিজ্ঞেস করল জিনিয়া।

'কথা বলছে জসিম এখনও।'

'আমি···আমি খুব···দুঃখিত, রানা,' ভাঙা ভাঙা গলায় বলল জাহেদ। এখন প্রায় বোঝাই যাচ্ছে না কি বলছে সে, আরও বসে গেছে গলা।

'আপনাকে অবিশ্বাস করে...সত্যিই দুঃখিত!'

'বাদ দিন, যা হওয়ার হয়ে গেছে।' বেরিয়ে গিয়ে একটা কলাপাতা জোগাড় করে নিয়ে এল রানা। ওটার খানিকটা ছিঁড়ে পানের খিলির মত বানিয়ে ধরিয়ে দিল জিনিয়ার হাতে। বলল, 'সরু দিকটা মুখে পুরে ওপর থেকে আস্তে আস্তে পানি ঢালতে থাকুন। যত পারেন, পানি খাওয়ান। ডিহাইড্রেটেড না হয়ে পড়ে।'

ওটা হাতে নিয়ে রানার দিকে চাইল মেয়েটা। 'আমাকেও ক্ষমা করতে হবে, রানা। আমিও আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম।'

'ভুলে যান। অনর্থক ওসব নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। দেখি, জসিমের কথা শেষ হলো কি না।'

ও অর্ধেক আঙিনা পার হওয়ার আগেই খোলা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল রেডিওম্যান। রানার সাথে চোখাচোখি হতে হাসল।

'কি, হয়ে গেল?'

'জ্বি, স্যার।' এবারের 'স্যার' আরও শ্রদ্ধা মিশিয়ে উচ্চারণ করল সে। 'হয়ে গেছে।'

'কি বলে?'

'ওদের বক্তব্য আগে ক্যাপ্টেনকে জানাতে হবে আমার। উনি রিলে করবেন আপনাকে। আপনি, স্যার, কিছু মাইন্ড...'

'অফ কোর্স নট। গো অ্যাহেড।'

'আপনিও চলুন, মেজর।'

জিজ্ঞাসু নেত্রে জসিমের মুখের দিকে চাইল রানা।

'নাউ আই আন্ডারস্ট্যান্ড, হু ইউ রিয়েলি আ', স্যার। তবে আপনাকে কিছুটা সন্দেহ যে আমি করিনি, তা-ও নয়...'

'যান,' থামিয়ে দিল রানা তাকে। 'মেসেজটা আগে জানিয়ে আসুন গিয়ে ক্যাপ্টেনকে।'

'রাইট, স্যার।'

ভেতরে গিয়ে জাহেদের পাশে বসল জসিম। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'স্যার, লোটাসের বক্তব্য জানাতে এসেছি আপনাকে। আপনি শুনতে পাচ্ছেন, ক্যাপ্টেন?'

'হ্যাঁ, বলে যান।'

প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার সুরে আরম্ভ করল সে। 'কথাটা আপনাকে না বলেও পারছি না...'

'কাট্ ইট! কি বলেছে সোজাসুজি বলুন।'

'বলেছে, এগিয়ে যেতে হবে আমাদের, যে করেই হোক। এ মুহূর্তে কোন সাহায্য করতে পারছে না লোটাস কন্ট্রোল। নিজেদের এক্সপোজ করার ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। তাছাড়া এমনিতেও তাড়াহুড়ো করে প্ল্যান করতে হয়েছে বলে সে ধরনের বিকল্প কোন প্রস্তুতি নেয়া হয়নি। এখন যা করার আমাদেরকেই করতে হবে। আর...।'

'আর কি।'

'বলেছে, আপনি মুভ করতে না পারলে আপনাকে ফেলেই এগোতে হবে আমাদের।'

'ঠিকই আছে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল জাহেদ। 'এটাই নিয়ম। যাক্‌গে, আর কিছু?'

'প্ল্যানড শিডিউল ছাড়া নতুন করে কন্ট্যাক্ট করতেও নিষেধ করে দিয়েছে। বর্মীরা নাকি একটা আনঅথরাইজড রেডিও ট্রান্সমিশন ধরতে পেরেছে, অবশ্য লোকেট করতে পারেনি। আমাদের রেডিওই হবে ওটা। আর মিস্টার রানার ব্যাপারে...,'

'হ্যাঁ, কি?'

'আমাদের সাথে থাকতে বলা হয়েছে তাঁকে,' ঝুঁকে আরও কিছু বলল লোকটা নিচু গলায়। রানা বা জিনিয়া শুনতে পেল না কিছুই। জসিমের কথা শেষ হতে মুখ তুলে রানার আবছা মুখাবয়বটার দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন চোখ কুঁচকে—দেখতে পাচ্ছে না পরিষ্কার। 'রানা, আপনি শুনেছেন লোটাসের বক্তব্য?'

'শেষেরটুকু বাদে।'

'আপনাকে সম্ভাব্য সবরকম সহায়তা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাদেরকে,' এইটুকু বলেই হাঁপিয়ে গেল সে। ঘন ঘন দম নিতে লাগল। 'জসিম...আপনি...আপনি বলুন।'

'বিশেষ কিছু?' রেডিওম্যানের দিকে ফিরল রানা।

'হ্যাঁ। রেঙ্গুন দূতাবাসে রোটর ডেলিভারির কাজটা আপনাকে স্থগিত রাখতে বলা হয়েছে। ফ্যালকন মিশনের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে আপনাকে তার বদলে।'

'কে দিয়েছে এ নির্দেশ?'

'আর কে।'

'আর কে? তিনি কিভাবে নির্দেশ দিলেন?'

ঢাকার সাথে কিভাবে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে তা খুলে জানাল সে ওকে। শেষে বলল, 'অবশ্য আপনার যদি সন্দেহ থাকে, লোটাসের মাধ্যমে কমিউনিকেট করতে পারেন আপনি বিসিআইয়ের সাথে।'

কিছু বলল না রানা—ভাবছে।

'রানা,' হাত ইশারায় ওকে পাশে বসতে বলল ক্যাপ্টেন। 'শুনুন, সময় শেষ হওয়ার আগেই বলে নিই...কাজটা, কাজটা খুব কঠিন হবে মনে হচ্ছে। কাছে পিঠেই ঘুর ঘুর করছে...অসংখ্য...অসংখ্য বর্মী ইন্টেলিজেন্সের চর... যে কজনকে ধরেছি, ওদের কথা ভেবে খুব ভয় হচ্ছে...এত গোপন প্ল্যানও হয়তো ফাঁস হয়ে গেছে। নইলে...নইলে এই এলাকার আশেপাশেই কেন... কেন ঘুরঘুর...খুব সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' ওর হাত ধরে মৃদু চাপ দিল রানা। 'এখন চুপ করুন তো।'

'না!' ধমকে উঠল জাহেদ, 'সময়···সময় শেষ হয়ে আসছে···আমি জানি। এখন না বললে আর···বলা হবে না। আমার···আমার মনে হয়,' গলা নামিয়ে রানার কানে কানে বলল, 'এখানকার এদের মধ্যে··· কোন··· কোন ট্রেইটর আছে। খুব···সাবধান থাকতে হবে··· কিন্তু। প্ল্যানের বাকি অংশ জসিমের···কাছ থেকে জেনে নেবেন। জসিম!'

'ক্যাপ্টেন।'

'রাশেদ কোথায়? আর গোরা···ওদের ডাকুন। রানার মিশনের···চার্জ টেক ওভার···করার ব্যাপারটা···এখনই জানাতে হবে ওদের।'

'জ্বি, স্যার।'

'এই হলো, স্যার অবস্থা,' দু হাতের তালু চিত করে অসহায় একটা ভঙ্গি করলেন ব্রিগেডিয়ার জলিল। 'ওদিকে সব বরবাদ হতে চলেছে, স্যার। এ মুহূর্তে রানা ছাড়া কারও পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমি বললে শুনবে না ও, জানা কথা। এদিক ওদিক হয়ে গেলে ইবরাহিমকে হয়তো চিরতরে হারাতে হবে।'

থামলেন তিনি। একভাবে চেয়ে আছেন রাহাত খানের দিকে। বৃদ্ধ গভীর চিন্তায় মগ্ন। তাঁর সামনে খোলা একটা ফাইল—ওতে আর্মি ইন্টেলিজেন্সের রেসকিউ মিশনের থারাওয়াদ্দি পৌঁছানোর পর থেকে এ পর্যন্ত যতবার লোটাসের সাথে কথা হয়েছে, তার প্রতিবারের প্রতিটি কথোপকথনের পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। একেবারে শেষেরটায় আছে মিশন লীডার ক্যাপ্টেন জাহেদের আহত হওয়ার খবর আর রানার ইমিডিয়েট মেডিকেল হেলপ্ পাঠানোর অনুরোধ।

'আপনি যদি রানাকে অর্ডার না করেন, স্যার,' রাহাত খানকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার মুখ খুললেন ব্রিগেডিয়ার। 'তো···'

'এরকম একটা ভুল ঘটল কিভাবে, বলো তো! রানার ব্যাগটা না হয় দেখতে ডাক্তারি ব্যাগের মত ছিল, কিন্তু তাই বলেই একজনকে অন্য জন বলে ধরে নিল কেন তোমার এই··· কি নাম, জাহেদ?'

'ব্যাপার আছে, স্যার। ও ডাক্তারকে সামনাসামনি দেখেনি কখনও। শুধু তার ফিগার উচ্চতা ইত্যাদির বর্ণনা জানত। মুশকিলটা হয়েছে আসলে, স্যার, মাসুদ রানার সাথে এসব দিক থেকে বিস্ময়কর মিল আছে ওই ডাক্তারের। তাছাড়া, ওর হাতে ছিল ওই ব্যাগ। সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি হয়ে গেছে।'

'সিভিল ডাক্তার পাঠালে কেন? সিএমএইচ থেকে কাউকে···'

'সম্ভব ছিল না, স্যার। মাত্র দু ঘণ্টার নোটিসে ওদেরকে পাঠিয়েছি আমি। এরমধ্যে ওদেরকে জড়ো করা, নেচার অভ অ্যাকশন ঠিক করা, আবার ওদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর বিমান, ওদের সাথে কথা বলা, কুলিয়ে উঠতে পারিনি। তাছাড়া সিএমএইচে হার্ট স্পেশালিস্ট তো মাত্র দুজন। সেই তুলনায় রোগী অনেক. তাই আর ও চেষ্টা করিইনি। এই ডাক্তার আমার ছোট ভাইয়ের

বন্ধু। প্রস্তাবটা দেয়ামাত্র রাজি হয়ে গেল সে, তাই…'

'আচ্ছা।'

'এটা একটা ব্লাইন্ড অপারেশন, স্যার। অনেকটা ভাগ্যের ওপরই ছেড়ে দিয়েছি আমি ওদের বলতে গেলে। ওখানে পৌঁছে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।'

'বুঝেছি। ঠিক আছে।' একটা কাগজে খসখস করে কিছু লিখলেন রাহাত খান। তারপর সেটা বাড়িয়ে ধরলেন ব্রিগেডিয়ারের দিকে, 'আমার হয়ে তুমিই রানাকে নির্দেশটা পৌঁছে দাও। বলো, ওকে মিশনের চার্জ নিতে বলেছি আমি। ওদের সাথে যোগাযোগ করে ফোন কোরো আমাকে, কেমন?'

'শিওর, স্যার,' আকর্ণ বিস্তৃত হাসি ফুটল ব্রিগেডিয়ারের মুখে। কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন, পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে কয়েকটা শব্দ লেখা রয়েছে: এমআরনাইন, ইউআর ইনস্ট্রাকটেড টু টেক ওভার দ্য চার্জ অভ অপারেশন চিতা। উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক—আর কে।

ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন ব্রিগেডিয়ার। খুশির আতিশয্যে খটাশ্ করে স্যালুট ঠুকলেন মেজর জেনারেলের উদ্দেশে। 'থ্যাঙ্কিউ, স্যার! থ্যাঙ্কিউ!'

হেসে ফেললেন রাহাত খান। 'তাড়াতাড়ি যাও।'

'জ্বি,' ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সন্ধের একটু আগে বর্মী সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করল ওসমানী। চট্টগ্রাম থেকে প্রায় চারশো কুড়ি মাইল দক্ষিণ পুবে রয়েছে সে এখন। ঘণ্টা দুয়েক আগে সঙ্গে আনা রাডার জ্যামিং গিয়ার চালু করে দেয়া হয়েছে। ব্রিটেনের তৈরি এই সিমসন সুপার ১০ই এলএক্স-এর রেঞ্জ প্রায় একশো মাইল। যতক্ষণ চালু থাকবে, কোন রাডারের সাধ্য নেই ওসমানীকে ট্রেস করে।

ফোরডেকে দাঁড়িয়ে আছে মেজর আনোয়ার। পশ্চিম দিগন্তে টকটকে লাল প্রকাণ্ড সূর্যটা ডিউটি শেষ করে বিদেয় নিচ্ছে। দেখতে দেখতে অর্ধেকটা তলিয়ে গেল তার সমুদ্রে। আনমনা হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে সে। চারদিকে দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ, যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি—কি বিশাল, কি ব্যাপক, কত সুন্দর এই পৃথিবী।

বাবা! মনে মনে হেসে উঠল আনোয়ার। বিড় বিড় করে বলল, 'মেজর সাহেব কি কবি হয়ে গেলেন নাকি?'

আকাশে একটা দুটো করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। বাতাস তেমন একটা নেই বললেই চলে। সমুদ্র সুবোধ ছেলেটির মত শান্ত। রাজহংসীর মত তরতর করে এগিয়ে চলেছে ওসমানী দ্রুত গতিতে। দুটোর দিকে ঢাকার সর্বশেষ বার্তা রিলে করেছে সে ফ্যালকনকে। মাসুদ রানাকে মিশনের দায়িত্ব নেয়ার নির্দেশ ছিল ওটা। কি যে চলছে ওখানে, বোঝা যাচ্ছে না। কে এই মাসুদ রানা, জানে না মেজর আনোয়ারুল ইসলাম। জানতে চায়ও না, শুধু প্রার্থনা করছে, মিশনটা যেন সফল হয়। তাদের এতদূর ছুটে আসা যেন বিফল না হয়।

সিমসন সুপার-এর কথা মনে পড়তে পুলকিত হয়ে উঠল সে। বর্মী নৌ বাহিনীর সাধ্য নেই ওসমানীর অস্তিত্ব টের পায়। ওদের নাকের ডগার ওপর দিয়ে কাজ সেরে ফিরে যাবে সে দেশে কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই। ভাবতে ভাবতে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল মেজরের, অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ অনুভব করছে সে।

দশ

প্রায় আধঘণ্টা পরিশ্রমের পর মুখ খোলানো গেল একজনের। চারজনকে চারটে গাছের সাথে বেঁধে গায়ের কাপড়-চোপড় সব খুলে নেয়া হলো রাশেদের হুকুমে। এরপর কোমরের ভারী আর্মি বেল্ট দিয়ে বিস্তর মারধর করল সে লোকগুলোকে, সেই সাথে তাদের বাপ-মা তুলে সমানে গালি-গালাজ করল অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায়। সারা গায়ে কালসিটে পড়ে গেল লোকগুলোর, ফুলে ফুলে উঠল আঘাত লাগা জায়গাগুলো। চামড়া কেটেও গেল কোথাও কোথাও।

কিন্তু খুব একটা কাজ হলো না তাতে। বারবার একটাই প্রশ্ন করে চলল রাশেদ, তারা কর্নেল মঙের হুকুমে এদিকে এসেছে কি না। হ্যাঁ-না কিছুই বলল না একজনও। পরিশ্রান্ত হয়ে খানিক বিশ্রাম নিতে বসল এবার সে। এই ফাঁকে কোত্থেকে খুঁজে পেতে বেলগাছের কাঁটার মত দেখতে, তবে আরও লম্বা, কিছু কাঁটা নিয়ে এল সোলায়মান।

নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাশেদ। প্রায় বিনা আয়াসেই কাজ হয়ে গেল এবার। প্রথমজনের নখের ভেতর দুটো কাঁটা ঢুকিয়ে দিতেই মুখ খুলল সে। গড়গড় করে অনেক কথাই বলল লোকটা। বেশিরভাগই অর্থহীন, তবে এটুকু জানা গেল, তারা প্রত্যেকে বর্মী আর্মি ইন্টেলিজেন্সের স্থানীয় 'সোর্স'।

সাথে সাথে নতুন লীডার মাসুদ রানাকে জানাল সে ব্যাপারটা। রানা তখন প্ল্যানের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করছিল জাহেদের সাথে। উঠে এল ও। জিনিয়াও এল পিছন পিছন। লোকটাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল ও রাশেদের মধ্যস্থতায়।

'তোমরা ঠিক এইদিকেই কেন, তোমরা কি জানতে ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে চিতাকে?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল লোকটা, চুলের ডগায় জমে থাকা কয়েক ফোঁটা ঘাম ছিট্‌কে পড়ল। 'হ্যাঁ।'

'কি করে জানলে?'

'রেঙ্গুন থেকে নির্দেশ এসেছে স্থানীয় বি এ আই চীফের মাধ্যমে।'

'রেঙ্গুন কি করে জানল এখানেই পাওয়া যাবে চিতাকে?'

'জানি না।'

'মঙ কোথায়?'
'জানি না।'
'সে যদি জানে যে এখানেই চিতাকে পাওয়া যাবে, তাহলে সে নিজে না এসে তোমাদের কেন পাঠাল?'
'জানি না।'
'এদিকে আসার নির্দেশ কখন পেয়েছ তোমরা?'
'ভোর চারটের সময়।'
সাথে সাথে ভুরু কুঁচকে গেল রানার। একটু আগেই জাহেদ বলেছে, পৌনে চারটার দিকে এখানে পৌঁছেছে ওরা। লোকটার মুখের দিকে চেয়ে থাকল রানা, মনে হলো সত্যি কথাই বলছে লোকটা। কি মনে হতে ঘড়ি দেখল, সাড়ে পাঁচটা বাজে। লোকগুলোকে সোলায়মান আর রহমানের ওপর ছেড়ে দিয়ে রাশেদকে নিয়ে জাহেদের ঘরের দিকে পা বাড়াল রানা।
'চিতা এখন কত দূরে আছেন বলে মনে হয়?'
'চার পাঁচ মাইল হবে।'
'আমাদের আর তাঁর অবস্থানের মাঝখানে এমন কোন নিরাপদ জায়গা আছে যেখানে অন্তত সন্ধে পর্যন্ত রাখা যায় তাঁকে?'
একটু চিন্তা করে উত্তর দিল রাশেদ। 'আছে। মাঝামাঝি জায়গায় খুব পুরানো একটা বৌদ্ধমন্দির আছে, পোড়ো। কেন?'
'খোলা জায়গায়?'
'না। এদিকে সব জঙ্গল, খোলা জায়গা বলতে গেলে নেই-ই।'
'গুড। তাহলে এক কাজ করুন, আপনি এখনই রওনা হয়ে যান। মেজর জেনারেলকে ঠেকান, তাঁর এখানে আসা ঠিক হবে না। ওনাকে নিয়ে ওই মন্দিরে থাকুন আপনি। আমরা সন্ধের পর পরই আসছি। রহমান, গোরা এদের নিয়ে যান। লোকেশনটা সোলায়মানকে জানিয়ে যান। ও নিয়ে যাবে আমাদের।'
'ঠিক আছে।'
'চিতাকে আবার মিস্ করবেন না তো পথের মাঝখানে?'
'সে সম্ভাবনা নেই। কোন্ পথে উনি আসবেন, আমি তা জানি। তাছাড়া,' পকেট থেকে কি একটা বের করল রাশেদ। 'এটা থাকতে চিন্তার কিছু নেই।'
'কি ওটা?'
'বাঁশি। ফুঁ দিলে কোকিলের ডাক বেরোয়। চিতার সঙ্গে যারা আছে, তাদের সাথেও আছে এই জিনিস,' হাসল রাশেদ। 'এখন কোকিল ডাকার সময় নয়, তাই এই ডাকটাকে বেছে নিয়েছি।'
'এতে লাভ?'
'চিতার বডিগার্ডরা থেমে থেমে এই বাঁশি বাজাতে বাজাতে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। পাহাড়ী অঞ্চল বলে অনেক দূর থেকেও শোনা যায় এর আওয়াজ। আমরাও বাজাতে বাজাতে যাব। কাজেই...'

'বুঝেছি,' মনে মনে লোকটার বুদ্ধির তারিফ করল রানা। 'অস্ত্রশস্ত্র কি কি আছে?'

'আটটা স্টেন, দশটা কালাশনিকভ রাইফেল, দুই ডজনের মত হ্যান্ড গ্রেনেড আর পাঁচ ছয়টা পিস্তল-রিভলভার। আর আছে একটা বাজুকা।'

'চমৎকার! গোলাগুলি?'

'মন্দ নয়, আছে।'

'এখানেই আছে সব?'

'না। সবার হাতে হাতে আছে। তবে একটা স্টেন, কিছু গ্রেনেড আর বাজুকাটা এখানেই আছে।'

'ঠিক আছে, বাজুকাটা তুলে ফেলুন ট্রাকে। শুধু স্টেন আর দুটো গ্রেনেড রেখে যান আমাদের জন্যে। জসিমের কাছ থেকে একটা হ্যান্ডসেট নিয়ে যান অয়্যারলেসের। প্রয়োজনে কথা বলতে পারব আমরা।'

'ওকে। কিন্তু এ ব্যাটাদের কি করা যায়? শেষ করে…'

'না। অনর্থক খুনোখুনি পছন্দ করি না আমি। তাছাড়া এরা যা করেছে, পেশার খাতিরেই করেছে। এদের ব্যাপার আমি দেখছি, আপনারা রওনা হয়ে যান।'

'বেশ।'

রাশেদ ওদিকে যাত্রার তোড়জোড়ে ব্যস্ত। এই ফাঁকে গোরাকে ডেকে নিচু গলায় কিছু বলল রানা। বারকয়েক মাথা ঝাঁকাল গরিলা, মুখটা ক্রমেই গম্ভীর, থমথমে হয়ে উঠল। গালের পেশী ফুলে ফুলে উঠছে ঘন ঘন। যখন মুখ খুলল লোকটা, মনে হলো প্রকাণ্ড এক পিপের ভেতর থেকে বেরুচ্ছে কথাগুলো। 'আপনে কোন চিন্তা করবেন না, স্যার। আমি আছি।' মনে হলো কথাগুলো যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে সে। নিজের ভেতরকার বিশ্বাস আর আস্থার ভিত্ আরও দৃঢ় করার জন্যে আবারও বলল, 'আমি আছি।'

'আপনার ওপর বিশ্বাস আছে আমার। চোখ-কান খোলা রাখবেন। সন্ধের পরপরই আসছি আমরা। একসাথে সবার যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'আচ্ছা।'

ঠিক দশ মিনিট পর রওনা হয়ে গেল দলটা ট্রাক নিয়ে। রানা, জিনিয়া, ক্যাপ্টেন জাহেদ, সোলায়মান আর রেডিওম্যান জসিম রয়ে গেল। এর মধ্যে আরও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে জাহেদ। আগের মত সারাক্ষণ গোঙাচ্ছে না যদিও, তবে ঝিম্ মেরে আছে। লক্ষণটা সুবিধের নয়। জিনিয়ার সাহায্যে ওর পুরানো ব্যান্ডেজ খুলে ফেলল রানা সাবধানে। পোড়া ঘায়ের অবস্থা দেখে সভয়ে চোখ বুজল মেয়েটা।

ব্যান্ডেজের সাথে গলা, বুক আর মুখমণ্ডলের কালচে পোড়া চামড়াটুকু উঠে এসেছে। আপনাআপনি গাল কুঁচকে উঠল ওর লোকটার কষ্টের কথা ভেবে। যত্নের সাথে নতুন করে আরেক প্রলেপ মলম লাগিয়ে অবশিষ্ট গজটুকু দিয়ে আবার ব্যান্ডেজ করে দিল ও জাহেদের ক্ষত।

'মিছেই কষ্ট করছ আমাকে নিয়ে, মেজর।' এর মধ্যে 'তুমিতে' নেমে

এসেছে ওদের সম্পর্ক। 'এখন আর কিছুই প্রায় দেখতে পাচ্ছি না চোখে।'

চুপ করে থাকল রানা। এই সেই উদ্ধত, বদরাগী ক্যাপ্টেন জাহেদ, ভাবতেই পারছে না। একেবারে বাচ্চা ছেলের মত অসহায় হয়ে পড়েছে। পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে এটা ওটা নিয়ে আলাপ করল রানা জাহেদের সাথে। মাঝে মধ্যে এক আধটু সান্ত্বনাও দিল। যদিও জানে, এসব ছেলেভোলানো কথায় তেমন কাজ হচ্ছে না।

একসময় হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল সে। 'আমার জন্যে তুমি ভাবছ, এতেই আমি খুশি, রানা। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বলছিলাম, সন্ধে বোধহয় হয়ে এল, আর দেরি না করে রওনা হয়ে গেলে হত না? আটটার ভেতর ইরাবতি পেরুতে পারলে ভোরের আগেই পৌঁছে যাবে ড্যানসন বীচে,' থেমে হাঁপাতে লাগল সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল রানা। 'হ্যাঁ, আর একটু পরই রওনা হব ভাবছি। আচ্ছা, ড্যানসন থেকে বওমি বীচ কতদূরে, জানো?'

'দশ মাইল দক্ষিণে, কেন?'

'না, এমনিই,' আনমনে বলল রানা।

'খুব ভোরে তোমাদের নিতে আসবে ওরা, বুঝলে? মোট ষোলোজন, তিনটে স্পীডবোট নিয়ে আসবে। দূরও তো কম নয়, প্রায় দেড়শো মাইল। তারওপর রাস্তার যা অবস্থা! আমার মনে হয় এখনই রওনা হওয়া উচিত তোমাদের।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার, 'তার মানে? তোমাদের বলতে তুমি…'

'হ্যাঁ, রানা। আমি তোমাদের সাথে যাচ্ছি না। আমাকে নিয়ে ঝামেলা হবে।'

'কিসের ঝামেলা?'

অসহিষ্ণু হয়ে উঠল জাহেদ। 'আমি সঙ্গে থাকলে বিপদ বাড়বে তোমাদের। চিতা নিজে একজন রোগী, আমিও আরেক বোঝা, একা একা সামাল দিতে পারবে না তুমি।'

'চুপ করো।'

'শোনো, রানা…'

'পরে শুনব,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'এখন চুপ করো।'

'ধ্যাত্তেরিকা!' রেগে গেল ক্যাপ্টেন, 'সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করো।'

'বুঝেছি। কিন্তু আমি এখন এ মিশনের লীডার। কি করব না করব, সেটা আমিই স্থির করব।'

চট করে রানার একটা হাত চেপে ধরল জাহেদ। 'রানা, আমি জানি আমি বাঁচব না। সারা শরীরে অসহ্য জ্বালাপোড়া, এর মধ্যে টানাহ্যাঁচড়া করে আর কষ্ট দিয়ো না আমাকে। ভেবে দেখো, এ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই তো হলো না আমাকে দিয়ে, তারওপর শেষ সময়ে…একটা পিস্তল রেখে যাও। যতক্ষণ প্রাণটা আছে…,'

বিস্মিত হয়ে ব্যান্ডেজ মোড়া মুখটার দিকে চেয়ে আছে রানা। একবারে

মিথ্যে বলেনি লোকটা। চিতার অবস্থা কি রকম, কে জানে। তারওপর একে নিয়ে পদে পদে হয়তো অসুবিধেই হবে। কিন্তু তবুও, জেনেশুনে এক আহত, অসহায় মানুষকে এভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে চলে যেতে পারে না রানা কিছুতেই। এ অসম্ভব।

'কই, কিছু বলছ না যে?'

প্রসঙ্গ ঘোরাবার চেষ্টা করল রানা। বলল, 'আমি অন্য একটা ব্যাপার ভাবছি, জাহেদ।'

'কি?'

'তোমার আশঙ্কাটাই বোধহয় সত্যি হতে চলেছে।'

'কিসের?'

'রাশেদের দলে একটা ফুটো সত্যিই আছে মনে হচ্ছে।'

সটান উঠে বসল জাহেদ। 'সত্যি?'

'দেখেশুনে সেরকমই মনে হয়।'

'হুঁম!' বলে খানিক কি যেন ভাবল ক্যাপ্টেন। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, তাহলে এখনও বসে আছে কেন কর্নেল মঙ? ধরছে না কেন আমাদের? ইচ্ছে করলেই তো আমাদের ধরতে পারে ও?'

'তা পারে। তবে বোধহয় একসঙ্গে সবাইকে ধরবে বলে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে। ওই লোকটার কথায় তাই মনে হলো আমার। চিতাকেও ধরবে, সেই সাথে বিদেশী স্পাই, কল্পনা করতে পারো?'

'কে হতে পারে, কোন ধারণা?'

'নাহ্‌। এখনও কিছু বুঝতে পারছি না,' ঘড়ি দেখল রানা। প্রায় সোয়া ছটা। চারদিক বেশ আঁধার হয়ে এসেছে। 'চলো,' জাহেদের হাত ধরে টানল রানা, 'এখনই রওনা হব।'

'কিন্তু…রানা…,'

অন্যদিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল রানা। লোকটার দুর্বলতা বুঝে নিয়েছে ও কথায় কথায়। 'তুমি জানতে চাও না, কে বিশ্বাসঘাতক, মঙের চর?'

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াতে গেল জাহেদ। 'চাই, একশোবার। চলো।'

'দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা করো, একটা কাজ সেরে আসি।'

একটা গুণ আছে কর্নেল মঙের, স্বীকার করতেই হবে—তা হলো ধৈর্য। এমন অপরিসীম ধৈর্য লাখে একজনের মধ্যেও আছে কিনা সন্দেহ। গত তেত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রথমবার আধ ঘণ্টার জন্যে, পরেরবার এক ঘণ্টার জন্যে অফিস থেকে বের হয়েছিল সে। প্রথমবার গিয়েছিল হো চি মিন রোডে, একটা বাড়িতে হানা দিতে, দ্বিতীয়বার এয়ারপোর্টে।

তারপর সেই যে অফিসে এসে গ্যাঁট হয়ে বসেছে, আর নড়ার নামটি নেই। খাওয়া নেই, ঘুম তো নেই-ই, অফিস কামরার এক কোণে বড়সড়

একটা ইজিচেয়ার থাকা সত্ত্বেও ওটায় একবার পিঠ পর্যন্ত লাগায়নি সে এই দীর্ঘ সময়ে। এখানে বসেই একের পর এক টেলিফোন করেছে এখানে-ওখানে, গরম করে তুলেছে আবহাওয়া।

প্রেসিডেন্ট সও মঙের কাজিন সূত্রে এমনিতেই দাপট তার কম নয়, তার ওপর নিজেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক পদে অধিষ্ঠিত। দেশের চীফ অভ আর্মি স্টাফ পর্যন্ত হুজুর হুজুর করে তাকে। রাতে রাশেদের জীপ গাড়িতে হোমিং ডিভাইস বপন করার সাথে সাথে মন থেকে সব উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেছে কর্নেলের। এখন সে নিশ্চিত ভাবে জানে, কোথায় রয়েছে ওরা।

.কম্পিউটারের স্ক্রীনে জ্বল জ্বল করছে একটা ফোঁটা, টিপ টিপ করে জ্বলছে, নিভছে সেই সাথে আওয়াজ করছে পিঁক পিঁক, পিঁক পিঁক। সারারাত মুভ করেছে ও ।, তারপর থেমে পড়েছে এক জায়গায়। কোথায় আছে ওরা, নিশ্চিত ভাবে ঃ নে কর্নেল। থারাওয়াদ্দিতে, মংডু গ্রামে।

তবু, এখনই ়াওয়া করতে রাজি নয় সে। আরও একটু অপেক্ষা করতে চায়। কারণ তার ভয় পাওয়ার, বা চিন্তার কিছু নেই। কর্নেল জানে, চিতা কোনমতেই পালাতে পারবে না। বাংলাদেশের সাথে বর্মার প্রতি ইঞ্চি সীমান্ত এমনভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যার ফাঁক গলে একটা পিঁপড়েও পেরুতে পারবে না। এছাড়া, সারা আরাকান রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার কয়েকশো চর—প্রত্যেকে ট্রেইনড।

মেজর জেনারেল ইবরাহিম থেকে শুরু করে লেফটেন্যান্ট রাশেদ, আবদুর রহমান, সোলায়মানসহ ইদানীং যে সব মুসলমান আর্মি থেকে ভেগেছে, তাদের প্রত্যেকের একটা করে বি-টু সাইজ ছবি আছে সবার পকেটে। ওদের সাথে আছে পুলিস ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার প্রচুর সদস্য, সব কাজ ফেলে এদের পিছনে লেগে আছে। তিন-চারজনের ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে কাজ করছে। রাশেদের গাড়ি কোথায় আছে, পরিষ্কার জানা আছে তাদের। প্রায় প্রতিটি গ্রুপ লীডারের হাতে ধরা ডিরেকশন ফাইন্ডার, ডিভাইসটা সারাক্ষণ তারস্বরে চেঁচিয়ে জানান দিচ্ছে, আমি এখানে! আমি এখানে!

ইচ্ছে করলে অনেক আগেই ধরতে পারত তারা দলটাকে। কিন্তু কর্নেল মঙের নির্দেশ, দূরে থাকো। শুধু নজর রাখো চিতা কখন ওই দলের সাথে যোগ দেয়, তারপর আমাকে জানাও। যা করার আমি করব। নিজে অ্যারেস্ট করতে চাই আমি হারামজাদাকে।

রানার ধারণাই নেই, সারাদিনই ওদের ওপর দূর থেকে নজর রেখেছে দশ বারোজন ওয়াচার। এখনও আছে তারা, পাহাড়ে জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে। ট্রাক নিয়ে রাশেদ আড়াল ছেড়ে বেরুনো মাত্র খবর পেয়ে গেছে কর্নেল মঙ।

'ট্রাক?' কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল মঙ। 'ট্রাক এল কোত্থেকে আবার?'

'জানি না, কর্নেল। তবে আগে দেখিনি ওটাকে।'

'কে কে আছে ওতে?'

'লেফটেন্যান্ট রাশেদ, রহমান, কায়েস, সবুর আর হানিফ। আর এক

লোক···দাড়িওয়ালা। ছাপা শার্ট গায়ে, ইয়া মোটা, গরিলার মত লাগছে।'

'বুঝেছি। ও এসেছে বাংলাদেশ থেকে। উইনের বর্ণনার সাথে মিলে যাচ্ছে। ওরা কেউ নেই, ইবরাহিম বা ওর মেয়ে?'

'না, স্যার।'

'সাথে অস্ত্রশস্ত্র কিরকম আছে?'

'তেমন কিছু দেখছি না, কর্নেল। গোটা দুয়েক স্টেন, দুটো কালাশনিকভ ···এই আর কি!'

'ঠিক আছে। লক্ষ রাখো।'

প্রচুর মাছ ধরল জননী। আরেক দেশের জলসীমায় ঢুকে সারাদিন ধরে মাছ চুরির অভিজ্ঞতা এই প্রথম অর্জন করল লেফটেন্যান্ট কামাল। এফ. বি. জননীর নেতৃত্বে রয়েছে সে। ক্রু-র ছদ্মবেশে ছ জন কমান্ডো আছে তার সঙ্গে, এছাড়া আসল ক্রু-রা তো আছেই। বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে কামালের। মেজর আনোয়ারের নির্দেশ, যত পারো মাছ ধরো। বর্মী কোস্ট গার্ড যদি ধাওয়া করে, সোজা লম্বা দেবে। অবশ্য ওরা ধাওয়া বন্ধ করে ফিরে যাওয়ামাত্র আবার আসতে হবে জননীকে, যদি সম্ভব হয়। ঘুর ঘুর করতে হবে তাকে আকিয়াবের কাছাকাছি। তাই করছে ওরা সারাদিন ধরে।

জননীর বৃদ্ধ ক্যাপ্টেনও মজা পেয়ে গেছে। বেশ জমিয়ে নিয়েছে সে লেফটেন্যান্টের সাথে কথায় কথায় একবার বলেছে; একদিনে এত মাছ ধরেনি সে তার চল্লিশ বছরের চাকরি জীবনে। তার ধারণা কামাল খুব ভাগ্যবান মানুষ। ওর জন্যেই নাকি সম্ভব হয়েছে এটা। ও নিজেও অবশ্য ব্যাপারটা উপভোগ করছে খুব। এতদিন এক দেশের ফিশিং ট্রলারের অন্য দেশের সমুদ্রসীমায় গিয়ে মাছ চুরির ঘটনা কেবল শুনেই এসেছে সে। আজ বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো।

বিকেলের দিকে তাড়া করা হলো জননীকে। দূর থেকে বর্মী নৌ বাহিনীর একটা ভট্‌ভটিয়া মার্কা মান্ধাতা আমলের গানবোটকে ছুটে আসতে দেখে পালাল জননী ভরপেট মাছ নিয়ে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আবার ফিরে এল সে, কিন্তু টিকতে পারল না। প্রায় সাথে সাথে আবার ধাওয়া করা হলো।

কিন্তু জননীর গতির সাথে এঁটে উঠতে পারল না গানবোট। কাজেই জননী আন্তর্জাতিক জলসীমায় নাক ঢোকানোমাত্র ফিরে আসতে হলো তাকে। এমনি করে আরও দু তিনবার চলল চোর-পুলিস চোর-পুলিস খেলা। শেষে হয়রান হয়ে পড়ল ভট্‌ভটিয়া। অয়্যারলেসে রিপোর্ট করল আকিয়াবের নৌ-ঘাঁটি কর্তৃপক্ষকে, সাহায্য চেয়ে পাঠাল।

দুইয়ে দুইয়ে চার হলো। অতএব বিন্দুমাত্র দেরি না করে যোগফলটা কর্নেল মঙকে জানিয়ে দিল কর্তৃপক্ষ। উত্তর এল, ধাওয়া করার দরকার নেই, থাকুক ওটা ওখানেই। শুধু নজর রাখা হোক।

আঙিনায় বেরিয়ে এসে পিছন ফিরে জিনিয়াকে ডাকার জন্যে মুখ খুলতে

যাচ্ছিল রানা, কিন্তু জমে গেল আচমকা, খাঁচার গায়ে দড়াম করে বাড়ি খেল হৃৎপিণ্ড। ওটার ধুপ ধাপ্ ধুপ্ ধাপ্ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রানা। জাহেদ আর জিনিয়া যে ঘরে আছে, তার পিছনে, অনেক দূরে একসার পাহাড়। ওই পাহাড়ের ওপরই কোথাও একটা আলো ঝিলিক মেরে উঠেছে এইমাত্র, পলকের জন্যে, পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে রানা। ঠিক যেন কাঁচের গায়ে সূর্যের প্রতিফলন।

ঘাড় ঘুরিয়ে ওদিকে আবার তাকাতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু সামলে নিল শেষ সময়ে। ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে অন্যদিকে। কিসের আলো ওটা? নজর রাখা হচ্ছে ওদের ওপর? বিনকিউলারে চোখ রেখে···। এবার আর সন্দেহ নয়। স্থির নিশ্চিত হলো ও, নিশ্চয় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কেউ এদের মধ্যে। নাকি অন্য কোনভাবে···।

এভাবে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবে ঘুরে দাঁড়াল রানা, একটু জোর পায়ে ফিরে চলল ঘরটার দিকে, এমন ভাব করল যেন কিছু ফেলে এসেছে। কয়েক পা এগিয়ে যখন বুঝল আড়ালে চলে এসেছে, দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। চোখ তুলে চাইল রানা, ঘরের চালার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেছে পাহাড় সারি।

খোলা দরজা দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ জিনিয়া, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি?'

'না, কিছু না।'

ভেতরে ঢুকে পিছনের দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল রানা। ওপরদিকে বড় একটা ফুটো দেখে চোখ রাখল তাতে। দেখে মনে হয় যেন কাছেই, কিন্তু আসলে অনেক দূরে রয়েছে পাহাড়গুলো—কম করেও চার পাঁচ মাইল পুবে। সূর্য অনেকটা পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে বলেই দেখা গেছে ঝলকটা, নইলে হয়তো অজানাই থেকে যেত নজর রাখার ব্যাপারটা।

ওর পিছনে এসে দাঁড়াল জিনিয়া। প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, রানা?'

বহুকষ্টে একটু হাসল রানা। একে এ ব্যাপারে এখনই কিছু বলা ঠিক হবে না। ভয় পেয়ে যেতে পারে। বলল, 'তেমন কিছু না, ধাঁধা।'

'ধাঁধা?'

'মানে, একটা ধাঁধা-র উত্তর খুঁজছি। পরে জানাব।'

আর কিছু বলল না জিনিয়া। কিন্তু সন্দেহের মেঘ দূর হলো না চেহারা থেকে।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। এই সময় জাহেদ বলল, 'রানা, খারাপ কিছু ঘটেছে?'

ভাগ্যিস বাংলা বোঝে না জিনিয়া। 'একটু পরে বলছি তোমাকে,' মুখটা তেমনি হাসিহাসি রেখেছে রানা। মেয়েটাকে বোঝাতে চাইছে, সত্যিই মন্দ কিছু ঘটেনি। 'তোমার ক্যাপটা কোথায়, জাহেদ?'

কখন কোন্ আচরণ করতে হবে, জানা আছে ক্যাপ্টেনের। কিছু একটা অনুমান করলেও কোন প্রশ্ন করল না। 'বোধহয় ফার্মহাউসে রেখে এসেছি,

জসিমের টেবিলের ওপর।'

'ঠিক আছে। আর শোনো, যদি দেখো, বা বোঝো যে আমি কোন অস্বাভাবিক আচরণ করছি, চেপে যেয়ো। কোন প্রশ্ন কোরো না।'

'ঘাপলা?'

'হ্যাঁ,' জিনিয়ার দিকে ফিরল রানা। 'এখানেই থাকুন। আমি আসছি।'

বেরিয়ে গেল রানা। প্রায় সাথে সাথে ফিরে এল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাকল জিনিয়াকে, 'আসুন আমার সঙ্গে। ও ব্যাটাদের ব্যবস্থা করে আসি।'

ওর সামনে এসে দাঁড়াল জিনিয়া। চোখে চোখে চেয়ে থাকল নিষ্পলক। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, 'ধাঁধাটা কিসের, রানা? বলবেন না আমাকে?'

বাঁ হাত বাড়িয়ে জিনিয়ার ক্ষীণ কটি জড়িয়ে ধরল মাসুদ রানা, আলতো করে আকর্ষণ করল ওকে নিজের দিকে। 'উত্তরটা পেলে তো!'

জিনিয়ার চাউনি বলছে, ও ধরে ফেলেছে যে রানা কিছু একটা গোপন করে যাচ্ছে। যত সরল ভেবেছে ওকে রানা, ততটা আসলে নয় সে। কিছু একটা ঘটেছে, ঠিকই টের পেয়ে গেছে।

'আমি কথা দিচ্ছি, পরে জানাব,' বলল রানা। 'এখন যা বলি, বিনা প্রশ্নে তাই করুন। অলরাইট?'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল জিনিয়া। 'ঠিক আছে।'

'গুড। এবার চুলগুলো মাথার ওপর তুলে এই ক্যাপটা পরে নিন।'

'কেন?'

'ফের?'

'বেশ।'

কাজটা শেষ হতে জিনিয়াকে ঘুরে-ফিরে দেখল রানা। মনে মনে সন্তুষ্ট হলো। 'হ্যাঁ, চলবে।' পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর ঠোঁটের হালকা লিপস্টিক মুছে দিল। 'মনে থাকে যেন, এ নিয়ে কারও সামনে একটা কথাও উচ্চারণ করা চলবে না।'

'ঠিক আছে।'

মোটামুটি আশ্বস্ত হলো রানা। অত দূর থেকে আশা করা যায় বোঝা যাবে না এ মেয়ে কি ছেলে। ও নিশ্চিত নয়, এরই মধ্যে ওকে দেখে ফেলেছে কি না। তাই জিজ্ঞেস করল, 'শেষবার কখন বেরিয়েছিলেন ঘর থেকে?'

'ঘণ্টাখানেক আগে হবে বোধহয়।'

'বেরিয়ে কোন্‌দিকে গিয়েছিলেন, ফার্মহাউসের দিকে?'

'না। ওদিকে,' হাত তুলে জঙ্গলের দিকটা দেখাল জিনিয়া। 'ওদেরকে ইন্টারোগেট করা হচ্ছিল, তাই দেখতে গিয়েছিলাম।'

আশপাশে তাকাল রানা, যে রকম বন-জঙ্গল তাতে ওখান থেকে শুধু খোলা আঙিনাটা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় বলে মনে হলো না। এছাড়া জীপ আর পাহাড়ের মাঝে বেশ উঁচু একটা ঘন ঝোপ থাকায় ওটাকেও নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে না।

'ঠিক আছে, চলুন।'

পায়ে পায়ে গাড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। চোখ কুঁচকে চেয়ে থাকল রানা ওটার দিকে। ধীর পায়ে চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে এল।

'কিছু খুঁজছেন?'

পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'হোমিং ডিভাইস চেনেন?'

'কি?'

'হোমিং ডিভাইস,' তিন আঙুল দিয়ে ছোট্ট একটা আকৃতি করে দেখাল ও মেয়েটাকে। 'ম্যাগনেট লাগানো আছে। ইচ্ছে করলে গাড়ির স্টীল বডির সাথে আটকে দেয়া যায়।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল জিনিয়ার। 'ওটা কি কোন সিগন্যাল দেয়?'

'দেয়।'

'ভাবছেন…ভাবছেন, এটায় সে ধরনের কিছু আছে?' মুখ শুকিয়ে গেছে ওর।

'ভাবাভাবির দরকার কি? আসুন, দুজনে মিলে চেক করে দেখি। আপনি পিছন দিকটা,' ইশারায় ওকে নিচে ঢুকতে বলল রানা। নিজে চলে এল সামনের দিকে। উবু হয়ে বসে প্রথমে দুই মাডগার্ডের নিচে নজর বোলাল ভাল করে। তারপর চিত হয়ে ঢুকে পড়ল ল্যান্ড রোভারের তলায়।

'রানা!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জিনিয়া।

আওয়াজটা কানে যাওয়ামাত্র মনে হলো কেউ যেন মুঠো করে চেপে ধরেছে ওর হৃৎপিণ্ড। কয়েক সেকেন্ড স্থবির হয়ে থাকল রানা। সংবিৎ ফিরতে এক ঝটকায় বেরিয়ে এল, প্রায় উড়ে চলে এল জিনিয়ার পাশে। বাঁ দিকের চাকার পাশে উবু হয়ে বসে আছে সে, চেয়ে আছে মাডগার্ডের ভেতরদিকে। দু চোখ বিস্ফারিত। আঙুল তুলে জিনিসটা দেখাল সে রানাকে। কথা বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে, হাত কাঁপছে থর থর করে। ওটার দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল জিনিয়া, কিন্তু চেপে ধরল ও হাতটা।

'ডোন্ট টাচ্!'

সামনে ঝুঁকে আরেকটু ভাল করে নজর বোলাল রানা জিনিসটার ওপর। চৌকোনা একটা মেটাল বক্স। ম্যাচ বাক্সের চেয়েও ছোট। রাশান। হাত ধরে মেয়েটাকে পিছিয়ে আনল ও। দু কান ভোঁ ভোঁ করছে, দ্রুততর হচ্ছে হার্টবিট ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে। তার মানে কি, রেঙ্গুনেই সারা হয়েছে এ কাজটা? নাকি এখানে?

'কি হবে এখন?' প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল জিনিয়া।

'দাঁড়ান, অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

'আমরা কোথায় আছি, জানে ওরা, তাই না?'

শুনেও না শোনার ভান করল রানা, উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে লাগল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানকার পাট চুকিয়ে ফেলার তাগিদ অনুভব করছে। কয়েকটা সম্ভাবনা নিয়ে খানিকক্ষণ মাথা ঘামাল ও, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারল না। ওটা যেখানে আছে, সেখানেই থাকুক আপাতত, ভাবল রানা। কোথায় আছে ওরা, জানার পরও যখন এখনও পর্যন্ত কোন

অ্যাকশন নেয়া হয়নি, দূর থেকে কেবল ওয়াচ রাখা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আশা করা যায় আরও কিছু সময় পাওয়া যাবে।

হঠাৎ খেয়াল হলো, রাশেদের ট্রাকেও কি কোন ডিভাইস ছিল? সর্বনাশ! তা যদি হয়, তাহলে তো বিপদ বরং বাড়ল আরও। নাহ্, দেরি করা যাবে না, এখনই রওনা হতে হবে।

'উঠুন, জলদি!'

দ্রুত জাহেদের ঘরে এসে ঢুকল রানা। বসে বসে ঝিমুচ্ছিল ক্যাপ্টেন, পায়ের শব্দে উঠে বসল। 'রানা?'

'হ্যাঁ। তোমার সাথে জরুরী একটা আলাপ আছে।'

'বলো।'

'কাল তোমরা পথে কোথাও থেমেছিলে এখানে আসার পথে?'

'নাহ্। কেন?'

'কোথাও দাঁড়াওনি?'

'না, ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। থেমেছিলাম। হাইওয়েতে একটা পুলিস পেট্রল থামিয়েছিল আমাদের।'

'পুলিস?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'রাশেদ বলল, ওদের কাছে নাকি গোপন ইনফরমেশন ছিল, কি এক চোরাইমাল বেরিয়ে যাওয়ার কথা রেঙ্গুন থেকে, ওই জন্যে সব গাড়ি থামিয়ে চেক করছিল ওরা রাস্তায়।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। জিনিয়া এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। 'তোমাদের গাড়ি চেক করেছে ওরা?'

'না। আর্মি অফিসার দেখে সে সাহস পায়নি।'

'কজন ছিল ওরা?'

'চারজন।'

'এমনি গাড়ির বাইরে গিয়ে ঘুরে দেখেনি ওদের কেউ, বা টর্চ দিয়ে দেখার চেষ্টা করেনি ভেতরে কি আছে না আছে?'

'মনে হয় না। তাছাড়া অতটা খেয়াল করার সুযোগও ছিল না। জাহেদের কথামত আমি আর জসিম তখন ঘুমের ভান করছিলাম। কিন্তু কেন, রানা? কি হয়েছে?'

'তোমাদের গাড়িতে হোমিং ডিভাইস লাগিয়ে দিয়েছিল কেউ। এই জন্যেই আশেপাশে ঘুর ঘুর করছে ব্যাটারা। তাছাড়া এই ঘরের পিছনদিকের পাহাড় থেকে নজর রাখা হচ্ছে আমাদের ওপর দূরবীন দিয়ে, আমি দেখেছি।'

হাঁ করে রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল জাহেদ। বাক্‌শক্তি ফিরে পেতে বলল, 'হায় খোদা! এখন কি হবে তাহলে?'

হাতঘড়ি দেখল রানা। সূর্য ডুবতে এখনও দশ-পনেরো মিনিট দেরি। এখনই রওনা হওয়া দরকার। 'যা হওয়ার হয়ে গেছে,' বলল ও। 'এখন থেকে

আরও সতর্ক হতে হবে। চলো, ওঠো। তৈরি হও, আমি এই ফাঁকে ও ব্যাটাদের বাঁধনগুলো একবার চেক করে আসি।'

কম্পিউটার নিজের রূমে আনিয়ে নিয়েছে কর্নেল মঙ। ঢুলুঢুলু চোখে চেয়ে আছে ওটার স্ক্রীনের দিকে। হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার, মাথা ঝাড়া দিয়ে চোখ পিট্ পিট্ করল কয়েকবার। নাহ্, ঠিকই আছে, ভুল দেখেনি। জায়গা বদল করতে শুরু করেছে স্ক্রীনের সেই ফোঁটা।

চট্ করে ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল কর্নেল, প্রায় ছটা বাজে। চোদ্দ ঘন্টারও বেশি সময় পরে মুভ করতে শুরু করেছে ল্যান্ড রোভার—টিট্‌কিরির ভঙ্গিতে মুখ বাঁকিয়ে হাসল জলহস্তী, মেজর থান্টের জীপ। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ঢিপ্ ঢিপ্ করছে বুকের ভেতরটা, গরম হয়ে উঠেছে দু কান। এগোও, শালা, মনে মনে বলল সে, এগুতে থাকো। আসছি আমি।

ঘুরে টেবিলের ওপর রাখা ছোট্ট সোনালী বুদ্ধ মূর্তিটার দিকে তাকাল। একজনের দেয়া উপহার ওটা, পেপার ওয়েট হিসেবে ব্যবহার করে সে। ধ্যানমগ্ন সৌম্য মুখটার দিকে চেয়ে থাকল সে একভাবে। মহামতি বুদ্ধের আশীর্বাদে ভালই এগিয়েছে সব এ পর্যন্ত, বাকিটুকুও নিশ্চয়ই সম্পন্ন হবে। হঠাৎ করজোড়ে কপাল ঠেকাল কর্নেল বুদ্ধের পায়ের কাছে।

'হে ভগবান...' এর পরেরটুকু বোঝা গেল না, শেষে বলল, '...ওকে ছিঁড়ে খাব আমি!' চোখমুখের চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তার দেখতে দেখতে। গৌতম বুদ্ধের সাথে কথা বলছে সে, অথচ তাঁর অহিংসার বাণী ভুলে বসে আছে বেমালুম।

সিধে হয়ে স্ক্রীনের দিকে তাকাল আবার। এখনও চলছে ফোঁটা। এক ঘণ্টা চলার পর থেমে দাঁড়াল। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে আছে কর্নেল। ঠিক বিশ মিনিটের মাথায় আবার চলতে শুরু করল ওটা। তার মানে, অনুমান করল মঙ, ওখান থেকে এইমাত্র পিক্ আপ করা হলো ইবরাহিমকে। রীতিমত কাঁপতে শুরু করল সে এবার। ঝট্ করে টেলিফোনের রিসিভার তুলেই নম্বর ঘোরাতে শুরু করল। 'মেজর, কপ্টার রেডি?'

'ইয়েস, কর্নেল।'

'কমান্ডো গ্রুপ?'

'এয়ারবেসেই আছে ওরা, আপনার নির্দেশের অপেক্ষায়, স্যার।'

'আমি আসছি।'

'এখনই, স্যার? এই রাতে...'

'থারাওয়াদ্দি যাব। বাকি কাজ ওখানে বসে সারব।'

'ওকে, কর্নেল। আমি এদিকের ব্যবস্থা করে রাখছি।'

রিসিভার রেখে ইন্টারকমের সুইচ টিপল কর্নেল। পাশের কামরা থেকে সাড়া দিল তার পি এস।

'মিন্টু?'

'কর্নেল।'

'আকিয়াবে ফোন করো। বেস কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করো, বাংলাদেশী ট্রলারটা এখনও আছে কি না আমাদের টেরিটোরিতে। তারপর আমার রুমে এসো, কাজ আছে।'

'জ্বি, স্যার।'

এগারো

সোলায়মান বসেছে স্টিয়ারিঙে। মাঝখানে জিনিয়াকে তুলে দিয়ে রানা বসল এপাশে। পিছনের লম্বালম্বি দুটো সীটের একটায় শুইয়ে দেয়া হয়েছে ক্যাপ্টেন জাহেদকে। জসিম বসেছে তার উল্টোদিকে। উঁচু নিচু পাহাড়ী পথ ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটছে ল্যান্ড রোভার।

ওদের চারজনকে হাত-পা মুখ বেঁধে বনের মধ্যেই ফেলে রেখে এসেছে রানা। খুঁজতে খুঁজতে একসময় সঙ্গীরা ঠিকই বের করে ফেলবে ব্যাটাদের, সে ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত ও। খিদে তৃষ্ণায় খানিকটা কাহিল হয়ে পড়লেও অন্তত প্রাণে মরবে না ওরা কেউ।

পাশে স্তূপ করে রাখা ওদের খুলে নেয়া কাপড়-চোপড়ের ভেতর থেকে বেরিয়েছে একটা 'ব্লিপ ফাইন্ডার'। ভুল করেছিল জাহেদ, প্রথমেই যদি ওদের সার্চ করা হত, তখনই ফাঁস হয়ে যেত ব্যাপারটা। তবে এ ব্যাপারে জাহেদকে আর কিছু বলেনি রানা। এমনিতেই প্রচণ্ড দৈহিক আর মানসিক যন্ত্রণায় আছে লোকটা।

ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে জিনিয়া, বুঝতে পারছে রানা। অনেকদিন পর বাবার সাথে দেখা হতে যাচ্ছে, কাজেই ওটা স্বাভাবিক। খানিকটা প্রগলভ হয়ে উঠেছে। তার সব কথা মন দিয়ে শুনছে না ও, মাঝে মধ্যে 'হুঁ' 'হ্যাঁ' করছে। তাতে আরও উৎসাহিত হচ্ছে মেয়েটা, অনর্গল বকে চলেছে।

'জীপের লাফ-ঝাঁপের সাথে জাহেদের গোঙানিও ক্রমশ বাড়ছে। শুয়ে থাকতে পারছে না সে। অথচ আস্তে চালালেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। তাও মন্দের ভাল, ভাবল রানা, ভাগ্যিস বাংলাদেশের মত খাল-বিলের দেশ নয় বর্মা। তাহলে আর দেখতে হত না। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে চারদিক। ওদের ডানদিকে একসার পাহাড়। শেয়াল আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে মুখর হয়ে আছে জায়গাটা।

পাঁচ মাইল রাস্তা পেরোতেই প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। দূর থেকে গাছপালার ফাঁক দিয়ে ধ্বংস প্রায় কালচে একটা ইমারত চোখে পড়তে সবাই বুঝল, ওটাই সেই বৌদ্ধমন্দির। সাথে সাথে রানার নির্দেশে হেডলাইট অফ করে দিল সোলায়মান। পকেট থেকে দু নম্বর হ্যান্ড সেটটা বের করে গাড়ি থেকে নেমে এল রানা। প্রায় সাথে সাথে সাড়া দিল রাশেদ। সবকিছু ঠিকঠাক

আছে, জানাল সে, এইমাত্র পৌঁছেছেন চিতা।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রানার। ওর মুখ দেখে যা বোঝার বুঝে নিল জিনিয়া। 'সাবধান, যা বলেছি, মনে থাকে যেন। কাউকে কিছু বলবেন না,' মেয়েটাকে বলল ও।

'মনে আছে,' বলে একছুটে মিলিয়ে গেল সে অন্ধকারের মধ্যে। এবার নিশ্চিন্ত মনে এগোল ল্যান্ড রোভার। মন্দিরের ভেতরে দুটো প্যারাফিন বাতি জ্বলছে টিমটিম করে। ওদের দেখে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রাশেদ।

সহাস্যে বলল, 'আসুন।'

'মেজর জেনারেলের শরীর কেমন?'

'মেয়েকে কাছে পেয়ে সব সেরে গেছে। চলুন, দেখবেন।'

ভেতরে ঢুকল রানা। ঘরের মাঝখানে বাপের বুকে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে জিনিয়া। রানার চেয়ে দু ইঞ্চি মত খাটো হবেন হয়তো ভদ্রলোক। মেয়ের মাথায় গাল রেখে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছেন। মোটাসোটা গড়ন, মুখটা প্রায় গোল। হাসিখুশি মুখটা দেখে রানার মনেই হলো না জীবন-মরণ সমস্যা চলছে এঁর। পাশেই দাঁড়িয়ে গোরা আর আবদুর রহমান।

রাশেদ পরিচয় করিয়ে দিতে ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন মেজর জেনারেল, 'আমার জন্যে এত কষ্ট করেছ তোমরা, সেজন্যে তোমাদের ধন্যবাদ। পাঁচ মিনিটেই সব কাহিনী শোনা হয়ে গেছে আমার রাশেদের মুখে। কেমন আছে এখন ক্যাপ্টেন ছেলেটা?'

'মোটামুটি ভাল,' হাতটা ঝাঁকিয়ে দিল রানা। 'আপনার প্রেশার…'

'ও কিছু না, ও কিছু না,' হাসলেন ইবরাহিম। 'এটাকে কাছে পেয়ে সব সেরে গেছে,' মেয়ের পিঠ চাপড়ে দিলেন পরম স্নেহে।

'আমার মনে হয়, এখানে সময় নষ্ট করাটা ঠিক হবে না,' রানা বলল। 'যত তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া যায়, ততই ভাল।'

'হ্যাঁ, চলো যাই,' রাশেদের দিকে তাকালেন চিতা। 'ওদের ডাকো। বিদেয় নিয়ে নিই।'

'ইয়েস, স্যার,' বেরিয়ে গেল রাশেদ মন্দির থেকে।

রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বহু কষ্ট করে এত পথ নিয়ে এসেছে ছেলেরা আমাকে। ওদেরকে অন্তত কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত আমার।'

'শিওর, বাট, উই মাস্ট মুভ ফাস্ট, স্যার,' বলে বেরিয়ে এল রানা। দোরগোড়ায় রাশেদের সাথে দেখা হলো, পিছনে সাত আটজন নিয়ে ফিরে এসেছে সে। গাড়ির কাছে এসে উঁকি দিয়ে জাহেদের দিকে তাকাল রানা। চুপ করে বসে আছে লোকটা। মাঝেমধ্যে এক আধটা কথা বলছে জসিমের সাথে।

'একটু অপেক্ষা করো, এখুনি রওনা হব আমরা,' বলল রানা।

'চিতা পৌঁছে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল ক্যাপ্টেন। ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করল রানা। জসিমের দিকে ফিরে বলল, 'রাকস্যাকটা নিয়ে বাইরে আসুন।'

ঝট্ করে এদিকে ফিরল জাহেদ। 'কেন, রানা?'

'পরে শুনো,' পিছন ফিরে হাঁটা ধরল ও।

পিছন পিছন এল জসিম। মন্দির থেকে বেশ খানিকটা সরে এসে থামল রানা। ঘুরে দাঁড়াল, 'লোটাসের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।'

'শিওর,' রাকস্যাকটা মাটিতে নামিয়ে রাখল রেডিওম্যান। 'কি বলতে হবে?'

'ইমার্জেন্সি ফ্রিকোয়েন্সিতে কথা বলুন।'

'কি মেসেজ দিতে হবে, স্যার?'

'বলবেন, ড্যানসন নয়, বওমি বীচ থেকে উঠব আমরা। একটু দূর হয়ে যাবে অবশ্য, কিন্তু নিরাপত্তার খাতিরে এর দরকার আছে।'

'রাইট, স্যার।'

'কেন, ট্রাকে কেন?' ভুরু কোঁচকাল লেফটেন্যান্ট রাশেদ।

'কারণ আছে,' বলল রানা। 'সব কথা বলা যাবে না এখন। হাতে সময় নেই।'

'কিন্তু ট্রাকে তো বসতেই পারবেন না উনি। এত ঝাঁকি…'

'রাশেদ, বলছি এখন কথা বলে নষ্ট করার মত সময় একেবারেই নেই। উই মাস্ট মুভ। অ্যাটওয়ানস।'

'না না, এ হয় না। আপনারা ট্রাকে উঠুন। আমরা জীপে করেই নিয়ে যাব ওনাকে,' জেদের সুরে বলল রাশেদ।

'আমি যা বলছি, তাই হবে,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'আমি মিশন লীডার, আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।'

খেপে গেল রাশেদও। 'হতে পারেন। কিন্তু চিতা এখনও এ দেশে আছেন, আমরাও আছি তাঁর সাথে। তাঁর ভালমন্দের প্রশ্নে আমাদের মতামতের কোন দাম নেই? এরকম অসুস্থ মানুষটাকে এত পথ ট্রাকে করে নিয়ে যেতে চাইছেন আপনি, এটা কোন কথা হলো?'

'সোজা কথাটা কেন বুঝছেন না, আমি যা করছি, চিতার নিরাপত্তার কথা ভেবেই করছি।'

ভেতরের পরিবেশ পাল্টে গেছে। সবাই বুঝতে পারছে কোথাও কোনও গণ্ডগোল বেধে গেছে দু দলের দুই লীডারের মধ্যে। এক কোণে দাঁড়িয়ে চাপা কণ্ঠে বাক্‌বিতণ্ডা চলছে তাদের। মেজর জেনারেল ইবরাহিমও টের পেয়ে গেছেন ব্যাপারটা। পায়ে পায়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

'হোয়াট্‌স্ রঙ, মেজর?' আলতো করে রানার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি।

সমস্যাটা তাঁকে জানাল ও। অবশ্য হোমিং ডিভাইসটার প্রসঙ্গে বলল না

কিছুই। 'আমি যা করতে চাইছি, এর কোন বিকল্প নেই, স্যার। তাছাড়া, এ নিয়ে অযথা নষ্ট করার মত সময়ও নেই। আমাদেরকে এক্ষুণি বেরুতে হবে। যে কোন মুহূর্তে মারাত্মক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছি আমি।'

'ওকে, দেন,' ঘুরে রাশেদের মুখোমুখি হলেন মেজর জেনারেল। 'এ নিয়ে আর কথা বাড়ানোর সময় নেই, লেফটেন্যান্ট। ইউ হ্যাভ টু এগ্রী উইথ রানা।'

'কিন্তু ঝাঁকিতে আপনার ক্ষতি হতে পারে, স্যার,' গলায় আগের তেজ আর নেই রাশেদের।

'হবে না,' মিষ্টি করে হাসলেন চিতা। 'চারপাশে তোমরা আমার এত শুভাকাঙ্ক্ষী থাকতে কিচ্ছু হবে না আমার, দেখো। এ এসেছে আমার আরেক বন্ধুর পক্ষ থেকে, যদিও অনেক সিনিয়র তিনি আমার, তাঁকে আমি জানি, রাশেদ। ও আমার ভাল ছাড়া খারাপ চাইবে না।'

একটু চুপ করে থাকল রাশেদ। তারপর ইংরেজীতেই বলল, 'কিন্তু আমার একটা প্ল্যান আছে, স্যার। এটা মানতে হবে আপনাকে।'

'কি?'

'বডিগার্ড সবাইকে এখান থেকেই বিদেয় করে দিতে চেয়েছিলেন আপনি। কিন্তু ওরা সঙ্গে থাকবে আমাদের ড্যানসন বীচ পর্যন্ত।'

'এতে আমার কোন আপত্তি নেই,' বলে উঠল রানা। 'সবাই থাকলে বরং মনের জোর আরও বাড়বে আমার। তবে, ড্যানসন নয়, বওমী বীচ থেকে পিক আপ করা হবে আমাদের। আমার এই নতুন সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছি আমি লোটাসকে।'

'কেন' বলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল লেফটেন্যান্ট। 'এবারও নিশ্চই বলবেন, এরও কারণ আছে?'

'অফকোর্স। কারণ ছাড়া কেন করতে যাব আমি এসব?'

এফ. বি. ওসমানীর আফটার ডেক থেকে এক এক করে তিনটে বড় আকারের স্পীডবোট পানিতে নামানো হলো কপিকলের সাহায্যে। পিছনে এনজিন জুড়ে তৈরি করতে আধ ঘণ্টার মত সময় ব্যয় হলো। যুদ্ধের সাজে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ষোলোজন নির্ভীক কমান্ডো উঠে পড়ল ওগুলোয় ভাগ ভাগ হয়ে।

ঠিক চারটের সময় নির্দেশ দিল মেজর আনোয়ার, 'লাইটনিং, গো!'

মৃদু গর্জন করে চালু হলো মোটরগুলো। মন্থর গতিতে উপকূলের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল তিনটে স্পীডবোট।

ওদিকে থারাওয়াদ্দি পৌঁছেই সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছে কর্নেল মঙ। সারারাত ধরে নির্বিবাদে এগোতে থাকবে শত্রু, ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না তার। রানারা যখন ইরাবতি পেরিয়ে পশ্চিমমুখো হাইওয়েতে উঠেছে, সেই সময় থারাওয়াদ্দির সামরিক এয়ারস্ট্রীপ থেকে আকাশে উঠল দুটো প্রকাণ্ড হেলিকপ্টার। একটায় রয়েছে বিশজন কমান্ডো, মেজর নিয়ন্ট-এর নেতৃত্বে।

অন্যটায় সে নিজে এবং আরও জনাদশেক কমান্ডো।

সারারাত ধরে অনুসরণ করবে সে গাড়ি দুটোকে। দূর থেকে। প্রয়োজনে কাছাকাছি কোন সামরিক হেলিপ্যাডে নেমে রিফুয়েলিঙ সেরে আবার উঠবে আকাশে। ইচ্ছে করলে রাতের অন্ধকারেই হামলা চালাতে পারে সে, কিন্তু তাতে চিতার পালিয়ে যাওয়ার ভয় আছে। কিছু টের পেয়ে যদি পথের মাঝে গাড়ি ফেলে গা ঢাকা দেয়, তাহলে আর কোনদিন ধরা যাবে না ব্যাটাকে। ব্যর্থ হয়ে যাবে এত পরিশ্রম।

তীরবেগে ছুটছে প্রায় নতুন মিটসুবিশি ট্রাক। চালাচ্ছে আবদুর রহমান। মাসুদ রানা তার পাশে বসেছে। মেজর জেনারেল সহ অন্যরা সবাই পিছনে। সমুদ্র তীরের কাছাকাছি ছোট ছোট শহর ও পর্যটন কেন্দ্রগুলোয় যাওয়ার রাস্তা এই একটাই। মোটামুটি ভালই রাস্তা, খুব একটা ঝাঁকি লাগছে না।

জীপটাকে অন্য পথে আকিয়াবের দিকে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল রানা। কিন্তু বাদ সাধল এই রাস্তা। ওদিকে যাওয়ার অন্য যে পথটা আছে, সেটায় উঠতে হলে একেবারে থারাওয়াদ্দি শহরের বুকের ওপর দিয়ে অন্তত ছ সাত মাইল চলতে হবে। আবার তা করতে গেলে মঙের কয়েক ডজন চরের চোখে পড়ে যেত জীপটা।

তাহলে সাথে সাথে খবর পেয়ে যেত মঙ যে গাড়ি খালি, শুধু চালক ছাড়া আর কেউ নেই ওটায়। তখন নিশ্চয়ই এই ট্রাকের পিছনে লাগত সে। ও নিশ্চয়ই জানে, জীপই শুধু নয়, একটা ট্রাকও আছে ওদের সাথে। আগে এটার কথা জানা না থাকলেও বিকেলে জেনেছে কর্নেল ব্যাপারটা, রাশেদ যখন জঙ্গল ছেড়ে রওনা হয় পোড়ো মন্দিরের উদ্দেশে। তাই বাধ্য হয়েই জীপটাকে সঙ্গে আনতে হয়েছে ওকে। ট্রাকের চার-পাঁচ মাইল পিছন পিছন আসছে ওটা। ভোর চার কি সাড়ে চারটের সময় বাঁক নিয়ে ডানে ঘুরে যাবে ল্যান্ড রোভার, আকিয়াব যাওয়ার বিকল্প পথ ওটা। তখন খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। ওটার চালক, কায়েসকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে রানা, ওই রাস্তায় উঠে বেশ কিছুদূর এগিয়েই গাড়ি থামাতে হবে, পিছনের মাডগার্ড থেকে খুলে ফেলতে হবে ডিভাইসটা। তারপর জানপ্রাণ নিয়ে ভাগতে হবে।

সকালে এই যুবকই ওই চার ইনফরমারের খোঁজ নিয়ে এসেছিল। মেজর জেনারেল ইবরাহিম আগেই সব ঝামেলা মিটিয়ে দিয়েছেন রানার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তুলতে বারণ করে। কাজেই ইচ্ছে থাকলেও জিজ্ঞেস করতে পারেনি রাশেদ, কেন এসব করছে ও।

নদী পার হওয়ার সময় ঝামেলার আশঙ্কা করেছিল রানা। সতর্কও ছিল। কিন্তু ঘটেনি কিছুই। নিরাপদেই ইরাবতি পার হয়ে এসেছে। তাই বলে উদ্বেগ মোটেই কমেনি রানার। ছিলার মত টানটান হয়ে আছে, সতর্ক নজর রেখেছে সবদিকে। বিপদ যদি আসেই, আগেভাগে তা টের পেতে চায়।

বাজুকাটা নিজের কাছে রেখেছে রানা, ওর পায়ের কাছে ভাল-মানুষের ছা'র মত শুয়ে আছে ওটা। এছাড়া আছে একটা স্টেন আর তিনটে গ্রেনেড।

মাঝেমধ্যে এক আধটা মালবাহী ট্রাক দেখা যাচ্ছে, তীব্র হর্ন বাজিয়ে সাঁ করে পাশ কাটিয়ে ছুটে যাচ্ছে উল্টোদিকে।

কাছের একটা হেলিপ্যাড থেকে এইমাত্র রিফুয়েলিঙ সেরে আকাশে উঠেছে কর্নেল। একটু একটু করে দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। এই সময় ব্যাপারটা চোখে পড়ল তার। চলতে চলতে আচমকা ডানে বাঁক নিয়েছে ল্যান্ড রোভারটা। অথচ ওটার আগের ট্রাকটা সোজাই ছুটছে। যদিও তিন-চার মাইল আগে রয়েছে ওটা, কিন্তু অনেক উঁচুতে রয়েছে কর্নেলের কপ্টার, ফলে দুটোকেই দেখতে পাচ্ছে সে।

মনে মনে নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'ব্যাপারটা কি?'

পাইলটের কাঁধে টোকা দিয়ে জীপটা দেখাল সে। 'ওটার সামনে চলো,' বলেই মেজর নিয়ন্টের সাথে কথা বলতে শুরু করল ব্যস্ত হয়ে।

ততক্ষণে জীপটার মাথার ওপর পৌঁছে গেছে তার প্রকাণ্ড কপ্টার, দ্রুত নিচে নামছে এখন।

'সামনে গিয়ে রাস্তার ওপর ল্যান্ড করবে,' পাইলটের উদ্দেশে বলল কর্নেল। 'ওটার এগোবার পথ বন্ধ করে দিতে হবে। পারবে না?'

রাস্তার দু দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গাছপালাহীন ফাঁকা একটা জায়গা খুঁজে পেল সে। কপ্টারের নাক সেদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলল লোকটা, 'পারব, কর্নেল।'

পাশ থেকে বিনকিউলারটা তুলে নিয়ে চোখে লাগাল কর্নেল। দ্রুত ফরসা হয়ে আসছে চারদিক। গাড়ির ভেতরটা কেমন ফাঁকা মনে হচ্ছে যেন—যদিও পুরোপুরি নিশ্চিত নয় সে এখনও। মেজরের সাথে কথা বলল আবার মঙ, তাকে গাড়িটার পিছনে, যতটা সম্ভব নিচে নেমে আসার নির্দেশ দিল।

বিপদ টের পেয়ে গেছে কায়েস। সামনেই কর্নেল মঙের দানবীয় কপ্টারটাকে ল্যান্ড করার তোড়জোড় করতে দেখে চট্ করে এক্সিলারেটরের ওপর পায়ের চাপ কমিয়ে দিল সে। কিন্তু ল্যান্ড করল না ওটা, একেবারে সামনে থেকে ভেতরটা দেখে নিয়ে যখন নিশ্চিত হলো কর্নেল যে আর কেউ নেই ল্যান্ড রোভারে, পিছন থেকে নজর বুলিয়ে মেজরও যখন ওই একই মত পোষণ করল, সাঁ করে আবার আকাশে উঠে পড়ল কপ্টারটা।

'হারামজাদাকে শেষ করে রেখে এসো,' মেজরকে হুকুম দিল কর্নেল, রেগে ভোম হয়ে গেছে। 'আমি যাচ্ছি ওই ট্রাক ধরতে, তাড়াতাড়ি এসো।'

কাত হয়ে দ্রুত উঠে যেতে লাগল কপ্টারটা, তারপর নাক ঘুরিয়ে নিয়ে পশ্চিমদিকে ছুটল আড়াআড়িভাবে।

ল্যান্ড রোভারের মাথার ওপর দিয়ে সামনে চলে এল মেজর নিয়ন্ট। পিছনদিকের একটা টানা দরজা খুলে গেল ভেতর থেকে এক হ্যাঁচকা টান খেয়ে। দেখতে পেল কায়েস, দরজা গলে বেরিয়ে এল একটা হেভি মেশিনগানের নল, অ্যামুনিশন বেল্টটাও পরিষ্কার চোখে পড়ল।

গতি কমে গেছে অনেক, প্রাণপণে ব্রেক কষল সে। এরই মাঝে দেখতে

পেল, উল্টোদিক থেকে দু তিনটে মাল বোঝাই ট্রাক এদিকেই আসছিল, সামনের ব্যাপার দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে তারা। কড়া ব্রেকের ফলে প্রায় জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল ল্যান্ড রোভার, সেই সাথে ঘুরে গেছে পিছনদিকটা। এতে সুবিধেই হলো কায়েসের, পাশ থেকে স্টেনটা খাবলা মেরে তুলে নিয়েই দরজা খুলে ঝাঁপ দিল সে অন্যদিক দিয়ে। গাড়িটাই ওকে আড়াল করে রেখেছে এখন।

বাঁ কনুই আর কাঁধ দিয়ে পাকা রাস্তায় আছড়ে পড়ল কায়েস, প্রচণ্ড ঘষা লেগে ছাল-চামড়া উঠে গেল কয়েক জায়গার। খোলা প্রান্তর কেঁপে উঠল হেভি মেশিনগানের গুম গুম গুম গুম একটানা আওয়াজে। একটা গুলিও সম্ভবত মিস্ করেনি গানার, ল্যান্ড রোভারের ওপাশটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

আওয়াজ পাল্টে গেছে কপ্টারের, ঘুরে এপাশে আসছে ওটা বোঝা গেল। ক্রল করে গাড়ির সামনে চলে এল কায়েস, চট্ করে একবার মাথা তুলেই নামিয়ে নিয়েছে। ওরই মাঝে চোখে পড়েছে, পিছন দিক থেকে গাড়ির বিশ-ত্রিশ গজের মধ্যে চলে এসেছে দানবীয় কপ্টার। রোটর ব্লেডের কর্কশ কট্ কট্ কট্ কট্ আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়, ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে চারদিক। পথের দুপাশের শস্যখেত শুয়ে পড়ছে কাত হয়ে প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাসে।

আবার হুঙ্কার ছাড়ল মেশিনগান। সাবধানে ঘুরে অন্যপাশে চলে এল কায়েস, ছিন্নভিন্ন গাড়ির দেয়ালের গায়ে পিঠ ঘষে ঘষে পিছনে এসে দাঁড়াল। ঘামছে দরদর করে। মেশিনগানের আরেকবার বিরতির অপেক্ষায় আছে। জানে, এ খেলা বেশিক্ষণ চলবে না, এখনই হয়তো গ্রেনেড চার্জ করবে ওরা। এ ও বুঝে নিয়েছে, আর বড়জোর কয়েক সেকেন্ড আছে তার আয়ু। কাজেই যা করার প্রথম সুযোগেই করতে হবে।

থেমে গেল মেশিনগান। গলা টান করে ওকে খুঁজছে গানার। তার পাশে আরেকজনকে দেখতে পেল কায়েস, হাঁটু গেড়ে বসে গ্রেনেডের পিন খুলছে। খুলে ফেলেছে। ঝট্ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল কায়েস—প্রচণ্ড বাতাসে মাথার সাথে চুলগুলো লেপ্টে গেছে, শার্ট-প্যান্ট সেঁটে আছে দেহের সাথে।

রোটরের আওয়াজে প্রায় চাপা পড়ে গেল কায়েসের স্টেনের গর্জন। একই মুহূর্তে গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিল দ্বিতীয় কমান্ডো। পরপর তিনটে বুলেট ঢুকল তার বুকে, ঝাঁকি লেগে হাতটা কেঁপে গেল তার। গাড়ির সামনের দিকে ছুঁড়তে চেয়েছিল সে ভয়ঙ্কর ডিমটা, কিন্তু হাত কেঁপে যাওয়ায় অতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারল না ওটা। ঠাস্ করে আছড়ে পড়ল ঠিক কায়েসের দু পায়ের ফাঁকে। লাফিয়ে সরে গেল কায়েস, গড়িয়ে বেশ অনেকদূর চলে গেল গ্রেনেড, তারপর ফাটল নিরাপদ দূরত্বে। আবার ট্রিগার টানল কায়েস। একটা গুলি ঢুকে গেল গানারের ডান চোখের মধ্যে। সামনে ঝুঁকে এল গানার, দেহটা বেরিয়ে আসছে খোলা দরজা দিয়ে। এই সময় সামনের দরজা খুলে গেল ঝট্ করে, পা দিয়ে ওটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে মেজর নিয়ন্ট, যাতে বাতাসে বন্ধ হয়ে যেতে না পারে। আগেই নিজের পিস্তলটা বের করে নিয়েছে। কায়েসকে

লক্ষ্য করে পুরো ম্যাগাজিন শেষ করে ফেলল সে। ছিট্‌কে পড়ল কায়েস, একটা বুলেট লেগেছে বুকে, আরেকটা তলপেটে। পড়ে গেল মাটিতে। একই সাথে গানারের দেহটাও ধড়াস্ করে আছড়ে পড়ল এসে তার পাশে। নিষ্পলক, প্রাণহীন চোখে একে অন্যের দিকে চেয়ে আছে ওরা দুজন। নিচের দৃশ্যটা ঝুঁকে পড়ে দেখল কিছুক্ষণ নিয়ন্ট, তারপর টেনে বন্ধ করে দিল দরজা। তার ইঙ্গিতে ঘুরে গেল কপ্টার। পিছনদিকে তাকাল মেজর। নিহত কমান্ডোকে চারপাশ থেকে ঘিরে বসে আছে অন্যরা। স্লাইডিং ডোর বন্ধ করার নির্দেশ দিল সে।

ওদিকে অনেক দূর থেকে কোনাকুনিভাবে ছুটে আসা কালচে বিভীষিকাটা চোখে পড়ল রানার হঠাৎ করেই। প্রায় একই সাথে রহমানও ওটাকে দেখতে পেয়েছে। তবে খুব একটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না তার মধ্যে, কেবল গাড়ির গতি আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিল।

ঘুরে বসে ক্যাবের কাঁচের পার্টিশনের গায়ে ধুম ধুম করে কয়েকটা কিল লাগাল রানা। ছুটে এল রাশেদ আর গোরা। ইশারায় কপ্টারটা দেখাল ও তাদের। দরজা খুলে পিছন ফিরে চেঁচিয়ে বলল, 'গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লে নেমে পড়বেন সবাই, রাস্তার পাশে শেল্টার নেবেন।'

দেখতে দেখতে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল ওটা। ঘুরে সামনে চলে গেল।

পায়ের কাছ থেকে বাজুকা তুলে নিল রানা। মনে মনে এ ধরনের কিছু একটা আশঙ্কা করছিল ও সারারাত ধরেই। বুঝে নিয়েছিল, রাতের চেয়ে দিনের আলোকেই বেছে নেবে কর্নেল হামলা চালাবার জন্যে। ওটাই তার জন্যে সুবিধেজনক হবে। সামনে তাকাল রানা। দূরে চলে গিয়েছিল কপ্টারটা, ফিরে আসছে আবার। অনেকটা নিচে নেমে এসেছে। ওটার আকার দেখে কিছুটা বিস্মিত হলো সে।

তার মানে কি সঙ্গে করেই সৈন্য সামন্ত নিয়ে এসেছে কর্নেল? এরা ছাড়া সামনে আর কোন রোড ব্লক নেই? সামনে সোজা রাস্তা, দু পাশের শস্যখেত থেকে বেশ খানিকটা উঁচু। রাস্তার দু পাশে তেমন বড় কোন গাছপালাও নেই। কারণটা একটু লক্ষ করতেই বুঝল রানা। প্রায় নতুন রাস্তা এটা। দু পাশে ছোট ছোট গাছ দেখা যাচ্ছে, পাঁচ ছ ফুটের বেশি লম্বা হবে না কোনটা।

ঝপ্ করে অনেক নেমে এল কপ্টার। ভাব দেখে মনে হলো যেন ল্যান্ড করতে যাচ্ছে রাস্তার ওপরই। ব্যস্ত হয়ে ডানে-বাঁয়ে চাইল রানা। এমন এক জায়গা এটা, গাড়ি ছেড়ে কোথাও যে গা ঢাকা দেবে, উপায় নেই তার। দুদিকে ফসলের খেত, একদম খোলামেলা। সবাইকে শেয়ালের মত তাড়া করেই ধরতে পারবে কর্নেল মঙ।

এই সময় বাইরের বড় রিয়ার ভিউ মিররে পলকের জন্যে আরেকটা কপ্টারের ছায়া পড়ল। আঁতকে উঠল রানা। সর্বনাশ! ডান হাতে রহমানের একটা হাত চেপে ধরল ও, ইশারায় গাড়ি থামাতে বলল লোকটাকে। সামনের কপ্টার ততক্ষণে সত্যি সত্যি পথের ওপর নেমে পড়ার আয়োজন সম্পন্ন করেছে। দরজা খুলে একলাফে বেরিয়ে এল রানা। পিছন থেকে

অন্যরাও ঝপাঝপ্ লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাস্তার দু পাশে নেমে গিয়ে শুয়ে পড়ল ঢালের ওপর।

ট্রাকের বড়জোর একশো গজ সামনে ল্যান্ড করল প্রথম দৈত্যাকার কপ্টারটা। দু পাশের স্লাইডিং দরজা খুলে নেমে পড়ল আট দশজন কমান্ডো, অস্ত্র বাগিয়ে একলাফে ঢাল বেয়ে নেমে গেল তারা, মুহূর্তে চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল। ওটার সামনের দরজা খুলে গেল, ভেতর থেকে ছিট্কে বেরিয়ে এল কর্নেল মঙ। শুয়ে পড়ল সে রাস্তার ওপর। তার চারপাশে ধুলোর ঝড় বেয়ে যাচ্ছে। তবে রোটরের আওয়াজ কমে আসছে এখন, এনজিন অফ করে নেমে পড়েছে পাইলটও।

ট্রাকের পিছনে এসে বসে পড়ল রানা। রাশেদকে বলল, 'আপনি আপনার লোকদের নিয়ে সামনের ওদের ঠেকান। আমি এদিক দেখছি। কপ্টারের গায়ে গুলি করে না যেন কেউ।'

মুখের সামনে মেগাফোন ধরে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল কর্নেল মঙ, 'সারেন্ডার! সারেন্ডার! মেজর জেনারেল, সারেন্ডার করুন। তাহলে কারও কোন ক্ষতি করা হবে না। খবরদার, কেউ পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করার নির্দেশ দেব আমি,' বার বার একই কথা বলে চলেছে সে।

রাস্তার বাঁ দিকে উঁকি দিল রানা। মেজর জেনারেল আর জিনিয়াকে নিজেদের দেহ দিয়ে আড়াল করে রেখেছে তার পাঁচ ছ'জন বডিগার্ড। গোরা আর জসিম রয়েছে ওদের সামান্য এপাশে। দু'জনের হাতে দুটো স্টেন। রানার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে ওরা। পিছনের কপ্টার এর মধ্যে অনেক নেমে এসেছে, আর দু মিনিটের মধ্যে ল্যান্ড করবে।

চোখের সামনে ওটার মস্ত পেট দেখতে পাচ্ছে রানা, নাক ওপরদিকে করে নেমে আসছে একটু একটু করে। যখন মনে হলো সময় হয়েছে, ঝট্ করে সিধে হলো, বাজুকা কাঁধে ঠেকিয়েই টেনে দিল ট্রিগার। প্রচণ্ড 'গুড়ুম' শব্দে তালা লেগে গেল কানে।

ঠিক মেজর নিয়েন্ট আর পাইলটের পায়ের কাছে, সামান্য নিচে আঘাত করল গোলাটা, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল প্রকাণ্ড গঙ্গাফড়িং। ফ্লোর ভেদ করে ক্যাবের ট্র্যান্সপ্যারেন্ট আবরণ গুঁড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল গোলা। নাক নিচু করে সাঁ করে মাটির দিকে নেমে আসতে লাগল কপ্টার গোঁত্তা খাওয়া ঘুড়ির মত।

বাজুকা রি-লোড করে আবার ট্রিগার টানল রানা, দু সেকেন্ডও পার হয়নি, দ্বিতীয় গোলার আঘাতে মাঝখান থেকে প্রায় দুভাগ হয়ে গেল কপ্টার। ভেতর থেকে ছিটকে শূন্যে বেরিয়ে এল বড়সড় পুতুল আকারের কয়েকজন সুসজ্জিত সৈনিক, বাতাসে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সবেগে নেমে আসছে।

পরমুহূর্তে প্রথম কপ্টারের কমান্ডোরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল অন্ধের মত। কর্নেল মঙ টের পেয়ে গেছে, সারেন্ডার করার ইচ্ছে নেই চিতার। প্রথম মর্টারটা ফোটার আওয়াজে ঘাবড়ে গেল সে, মেগাফোন ছুঁড়ে ফেলে দুই গড়ান দিয়ে রাস্তা থেকে নেমে পড়ল।

এই সময় ভয়ানক জোরে কেঁপে উঠল মাটি, সেই সাথে প্রচণ্ড কড়কড় মড়মড় আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠল চারদিক। পথের ওপরই আছড়ে পড়েছে কপ্টার। হালকা একটা বিস্ফোরণের শব্দ উঠল, পরমুহূর্তে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ওটা। পেট্রোল ট্যাঙ্ক বার্স্ট করেছে। অসংখ্য আগুনের শিখা চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল দলা পাকানো লোহার স্তূপটাকে।

ওদিকে দুপক্ষ তখন মেতে উঠেছে তুমুল যুদ্ধে। একটা কপ্টারকে ভূপাতিত হতে দেখে মনোবল বহুগুণ বেড়ে গেছে রোহিঙ্গাদের। অবশ্য বেশি গুলি ছোঁড়া যাবে না, অ্যামুনিশন বেশি নেই, জানে ওরা। তাই একটা দুটো গুলি ছুঁড়েই চুপ মেরে যাচ্ছে, তার একশোটা জবাব দিচ্ছে কমান্ডোরা। পুরো একটা রণক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে জায়গাটা। এর মধ্যে চারদিক আরও ফরসা হয়ে এসেছে, যদিও সূর্য উঠতে দেরি আছে এখনও।

এই সময় ব্যাপারটা খেয়াল হলো রানার। মনে হলো, একটু আগে কর্নেল মঙকে রাস্তার পাশে গড়িয়ে নেমে যেতে দেখেছে ও। যেদিকে সে নেমেছে, সেদিকে বড়জোর দুজন কমান্ডো রয়েছে। অন্যরা সবাই রাস্তার ওপাশে। দেহমনে আনন্দের একটা শিহরণ বয়ে গেল ওর। ক্রল করে গোরার পাশে চলে এল তাড়াতাড়ি।

এপারেই আছে কর্নেল মঙ। কিন্তু রাস্তাটা সামনে অল্প একটু বাঁক খেয়ে গেছে বলে দেখা যাচ্ছে না ব্যাটাকে। জসিম আর গোরাকে এগিয়ে গিয়ে ওই বাঁকের মুখটার কাছে পজিশন নিতে বলল রানা। নির্দেশ দিল কর্নেল যদি উঠে পালাবার চেষ্টা করে, তাহলে ওর আশপাশ দিয়ে ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে হবে। যে ভাবে হোক বাধা দিতে হবে তাকে, তবে গায়ে গুলি করা চলবে না। নীরবে সায় দিল ওরা দুজন। বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল বাঁকটার দিকে।

মেজর জেনারেলের দিকে তাকাল রানা এক পলক। কিছু একটা বললেন তিনি ওকে, কিন্তু শুনতে পেল না রানা। তাঁর বডিগার্ডদের একজনের হাত থেকে একটা স্টেন নিয়ে ঢাল বেয়ে শস্য খেতে নেমে এল ও। গমের খেত এটা, প্রায় কোমর সমান লম্বা গাছগুলো।

প্রথমে খেতের অনেকখানি ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। কোমরের কাছে শরীরটাকে দু ভাঁজ করে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। ঘুরপথে কর্নেল মঙের কাছে পৌঁছুতে চায়। দূর থেকে চট্ করে মাথা তুলে তার অবস্থানটা একবার দেখে নিল। সাথে সাথে দাঁত বেরিয়ে পড়ল রানার। আছে! ঢালের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে আছে ব্যাটা, ভয় পেয়েছে।

পিছন থেকে ওদের পঞ্চাশ গজের মধ্যে থামল রানা। আগে ওর সঙ্গের দুই হারামজাদাকে শেষ করতে হবে। উঁকি দিল ও সাবধানে। এত সৌভাগ্য, ঠিক যেন বিশ্বাস হতে চায় না, এর চেয়ে সহজ টার্গেট আর হতেই পারে না। দেয়ালের গায়ে বড় দুটো টিকটিকি যেন ঝুলে আছে। মাঝে মধ্যে গুলি ছুঁড়ছে, আবার মাথা নামিয়ে নিচ্ছে।

খুব সাবধানে একজনের কানের নিচে লক্ষ্যস্থির করল রানা। আলতো করে টেনে দিল ট্রিগার, ওদিকের গোলাগুলির আওয়াজের সাথে মিলেমিশে

এক হয়ে গেল শব্দটা। শুয়েই থাকল কমান্ডো খানিকক্ষণ, তারপর পিছলে নেমে এল দেহটা মাঠে। কর্নেল মঙের আঁতকে ওঠা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। টুপ্ করে বসে পড়ল গম গাছের মধ্যে।

কয়েক সেকেন্ড পর আবার মাথা তুলল। ওরা বুঝতেই পারেনি গুলিটা কোনদিক থেকে এসেছে। ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখার দরকারও বোধ করছে না হয়তো, নিজেদের জান নিয়েই ব্যস্ত। ধীরেসুস্থে পরেরজনের কলজে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করল রানা নিখুঁতভাবে। এইবার ধড়মড় করে উঠে বসল কর্নেল, উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দিতে গেল রাস্তার ওপারে যাওয়ার জন্যে, এই সময় বাঁকের কাছ থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল গোরা আর জসিম।

আশপাশ দিয়ে ভ্রমরের মত বোঁ বোঁ করতে করতে ছুটে যাচ্ছে অসংখ্য গুলি। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল মঙ, হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল আবার মাটিতে বুক দিয়ে—ঠিক নিজের থেকে নয়, পা হড়কে যাওয়ায় আপনাআপনিই পড়ে গেল জলহস্তী। সেই সাথে শেষ ভরসা হাতে ধরা অস্ত্রটাও ছুটে গেছে।

এরমধ্যে বুকে হেঁটে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে রানা। কর্নেল যখন অস্ত্রটা খুঁজে বের করতে ব্যস্ত, সেই সময় তার পাঁচ হাতের মধ্যে পৌঁছে গেছে ও। এবার ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। স্টেন বাগিয়ে ধরে আছে লোকটার পেট লক্ষ্য করে।

'গুড মর্নিং, কর্নেল।'

আঁতকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। প্রকাণ্ড মুখটা ঘামে ভিজে সপসপে হয়ে আছে, বেকুবের মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল সে রানার মুখের দিকে।

'আপনার লোকদের গুলি বন্ধ করার অর্ডার দিন,' এক পা এগোল ও।

'আ-আপনি কে?' কোনরকমে উচ্চারণ করল কর্নেল কাঁপা গলায়।

'আনুষ্ঠানিক পরিচয় পর্ব পরে সারা যাবে, আগে যা বলছি, তাই করুন,' তার পেটের সাথে স্টেনের নল ঠেকিয়ে জোরে একটা গুঁতো মারল রানা।

সভয়ে চোখ বুজল কর্নেল। ভাঙা, বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'সিজ ফায়ার! সিজ ফায়ার! গোলাগুলি বন্ধ করো তোমরা। আমি কর্নেল মঙ বলছি, সিজ ফায়ার!'

প্রথমে একটু দ্বিধায় পড়ে গেল কমান্ডোরা। কিন্তু যখন বুঝল ওটা সত্যিই কর্নেলের গলা, তখন গুলি বন্ধ করল। ওদিকে বাঁকের মুখে বসা গোরা-জসিম দূর থেকে কর্নেলকে আটক করার ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছে। হৈ হৈ করতে করতে রাস্তার ওপর উঠে এল তারা।

কর্নেলকে ঠেলে গুঁতিয়ে রাস্তায় তুলে আনল রানা। বলল, 'আপনার লোকদের বলুন, আর্মস সারেন্ডার করতে। একটা পিনও যেন খুঁজে না পাই কারও পকেটে।'

সাথে সাথে নির্দেশ পালন করল মঙ। হাতের অস্ত্র, গোলাবারুদ মায় হেলমেটটা পর্যন্ত খুলে সাজিয়ে রাখল তারা কর্নেলের হুকুমে। তারপর পিছিয়ে গেল বিশহাত। চিতাকে মাঝখানে নিয়ে হাসিমুখে এগিয়ে আসছে রোহিঙ্গারা,

মার্চের ভঙ্গিতে। পিছন পিছন আসছে জিনিয়া, গোরা আর জসিম।

সবাইকে সশরীরে দেখতে পেয়ে মনে মনে হাসল রানা। ঘড়ির ওপর চোখ বোলাল। ভালই যুদ্ধ হলো, ভাবল ও, মাত্র ছয় মিনিটে মামলা ডিসমিস। সামান্য আহত পর্যন্ত হয়নি কেউ।

'আপনার পাইলটকে ডাকুন,' বলল রানা।

'কেন?'

'ফের কথা বলে!' দাবড়ি লাগাল রানা।

এত মানুষের সামনে বেইজ্জত হতে হচ্ছে বলে কান গরম হয়ে উঠল কর্নেলের, কমান্ডোদের দিকে ফিরে কি যেন বলল সে। তাদের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এল একজন, ভয়ে ভয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

'রাশেদ!'

'ইয়েস, মেজর।' হাসি আর ধরে না লেফটেন্যান্টের। সামনে এসে খটাশ্ করে স্যালুট ঠুকল রানাকে।

হেসে ফেলল ও। বলল, 'ওদের আর্মসগুলো ট্রাকে তুলুন। এখনই রওনা হব আমরা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মেজর জেনারেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিন, কুইক!'

'সে কি, আমরা যাব না?'

'দরকার নেই। এই কপ্টার নিয়ে যাচ্ছি আমরা। আপনারা ফিরে যান।'

'কিন্তু...'

'ভাববেন না, সিকিউরিটি হিসেবে কর্নেলকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। আমাদের টেরিটোরিতে নিয়ে কাপড়-চোপড় খুলে ছেড়ে দেব।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাশেদের চেহারা। মাথা দোলাল সে, 'সেই ভাল। কপ্টারে খুব তাড়াতাড়ি হবে।'

ঘুরে দাঁড়াল। তাড়াহুড়ো করে কমান্ডোদের সমর্পণ করা অস্ত্রগুলো তুলে ফেলা হলো ট্রাকে। জাহেদকে তুলে দেয়া হলো কপ্টারে। এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছে সে। কর্নেলকে আটক করা হয়েছে শুনে খুশি।

অশ্রুভেজা চোখে তাদের প্রিয় চিতাকে বিদায় জানাল রোহিঙ্গারা। পানি এসে গেছে তাঁর চোখেও। সবার উদ্দেশে বললেন, 'বাংলাদেশে যাচ্ছি বলে ভেব না, ওখানেই থেকে যাব আমি। খুব শিগ্‌গিরই আবার তোমাদের মাঝে ফিরে আসব। ও দেশে যাচ্ছি, তার বিশেষ কারণ আছে। ওখানে পৌঁছে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে এদেশের সরকারের মুখোশ খুলে দিতে চাই আমি। পৃথিবীকে জানাতে চাই স্বৈরাচারী কমিউনিস্ট সরকার কি ভাবে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের এই সোনার দেশটাকে।

'তোমরা লড়ে যাও। জয় আমাদের হবেই।' গলা বুজে এল মেজর জেনারেলের। তাড়াতাড়ি কপ্টারে উঠে পড়লেন তিনি।

জসিম, গোরা আর জিনিয়াও উঠল এবার। চার পাঁচজন রোহিঙ্গা চ্যাঙদোলা করে কপ্টারে তুলে দিল জলহস্তীকে। পাইলটকে ঠেলে তার সীটে তুলে দিল রানা। কড়া গলায় তাকে হুঁশিয়ার করল। 'প্রাণে বাঁচতে চাইলে

অক্ষরে অক্ষরে আমার নির্দেশ মেনে চলবে। তাহলে আজ না হোক কাল বাড়ি ফিরে বৌ-বাচ্চার মুখ দেখতে পাবে। ওকে?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল পাইলট। 'শিওর, স্যার।'

পাঁচ মিনিট পর আকাশে উঠল হেলিকপ্টার। নিচ থেকে মাথার ওপর হাত তুলে দোলাচ্ছে সবাই। ক্রমে ছোট হয়ে এল কাঠামোগুলো। ওদিকে দ্বিতীয় কপ্টারের আগুন প্রায় নিভে এসেছে। একটু একটু করে রাঙা হয়ে উঠছে পুবের আকাশ।

বারো

মাত্র কুড়ি মিনিটে বওমি বীচ পৌঁছল ওরা। সূর্য উঠি উঠি করেও দ্বিধায় পড়ে গেছে মেঘের জন্যে। হঠাৎ করে মেঘ জমতে শুরু করেছে, বৃষ্টি নামবে যে কোন সময়।

এককালে জমজমাট পর্যটন কেন্দ্র ছিল বওমি, তার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও আছে। ব্রিটিশ আমলের ছিল বলে সুযোগ-সুবিধে তেমন ছিল না। পুরানো হোটেল-মোটেল, মার্কেট ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় চারদিকে। এখন স্রেফ একটা জেলে পল্লী এটা। দেশী-বিদেশী পর্যটকদের চাহিদার কথা ভেবে কয়েকবছর আগে কিছু দূরে, ড্যানসন বীচে সরিয়ে নেয়া হয়েছে পর্যটন কেন্দ্র। ওখানে সব আধুনিক ব্যবস্থা।

একটু দূরে এক জেলে পল্লী চোখে পড়ল রানার। জীর্ণ, ভাঙাচোরা কুটির। বাঁশের আড়ায় শুকোতে দেয়া জাল, শুঁটকি মাছ দেখা যাচ্ছে। কপ্টারের আওয়াজ শুনে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একদল হাড় জিরজিরে ছেলেমেয়ে। বড়রাও বেরিয়ে এল। কপ্টার দেখে শিশুরা হাত নাড়তে লাগল প্রবলবেগে।

চোখ কুঁচকে সামনে, ডানে-বাঁয়ে নজর বোলাল মাসুদ রানা। চিন্তায় পড়ে গেল। ওরা কি আসেনি? নাকি এসেছে, গা ঢাকা দিয়ে আছে আশপাশে? তাই হবে। ওদের কপ্টারে আসার কথা ছিল না, ছিল সড়কপথে। ঠিক তাই, ভাবল ও। আর্মির ছাপ মারা যন্ত্র ফড়িং দেখে ব্যাপার বোঝার জন্যে গা ঢাকা দিয়েছে কমান্ডো বাহিনী। নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বের হবে না।

হাত তুলে পাইলটকে সমুদ্রের তীরঘেঁষা একটা জায়গা দেখাল ও। 'ওখানে ল্যান্ড করো।'

মাথা ঝাঁকাল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে কর্নেল মঙকে দেখল রানা। হেরে যাওয়ার লজ্জায় চেহারা হাঁড়ির তলা করে রেখেছে। নিচের ঠোঁট ঝুলে আছে বিশ্রীভাবে, ভেতরের কালো মাড়ি দেখা যাচ্ছে। ওর সাথে চোখাচোখি হতে মুখ ঘুরিয়ে নিল জলহস্তী। জিনিয়া বোধহয় ওকেই দেখছিল, হাসল সে মুখ টিপে। কৃতজ্ঞতার হাসি। হঠাৎ যেন বদলে গেল তা, অন্যরকম হয়ে উঠল।

রক্তিম আভা ফুটল দুই গালে। ব্যাপার টের পেয়ে সে-ও জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখায় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

নেমে পড়ল কপ্টার। রানার অনুমানই ঠিক, পরিস্থিতি বোঝার জন্যে তীর থেকে খানিকটা দূরে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ছিল লাইটনিং কমান্ডো বাহিনী। ওদের দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে এল, কয়েকজন বোট দুটো টেনে নিয়ে আসছে বালির ওপর দিয়ে।

একেবারে আঁধার হয়ে এসেছে চারদিক। হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েই শুরু হয়ে গেল ঝমাঝম্ বৃষ্টি। আড়াল নেই, কাজেই গা বাঁচাবার চেষ্টায় ব্যস্ত হলো না কেউ, ভিজে চুপচুপে হয়ে স্পীড বোটে উঠল। মঙকে কষ্ট করে হেঁটে গিয়ে উঠতে হলো না, দু'তিনজন কমান্ডো ঠেলে-গুঁতিয়ে তুলে দিল। পাইলট মানুষটা সেয়ানা। তার দিকে কারও নজর পড়ার আগেই প্রায় দৌড়ে গিয়ে বোটে উঠল সে, ধাক্কা-গুঁতোর হাত থেকে বাঁচা গেছে ভেবে মনে মনে বুদ্ধকে ধন্যবাদ জানাল।

দলটাকে অপেক্ষা করতে বলে কপ্টারের কাছে ফিরে এল রানা। স্টেনের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে গুঁড়ো করে দিল ওটার প্যানেল বোর্ড। নিচ দিয়ে বেরিয়ে থাকা তারগুলো গায়ের জোরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে এল একটা একটা করে। যখন বুঝল অন্তত এক সপ্তাহের আগে আকাশে উড়তে পারবে না ওটা, ফিরে এসে বোটে উঠল। তীরবেগে গভীর সমুদ্রের দিকে ছুটল স্পীডবোট দুটো। তখনও বৃষ্টি হচ্ছে ঝমঝম করে।

এফ.বি. ওসমানীর ডেকে দলটাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল মেজর আনোয়ারুল ইসলাম। জাহাজ ঘুরিয়ে ছুটল সে আন্তর্জাতিক জলসীমার দিকে। কিন্তু আকাশের অবস্থা খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে বলে মাইল দশেক এগিয়ে ট্রলার থামানোর নির্দেশ দিল রানা।

'এদের নামিয়ে দিয়ে যাই এখানে। পরে ঝড় উঠলে হয়তো ডুবে মরবে,' বলল ও।

'তাই করুন,' মাথা ঝাঁকাল মেজর।

ওদিকে আফটার ডেকে চুপচুপে ভেজা কর্নেল মঙকে নিয়ে হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠেছে ওসমানীর ডেক ক্রু-রা। গোরা আর জসিমের মুখে তার কীর্তি এরমধ্যে শোনা হয়ে গেছে তাদের।

'উরি হালারে!' বলল একজন। 'কি মুডা গর্দান, এক্কেরে গাণ্ডারের মথন দ্যাহায়।'

হো হো করে হেসে উঠল সবাই। মাস্টার'স ব্রিজের পিছনদিকে ডেকের ওপর পাশাপাশি বসিয়ে রেখেছে ওরা কর্নেল আর পাইলটকে। মাথা নিচু করে বসে আছে তারা। ভাষা না বুঝলেও লোকগুলো কি নিয়ে হাসাহাসি করছে, বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে না। হঠাৎ ছুটে এল গোরা, দু'হাতে কর্নেলের দু পায়ের গাঁট আঁকড়ে ধরে চোখমুখ ভয়ঙ্কর করে হেঁড়ে গলায় হাঁক ছাড়ল। 'অই, ধর মগা হালারে, ফালা পানিতে!' গোরা ধরল দু'পা অন্য দুজন দুই

হাত—শূন্যে তুলে লোকটা দোলাচ্ছে ছুঁড়ে ফেলার ভঙ্গিতে।

এই সময় ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এল রানা, মেজর আনোয়ার আর মেজর জেনারেল। ভেজা কাপড় পাল্টে নিয়েছে ওরা সবাই। সামনের দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠল আনোয়ার, হাঁ হাঁ করে উঠল সে। 'অ্যাই, করো কি, করো কি!'

লজ্জা পেয়েছে যেন, কর্নেলকে ছেড়ে দিয়ে এমনভাবে মাথা চুলকাতে লাগল ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

মঙের সামনে এসে দাঁড়ালেন চিতা। বললেন, 'শেষ পর্যন্ত তোমাকে ছেড়েই দিতে হচ্ছে, মঙ।'

ঝট করে চোখ তুলল কর্নেল। যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না কথাটা।

'নৌকা বাইতে জানো?'

মাথা দোলাল সে, জানে না।

'তুমি?' পাইলটের দিকে ফিরলেন তিনি।

'জানি, স্যার।'

'গুড,' রানার কাঁধে একটা হাত রাখলেন তিনি। কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই ছেলে খুব দয়ালু, বুঝলে? ওর অনুরোধেই তোমাকে ছেড়ে দিলাম আমি। নইলে, এ যাবৎ যত অপরাধ তুমি করেছ, তাতে তোমার মাংস কুচি কুচি করে কুকুর দিয়ে খাওয়ালেও আমাদের গায়ের ঝাল মিটত না।'

মাথা আবার নিচু হয়ে গেল কর্নেলের। একজনকে কাছে ডেকে চাপা গলায় কি যেন বলল মেজর আনোয়ার। মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটে গেল লোকটা পিছন দিকে। একটু পর সে ফিরে আসতে চিতার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল মেজর।

'উঠে দাঁড়াও, মঙ। বোট রেডি, যাও, দূর হয়ে যাও।'

বহু কষ্টে দাঁড়াল সে বিশাল ধড় নিয়ে। কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে একটা স্পীডবোটে তুলে দিল ওদের। তবে এনজিন খুলে রাখা হয়েছে ওটার। দুজনের হাতে দুটো বৈঠা ধরিয়ে দেয়া হলো। সাথে কিছু শুকনো খাবার, পানি আর একটা পকেট কম্পাস।

মেজর আনোয়ারের দিকে ফিরল রানা। 'ওয়েদার রিপোর্ট কি বলে, ঝড়-টড় উঠবে না তো? ডুবে মরবে না তো ব্যাটারা?' চাপা গলায় জানতে চাইল।

'না। এইমাত্র ওয়েদার রিপোর্ট শুনলাম, আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় সে সম্ভাবনা নেই।'

'যাও, মঙ,' পিছন থেকে বললেন চিতা। বেশ মুডে আছেন মনে হলো। 'আমি আবার আসছি। এবার আমার অন্য চেহারা দেখবে তুমি, তৈরি থেকো।'

লগি দিয়ে ঠেলে বোটটাকে দূরে সরিয়ে দেয়া হলো। ঝপাঝপ বৈঠা চালাতে শুরু করল পাইলট। কিন্তু কর্নেল বসে আছে অনড়। এই সময় আরও চেপে এল বৃষ্টি, ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে গেল বোট এক সময়।

কাঁধে কার হাত পড়তে পিছন। [illegible] রানা। ক্যাপ্টেন জাহেদ। 'আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, রানা। জীবনের আশা তো ছেড়েই দিয়েছিলাম, তুমি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ।'

'আমাদেরকেও।' জাহেদের বাংলা কথা না বুঝলেও, ও কি বলতে চাইছে, ঠিকই বুঝে নিয়েছেন বৃদ্ধ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এমন সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলেন না, এগিয়ে এসে ওকে আলিঙ্গন করলেন। পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার কথা আজীবন মনে থাকবে আমার, মাই বয়।'

লজ্জায় নাক-মুখ লাল হয়ে উঠল রানার। চোখ তুলতে মেজরের ওপর চোখ পড়ল। জিনিয়া আর সে দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। ব্যর্থ হতে হতেও এত কষ্টের মিশন সফল হয়েছে, অতএব খুশিতে আটখানা হয়ে আছে আনোয়ার। চোখাচোখি হতে ঝট্ করে অ্যাটেনশন হয়ে গেল, খটাশ্ করে স্যালুট ঠুকল সে রানাকে।

তারপর একলাফে ব্রিজে গিয়ে ঢুকল। এনজিন রূমকে পূর্ণগতিতে ছোটার নির্দেশ জানিয়ে দিল, পরমুহূর্তে মনের আনন্দে ছোট ছোট তিনটে হাঁক ছাড়ল এফ. বি. ওসমানী—গাঁ-ক, গাঁ-ক, গাঁ-আ-ক!

* * * *